জীবনের জাগরণ
সিরিজ-০২

'বেলা ফুরাবার আগে' বইয়ের দ্বিতীয় কিস্তি

এবার ভিন্ন কিছু হোক

আরিফ আজাদ

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছু কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

পাঠকের মন্তব্য

[এক] *বেলা ফুরাবার আগে* আমার পড়া অনন্য এক আত্মোন্নয়নমূলক বই। মুসলিম-জীবনের নিয়মতান্ত্রিক টিপসগুলো এত সুন্দর উপস্থাপনায় আমি ইতোপূর্বে কখনো পড়িনি। জীবনমুখী বিষয়গুলো পড়তে গিয়ে বইয়ের পাতা থেকে আমি ইতিহাসেরও শিক্ষা নিয়েছি দারুণভাবে। পশ্চিমের আধুনিক জীবনের বিপরীতে কীভাবে জীবনটাকে প্র্যাক্টিসিং-জীবন হিসেবে সাজানো যায়, তার দারুণ অনুপ্রেরণা রয়েছে এই বইয়ে। আমাদের দুটো জীবন—এক. দুনিয়ার জীবন, দুই. আখিরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবনপদ্ধতি হচ্ছে আখিরাতের জীবনের ইনভেস্টমেন্ট। মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ইনভেস্টমেন্টের সিকিউরিটি নিশ্চিত করে কীভাবে দুনিয়ার জীবনকে উপভোগ্য এবং উপজীব্য করে অতিবাহিত করা যায়, সে বিষয়েরই প্রতিপাদ্য চিত্র *বেলা ফুরাবার আগে*। উদভ্রান্ত, উদাসীন সময়ের পাটাতন থেকে মানুষেরা ফিরছে জীবনের নতুন অনুচ্ছেদে। মুক্তির শীতল পরশে নতুন পৃথিবীর বার্তা বইছে। ভীষণ বেপরোয়া স্রোত এবার বাঁক নিয়েছে। জীবনের এই বেপরোয়া স্রোতকে আমরা নতুন জাগরণে উত্তাল করবো। আসুক তবে আদর্শের সেই কাঙ্ক্ষিত ঢেউ, আমরা তাতে হবো লীন।

—কাজী শাখাওয়াত হোসাইন

[দুই] সন্ধ্যেনামা মেঠোপথে সদাইপাতি নিয়ে শশব্যস্ত পা-চালানো পথিকের মতোই আমাদের জীবন। সূর্যাস্তের আগেই ঘরে ফিরবার তাড়া! অনন্তের জন্য সওদা গুছিয়ে জীবনের অলিগলি ধরে বিরামহীন পথচলা... ক্ষণস্থায়ী জীবনের সওদাটুকুই পরকালের সম্বল। জীবনের লেনাদেনায় সেটুকুন গোছাতে পারলেই

সফলতা। জীবনের সওদা গোছানোর অনুপম পাঠ নিয়ে লেখা হয়েছিল *বেলা ফুরাবার আগে* বইটি। হৃদয়ছোঁয়া বইটির প্রতিটি পাঠেই কাষ্ঠকঠিন হৃদয়ে জেগেছে প্রশান্তিময় কুরআনি বসন্ত। মনের বিষণ্ণতার প্রহরগুলোতে প্রাণসঞ্চারের কোশেশ করেছে অনুপম এই বইটি। বইটির দ্বিতীয় সিকুয়েন্স আসছে শুনে আপ্লুত হয়েছি। বইটির দ্বিতীয় সিকুয়েন্সও পাঠকপ্রিয় হোক। বিশ্বাসী তারুণ্যকে শেখাক আসমানি শুদ্ধতার পাঠ। জীবনের উঠোনজুড়ে ছড়িয়ে দিক ফিরদাউসের খুশবু। আমাদের পাথরপ্রতিম হৃদয়ে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে ঝরুক প্রিয় লেখকের এই সিরিজটি।

—জোবায়ের বিন বায়েজীদ

[তিন] এ ছোট্টকায় জীবনে অনেক দেখেছি যে, সব জিনিসে দারুণ উপকার থাকলেও কিছু না কিছু অপকারিতাও থেকেই যায়। এই প্রথম কোনো বই পড়ে আমারও বেশ উপকার হয়েছে। কিন্তু তাজ্জবের বিষয়—এই বইটিতে কোনো অপকারিতা খুঁজে পাইনি আমি। অসম্ভব চমকপ্রদ ভাষাভঙ্গিতে লেখা বইটির নাম *বেলা ফুরাবার আগে*। বইটির ফিরিস্তি দেখেই খুলে ফেলি ৬৪ নম্বর পৃষ্ঠার 'আমরা তো স্রেফ বন্ধু কেবল' অধ্যায়টি। প্রবল মনোযোগে দেদারসে পড়তে লাগলাম। সেদিন শুধু এটাই পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিলাম যে, আহ! যেমন জীবন পরিচালনা করছি তা তো মোটেও ঠিক নয়। সেদিনের পর থেকেই হারাম রিলেশনশিপের প্রতি আমার ভেতরে অনেকদিনের যে একটা আকর্ষণ জিইয়ে ছিল তা মুহূর্তেই উবে গেল। অধ্যায়টি এত ভালো লেগেছে যে, তারপর আমি সম্পূর্ণ বইটি একনাগাড়ে পড়ে ফেললাম। বইটি সবারই পড়া প্রয়োজন। প্রধানত তরুণ-তরুণীদের। তাই আমি আমার সামর্থ্যানুযায়ী এপর্যন্ত দশোর্ধ্বজন তরুণ-তরুণীকে বইটি হাদিয়া দিয়েছি। রবের কাছে একটাই আরজি—তিনি যেন লেখকের হৃদয়-নিংড়ানো এ কাগুজে কথাগুলোকে তার জন্যে জান্নাতে যাওয়ার উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে কবুল করে নেন, আমিন।

—কোহিনূর হাসান সাদিয়া

প্রকাশকের কথা

ইবলিস শয়তানের সাথে মানুষের শত্রুতা চিরন্তন। অভিশপ্ত হওয়ার পর সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য সে তার সর্বোশক্তি প্রয়োগ করে সবরকমের চেষ্টা করে যাবে।

রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুরে বেড়ানো ইবলিসের খপ্পর থেকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ আমাদের সামনে নেই। সে তার বাহারি ফাঁদ পেতে সর্বদা আমাদেরকে গন্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে মরিয়া। সে আমাদের জান্নাতে নবি-রাসুলদের প্রতিবেশী হতে দিতে চায় না, আমাদের নিয়ে সে অনন্ত জাহান্নামে পুড়তে চায়। ইবলিসের ফাঁদে পড়ে আমরা পদে পদে বিভ্রান্ত হই। হওয়াই স্বাভাবিক। ইবলিসের শক্তির সাথে পেরে ওঠা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব, যদি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সাহায্য করেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দাকে তখনই সাহায্য করেন, যখন বান্দা কায়মনোবাক্যে তাঁকে ডাকে। হৃদয়ের গভীর থেকে তাঁকে স্মরণ করে।

আল্লাহর নির্দেশিত একটা জীবনব্যবস্থা আমাদের সামনে রয়েছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে সেই জীবনপদ্ধতি থেকে বারবার আমরা ছিটকে যাই। আমরা নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো অথবা অন্যের বানানো জীবনপদ্ধতিকে আপন করে বাঁচতে শুরু করি। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের অন্তরগুলোতে মরিচা ধরে যায় এবং আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করি যে, আল্লাহ হয়তো আর কোনোদিনও আমাদের ক্ষমা করবেন না। আমরা হয়তো চিরতরে আল্লাহর ক্ষমা লাভের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি।

আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে শয়তান ভুলের রাস্তায় আমাদের নিমজ্জিত রাখে। সময় বয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশিত রাস্তায় ফিরে আসা আমাদের আর হয়ে ওঠে না। একদিন ফুরিয়ে আসে জীবনপ্রদীপের তেজ, ধীরে ধীরে নিভে যেতে থাকে সেটা। আর যেদিন ফুরিয়ে যায় আয়ু, সেদিন স্তিমিত হয়ে যায় জীবনের সকল আয়োজন, বন্ধ হয়ে যায় আশা এবং ভরসারও দরোজা।

কিন্তু এমন ঘনঘোর অন্ধকারে একটা মানবজীবন কি কেটে যেতে পারে? তাকে সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার যে উদ্দেশ্য, তা পূরণ না করেই সে চুকিয়ে দেবে জীবনের পাঠ? বোধোদয়ের আলোক-রেখা কখনোই কি উদিত হবে না তার চিন্তার আকাশে?

শয়তানি প্ররোচনায় বিচ্যুত অন্তরগুলোকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টার চাইতে মহৎ কিছু আর কী আছে দুনিয়ায়! যারা হারিয়ে ফেলেছে সরল পথের দিশা, যারা ভুলে গেছে তাদের অনন্ত গন্তব্যের রাস্তা, যারা ডুবে আছে এক নিঃসীম অন্ধকারে, তাদের অন্তরগুলোকে জাগিয়ে তুলতে, অন্ধকারের গহ্বর থেকে তাদের টেনে তুলতে দরকার সঠিক পরিচর্যা এবং সুন্দর আহ্বান। অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য আর তিরস্কারের ভাষায় নয়, তাদের ডাকতে হবে ভালোবাসার সাথে। তাদের ভুলগুলোকে ধরিয়ে দিতে হবে পরম যত্ন করে, যাতে তারা হতাশ ও বিরক্ত না হয়ে পড়ে।

আত্মভোলা মানুষগুলোকে আল্লাহর রাস্তায় ডাকবার, তাদের ভুলগুলোকে পরম যত্নের সাথে চিহ্নিত করে সেসব থেকে বেরিয়ে আসার উপায় বাতলানোর ব্যাপারে লেখক আরিফ আজাদ ইতোমধ্যেই মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তার লেখা বইগুলো প্রতিনিয়ত হাজারো মানুষের হিদায়াতের অসিলা হচ্ছে, তরুণ-যুবা-বৃদ্ধ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে আরিফ আজাদ তার আলো হাতে পৌঁছে যাচ্ছেন এটা আমাদেরসহ গোটা উম্মাহর জন্যেই বড়ো আশাব্যঞ্জক ঘটনা।

সাজিদ সিরিজের জনক আরিফ আজাদ প্রথম নিজ বলয়ের বাইরে আসেন *বেলা ফুরাবার আগে* বইয়ের মাধ্যমে। বলাই বাহুল্য, এই কাজটাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভরপুর বারাকাহ দিয়ে তাকে সিক্ত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এই বইটা আমাদের চারপাশের কত যুবক-যুবতীর হিদায়াতের অসিলা হয়েছে, কতো দিশেহারা ক্লান্ত প্রাণ যে স্বস্তি আর শান্তি নিয়ে নীড়ে ফিরেছে তা গণনার ঊর্ধ্বে, আলহামদুলিল্লাহ। প্রকাশনার ভেতরে থাকা হয় বলে সেই পরিবর্তনের অনেক গল্প, অনেক ঘটনাকে আমরা আরো কাছ থেকে দেখি এবং আল্লাহর কাছে বারংবার কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে পড়ি।

শুধু পাঠকের প্রত্যাশা ছিল *বেলা ফুরাবার আগে* বইয়ের দ্বিতীয় কিস্তি যেন বের হয়। পাঠকের প্রত্যাশা বলেই নয়, এই সিরিজের ধারাবাহিক কিস্তিগুলো সত্যিই দরকারি। মানুষের সমস্যাগুলোকে ঠিক এভাবে সামনে আনার এবং সম্ভাবনাগুলোকে এভাবে জাগিয়ে তোলার কাজটা একটা বইয়ে সমাপ্ত হতে পারে না। আর মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের একটা কার্যকর পদ্ধতি যখন সামনে উঠে আসে, তখন সেটাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানোই উচিত বলে মনে করি। এই জায়গায় লেখক আরিফ আজাদকে আমরা সফল বলতে পারি নিঃসন্দেহে। তিনি যে শব্দশৈলী, যে ধারায় মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় ফিরতে উদ্বুদ্ধ করেন তা পাঠকেরা ভালোবেসে গ্রহণ করেছেন। ফলে এই সিরিজে এই ধারায় আরো নতুন নতুন সমাধান নিয়ে তিনি হাজির হবেন, আরো নতুন সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মোচন করবেন পাঠকদের সামনে সে প্রত্যাশা আমাদের সকলেরই ছিলো। আমাদের সেই প্রত্যাশার একটা পরিণতির নাম হলো—*এবার ভিন্ন কিছু হোক*।

বেলা ফুরাবার আগে বইয়ের পরের কিস্তি *এবার ভিন্ন কিছু হোক*। যেহেতু এর আগের কিস্তির আলোচ্য বিষয়াদি, বর্ণনার ধারা, ভাষার ব্যবহার, শব্দশৈলীর প্রয়োগ সম্পর্কে পাঠকেরা অবগত আছেন, এই কিস্তির ব্যাপারে তাই নতুন করে বলার কিছু নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি, এই কিস্তিতেও পাঠকেরা বইটির পাতায় পাতায়, পরতে পরতে নিজেদের খুঁজে পাবেন। এ-ও বলতে পারি, বরাবরের ন্যায় মনে হবে প্রিয় লেখক বুঝি পাশে বসেই গল্পচ্ছলে আপনাদের শোনাচ্ছেন কথাগুলো।

এই সিরিজটাকে লেখক আরিফ আজাদ বলেছেন 'সাজিদ' তৈরির মিশন। আলহামদুলিল্লাহ, সিরিজটাকে ঘিরে পাঠকদের উচ্ছ্বাস, আনন্দ আর আবেগের ফল্গুধারা দেখে আমরা বিশ্বাস করি লেখক সফলতার সঠিক রাস্তায় আছেন। আমাদের মহান রব তার এই মিশনকে কবুল করে নিন, তার কাজে ভরপুর কামিয়াবি দান করুন এবং তার কাজগুলোকে পরকালে তার নাজাতের অসিলা করে নিন—কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা-ই করি মহামহিম দয়াময়ের কাছে। বইটির সাথে জড়িত হতে পেরে সমকালীন পরিবার সবিশেষ আনন্দিত আর আপ্লুত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে আমাদেরকেও কবুল করেন। আমিন।

লেখকের কথা

'জীবনের জাগরণে' সিরিজের প্রথম বই ছিলো *বেলা ফুরাবার আগে*। বইটা আমার কতো যে প্রিয় আর বইটাকে ঘিরে গত দুবছরে কতো কতো ঘটনার যে জন্ম হয়েছে, তা বলে শেষ করার মতো না। কীভাবে শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই অপার নিয়ামতের হক আদায় হবে, তা আমার জানা নেই; কিন্তু তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে শেষ করতে পারা আদৌ কি সম্ভব? আলহামদুলিল্লাহ।

বেলা ফুরাবার আগে বইটা যখন লিখি, তখন আমার ধ্যান-জ্ঞান সব যেন বইটাকে ঘিরেই। আমি স্বপ্ন দেখতাম—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছাতে এই বই যুবক-যুবতীদের পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। তারা সালাতের প্রতি উদগ্রীব হচ্ছে, হারাম রিলেশান ছেড়ে দিচ্ছে, ফোন মেমোরি থেকে ডিলেট করে দিচ্ছে সমস্ত গান, যা না শুনলে রাতে তাদের ঘুম হতো না। ফোনের গ্যালারি থেকে তারা মুছে দিচ্ছে সেসকল ছবি আর ভিডিও, যা তাদের কু-প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করতো একদা। তারা বিনয়ী হচ্ছে, সময়ের গুরুত্ব বুঝছে, তারা সুন্নাহ আর নফল পালনের দিকে ঝুঁকছে, ফজর আর তাদের কাযা হচ্ছে না—বইটা লিখবার প্রাক্কালে এসবই ভাবতাম আর আল্লাহর কাছে অনেক দুআ করতাম। আল্লাহকে বলতাম, তিনি যেন আমার স্বপ্নগুলোকে সত্যি করেন আর বইটাকে কবুল করেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর বারাকাহ আর প্রকাশ্য সাহায্য যে কী জিনিস, তা আমি বরাবরের ন্যায় আবারও উপলব্ধি করলাম। *বেলা ফুরাবার আগে* বইটাকে নিয়ে আমি যে যে স্বপ্ন একদা মনে মনে আঁকতাম, হাঁটতে হাঁটতে যে দৃশ্যগুলো দোলা

দিয়ে যেতো আমার হৃদয়ে, সেসবকিছুই আমার রব বাস্তবে পরিণত করেছেন। গোটা বাংলাদেশ তো বটেই, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিশাল একটা অংশের মাঝে বইটাকে নিয়ে যে উচ্ছ্বাস, যে আগ্রহ আমি দেখেছি, সোশ্যাল মিডিয়া, মেইল ও ইনবক্সে বইটা পড়ার পর যে সমস্ত পরিবর্তনের কথা আমি শুনেছি মানুষের কাছ থেকে, তা দেখে আমি বিশ্বাস করি যে, আমার মহান রব আমার দুআগুলো কবুল করেছেন। তিনি বইটাকে যুবক-যুবতীসহ অনেক অনেক মানুষের পরিবর্তনের অসিলা হিশেবে গ্রহণ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটা প্রকাশের দুবছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ বইটা পড়ে তাদের পরিবর্তনের কথা জানাচ্ছেন। এ যে কী মধুর ভালো লাগা, তা বর্ণনার জন্য যথাযথ শব্দ দুনিয়ার কোনো ভাষাতে মজুত নেই। আলহামদুলিল্লাহ!

বেলা ফুরাবার আগে বইটাকে আমি বলেছিলাম 'সাজিদ' তৈরির মিশন। *প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ* পড়ে যারা সাজিদ হতে চাইবে, তারা যখন জানতে চাইবে সাজিদ হতে হলে তাদের কী কী করতে হবে, আমি বলেছিলাম তারা যেন *বেলা ফুরাবার আগে* বইটাতে চোখ বুলায়। আমি ভীষণভাবে বিশ্বাস করি—আত্মিকভাবে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা না গেলে কখনোই পরম পবিত্রতার সন্ধান লাভ সম্ভব নয়। আত্মার সেই শুদ্ধতার দিকে যুবক-যুবতীদের ধাবমান করতেই আমি বইটার কাজে হাত দিয়েছিলাম। যেহেতু যুবক বয়সের সমস্যাগুলোর ভেতর দিয়ে আমি নিজেও যেতাম এবং এখনো যাই, তাই সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা আমার জন্য কঠিন কিছু ছিলো না। সেই সমস্যাগুলোর পরতে পরতে আমি হাঁটতে চেষ্টা করেছি এবং বের করে আনতে চেয়েছি সেসবের সম্ভাব্য সবচেয়ে সঠিক চিকিৎসাটাই।

অনেক পাঠক আমাকে *বেলা ফুরাবার আগে* বইয়ের দ্বিতীয় কিস্তি আনার অনুরোধ করেছেন। যুবক বয়সের যেহেতু সমস্যার অন্ত নেই এবং তা ক্রমবর্ধমান, তাই আমারও খুব ইচ্ছে ছিলো এই ধরণের আরো বই নিয়ে কাজ করার। আলহামদুলিল্লাহ, মহান রব আমার সেই বাসনাটাও পূরণ করেছেন। *এবার ভিন্ন কিছু হোক* নামে এই সিরিজের পরের বইটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রকাশের সুযোগ দিলেন আমাকে। আমার রবের দরবারে অফুরান কৃতজ্ঞতা।

এবার ভিন্ন কিছু হোক বইটা *বেলা ফুরাবার আগে* বইয়ের পরের কিস্তি। দুটো বই প্রায় একই ধাঁচে লেখা। আমি চেষ্টা করেছি অধ্যায়গুলোকে জীবনঘনিষ্ঠ রাখতে,

যাতে পাঠকেরা পড়ার সময় নিজের অবস্থাকে কল্পনা করতে পারেন। যিনি বইটা হাতে নিয়ে পড়বেন, তার যেন মনে হয় বইটা আমি তার জন্যই লিখেছি এবং বইয়ের কথাগুলো যেন আমি তার পাশে বসে বসে তাকে শোনাচ্ছি। পাঠকের মনোযোগ যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, সেদিকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি আমি, আলহামদুলিল্লাহ।

এই বইতেও পাঠকেরা অনেকগুলো সমস্যার সমাধান পাবেন এবং আরো পাবেন অনেক আশার আলোও। যেহেতু আমি খুবই আশাবাদী একজন মানুষ, তাই মানুষকে আশা নিয়ে বাঁচতে স্বপ্ন দেখাতেই আমি ভালোবাসি। আর কেনই-বা নিশারাবাদী হবো? অবিশ্বাসীরা ছাড়া আর কারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়?

বেলা ফুরাবার আগে বইয়ের মতো এই বই নিয়েও আমার আকাশছোঁয়া স্বপ্ন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা—তিনি এই বইটাকে যেন কবুল করেন আর আমার নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন। তিনি যেন আমাকে সর্বদা মাটির মানুষ থাকার সুযোগ দেন। সমস্ত অহংকার, রিয়া আর বড়োত্ব থেকে তিনি যেন আমাকে মুক্ত রাখেন।

বরাবরের মতোই আমার পাঠকদের কাছে অনুরোধ—পড়া শেষ হলে বইটা নিজের কাছে রেখে দেবেন না। আপনার নিকটাত্মীয়, বন্ধু, ভাই-বোন বা এমন কারো কাছে বইটা হস্তান্তর করবেন, যার জন্য বইটাকে আপনি দরকারি মনে করবেন। সকল পাঠকের জন্য আমার অফুরান ভালোবাসা। ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা এই বইটার পেছনে যারা বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা সমকালীন প্রকাশনের প্রতি, বইটাকে পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে যাবতীয় বন্দোবস্তের ভার গ্রহণের জন্যে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের সবাইকে জান্নাতের সবুজ উদ্যানে একত্রিত করেন। আমিন।

ওয়ামা তাওফিক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

আরিফ আজাদ

arifazad.bd@outlook.com

সুচিপত্র

আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই

এক.

যাপিত জীবনের গল্প থেকেই বলি—আমরা যখন রোগে-শোকে ভুগি, যখন শরীরে আমরা অনুভব করি কোনো রোগের উপস্থিতি, তখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তার, যিনি আমাদের সামনের চেয়ারে উপবিষ্ট থাকেন মাথাভরতি ডাক্তারি-বিদ্যা নিয়ে, তার কাছে আমরা খুলে বলি আমাদের অসুবিধের আদ্যোপান্ত। তিনি বোঝার চেষ্টা করেন আমাদের অসুস্থতা। প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি দিয়ে আমাদের শরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন। রোগ নির্ণয়ের পর আমাদের ওষুধ ও জীবনযাত্রার একটা ছক নির্ধারণ করে দিয়ে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করার কঠোর হুঁশিয়ারিও প্রদান করেন।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে কিংবা আশানুরূপ ফলাফল না এলে আমরা ছুটে যাই শিক্ষকদের কাছে। তাদের কাছে—যারা আমাদের চোখে অধিকতর যোগ্য। কৃতকার্যতার অথবা ভালো ফলাফলের পথ বাতলে দিতে যারা সবিশেষ পারদর্শী, তাদের দুয়ারে ধরনা দিই আমরা। ভালো ফলাফলের রাস্তা বাতলে দিয়ে তারা ধন্য করেন আমাদের। কৃতকার্য হতে হলে যে পথ ধরে এগুতে হবে, যে কঠোর-কঠিন সাধনায় লেগে থাকতে হবে মুখ বুজে—সেই পথ তারা আমাদের চিনিয়ে দেন।

মাঝে মাঝে জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, যখন ফিকে হয়ে আসে জীবনের সমস্ত রং, তখন আমরা এমন কাউকে খুঁজি, যে আমাদের একটু আশার আলো দেখাবে।

এমন কাউকে—যার কাছে গেলে আমরা খুঁজে পাবো জীবনের ছন্দ, যার স্পর্শ পেলে হয়তো দপ করে জ্বলে উঠবে নিভুনিভু হওয়া জীবন-প্রদীপ।

যাপিত জীবনের শূন্যতাগুলোকে উত্তম বিকল্প দিয়ে প্রতিস্থাপনের বেলায় আমাদের থাকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা। যখনই কোনো শূন্যতার বলয়ে আমরা ঘুরপাক খাই, আমাদের অবচেতন মন তার নিজের মতো করে সেই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করে। বস্তুত মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যই এটা। মানুষ শূন্যস্থান পছন্দ করে না বলেই তা পূরণে সে সবিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে।

দুই.

রোগ হলে আমরা ডাক্তারের কাছে ছুটি, পরীক্ষায় ভালো ফল লাভের উপায় জানতে ধরনা দিই যোগ্য শিক্ষকের কাছে। বিষিয়ে ওঠা জীবনের যাতনা থেকে মুক্তি পেতে আমরা পাগলের মতন খুঁজে নিই পছন্দের ব্যক্তি, বস্তু অথবা মাধ্যম, যা-কিছু আঁকড়ে ধরলে আমরা বেঁচে থাকার প্রেরণা পেতে পারি; তবে যদি প্রশ্ন করি—নফসের তাড়না থেকে বাঁচতে কখনো কি আমাদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে? যে কুপ্রবৃত্তির বলয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে সেঁটে আছে জীবন, সেই বলয় ভাঙতে কখনো কি হৃদয়ে দানা বেঁধেছে একটুখানি সাহস?

শরীরে রোগ বাসা বাঁধলে তাকে আমরা সমস্যা বলছি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াকে ডাকছি অপ্রাপ্তি বলে। জীবনের ছন্দপতনের নাম দিয়েছি হতাশা; কিন্তু কুপ্রবৃত্তির যে জালে আমি সারাটাজীবন ধরে আটকা পড়ে আছি, তার জন্য কোনো নাম কিংবা কোনো অভিধা কখনো কি ভেবেছি একবারও?

যে তাড়না আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে আল্লাহর নৈকট্য থেকে, যে ধোঁকা আমাকে আত্মমগ্ন করে রেখেছে অবাধ্যতায়, যে আত্মপ্রবঞ্চনায় কেটে যাচ্ছে জীবনের সোনালি সময়, সেই ঘনঘোর অন্ধকার থেকে পালাতে কখনো কি আমার মন চেয়েছে?

কেন আমি বারবার বন্দি হয়ে যাই নফসের শেকলে? কেন কুপ্রবৃত্তির মায়াজাল ভেদ করা আমার জন্য দুরূহ হয়ে ওঠে? কেন বৃত্তের একই কেন্দ্রে আমার নিত্য ভুলের বিচরণ? যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় আমার আগমন, সেই উদ্দেশ্য থেকে কেন আমি ভীষণরকম বিচ্যুত? রুহের জগতে মহামহিম আল্লাহ যখন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আমিই কি তোমার রব নই?', তখন আমি মহোৎসাহে, আনন্দে

আত্মহারা হয়ে, বিস্ময়মাখানো কণ্ঠে বলেছিলাম, 'অবশ্যই, আপনিই আমার রব।'[১] তবে আজ কেন ভুলে গেলাম আমার জীবনের সেই প্রথম আর পরম স্বীকৃতির কথা?

এই যে কুপ্রবৃত্তির বাঁধনে আমি বন্দি হয়ে আছি, সেই শৃঙ্খল ভাঙার উপায় কী? কোন উপায়ে আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারবো এই চোরাফাঁদ থেকে? কোন পথে নিহিত আমার মুক্তি? কীভাবে আমি জীবনের সেই আসল উদ্দেশ্যের বাঁকে ফিরতে পারবো—এসব নিয়ে যদি একটু ভাববার ফুরসত পাই, আমার জন্য সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসবে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। যখনই আমি সমস্যার বৃত্তে ঘুরপাক খাবো, তখন যদি নিবিষ্ট মনে আমি খেয়াল করি আল্লাহর কালাম—এই আয়াতের দিকে, আমি পেয়ে যেতে পারি আমার কাঙ্ক্ষিত সেই সমাধান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

তাদের পরে এলো এমন এক অসৎ জাতি, যারা সালাত বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।[২]

আমি যদি বুদ্ধিমান হই এবং আমার বিবেচনাবোধ আর উপলব্ধি ক্ষমতা যদি একেবারে ফুরিয়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণে আমি বুঝে গেছি, আমার শূন্যতাটা আসলে কোথায়। কোন জায়গায় এসে আমার জীবন থমকে গেছে, কোন কেন্দ্রে এসে আমি আসলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কোন ভ্রান্তির মায়াজালে আমি আটকে পড়েছি তা এতক্ষণে আমার চোখে পড়ার কথা।

হ্যাঁ, আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথাই বলছি। এটাই তো মানবজীবনের ছন্দ। এই ছন্দের শূন্যতাই তো জীবনে ছন্দপতন ঘটায়। এটি আমার কথা নয়, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা। তিনি ধ্বংস ও অভিশপ্ত এক জাতির উদাহরণ টেনে বলছেন, 'এমন এক জাতি এলো, যারা সালাত বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।' আল্লাহ তো বলতে পারতেন, 'তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো এবং সালাত বিনষ্ট করলো।' কিন্তু তিনি সেভাবে বলেননি। তিনি আগে সালাত বিনষ্টের কথা বলেছেন এবং এরপর বলেছেন কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের কথা।

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭২

[২] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৯

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অভিশপ্ত এক জাতির বর্ণনা দিতে গিয়ে আমাদের জানাচ্ছেন যে, তারা সালাত বিনষ্ট করেছে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। তারা কিন্তু আগেই কুপ্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়েনি। আগে তারা সালাত ছেড়েছে। সালাত ছেড়ে দেওয়াতে সহজেই তারা কুপ্রবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ তারা হয়ে পড়েছে অভিশপ্ত। মোদ্দাকথা—সালাত হলো বান্দা ও শয়তানের মাঝে একটা শক্ত বেষ্টনী। একটা মজবুত দেওয়াল। বান্দা যখন নিজেকে সালাতের সাথে যুক্ত রাখে, তখন শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। যে বান্দা নিজেকে সালাতে হাজির রাখে, শয়তানের তির সেই বান্দাকে আঘাত করতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই বান্দাকে তাঁর সুরক্ষা-বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। ভাবছেন, এটিও কি আমার কথা? একদম না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই বলেছেন—

নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে দূরে রাখে।[১]

সালাত হচ্ছে বর্মের মতো। যতক্ষণ সালাত নামের বর্মটা সত্যিকার অর্থেই আমার দেহের সাথে লেপ্টে থাকবে, ততক্ষণ শত্রুর আঘাত আমাকে আহত করতে পারবে না। শত্রুর সমস্ত আঘাত এই বর্মে লেগে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। অথবা সালাতকে আমরা একটা সুরক্ষা-বলয়ের সাথেও তুলনা করতে পারি। যতক্ষণ আমি এই বলয়ের মাঝে থাকবো, ততক্ষণ আমার দ্বারা কোনো মন্দ কাজ সংঘটিত হবে না। সালাত যখন আমার জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়াবে, তখন যাবতীয় মন্দ কথা, মন্দ ভাবনা আমার অন্তরে আর উদিত হতে পারবে না অথবা উদিত হলেও সেসবের ব্যাপারে আমি বেখেয়াল হবো না। যখনই মন্দ চিন্তা আর মন্দ ভাবনা আমার অন্তরে দখল নিতে চাইবে, তখনই আল্লাহর রহমতে আমার ভেতরে সেসবের ব্যাপারে অনুশোচনা তৈরি হবে এবং আপ্রাণ প্রচেষ্টায় আমি সেগুলোকে আমার ভাবনার জগৎ থেকে মুছে ফেলতে চাইবো।

কিন্তু যখন আমি সালাত ত্যাগ করবো, যখন সালাতের ব্যাপারে আমার হৃদয়-মন উদাসীন হয়ে উঠবে, তখন আমার অন্তরে ঢুকে পড়বে কুপ্রবৃত্তির হাওয়া। যেহেতু আমার সাথে সালাতের তখন সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে, সেহেতু কুপ্রবৃত্তির আশকারাকে প্রতিহত করার এবং অন্তরে উদিত হওয়া সেই মন্দ ভাবনা আর মন্দ চিন্তাগুলোকে

[১] সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৫

ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তি আর উৎসাহ আমার ভেতর অবশিষ্ট থাকবে না। আমাকে সালাতবিহীন অবস্থায় পেয়ে কুপ্রবৃত্তির যে হাওয়া আমার অন্তরে জেঁকে বসবে, সেই হাওয়া আমাকে বিফল, বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ বানিয়ে ছাড়বে।

সেই অভিশপ্ত জাতি, যাদের উদাহরণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে টেনেছেন, তাদের কথাই ভাবুন। তারা প্রথমে বিনষ্ট করলো তাদের সালাত। এরপর কী হলো? কুপ্রবৃত্তি তাদের অন্তরে জেঁকে বসলো। কুপ্রবৃত্তির সেই মায়াজাল ভেদ করে তাদের আর বের হয়ে আসা হলো না। এই দ্বৈত পদস্খলনের ফলে তারা পরিণত হয়েছে চরম অভিশপ্ত এক জাতিতে, যাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উদাহরণ হিশেবে পেশ করেছেন। কী এক ভয়ানক ব্যাপার, ভাবা যায়!

এবার চলুন আমরা নিজেদের জিজ্ঞেস করি—কেন আমরা শয়তানের ওয়াসওয়াসা কাটিয়ে উঠতে পারি না? কেন নিজেদের নফসকে দমিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে? কুপ্রবৃত্তির কাছে কেন আমরা বারংবার পরাজিত, ব্যর্থ, শৃঙ্খলিত হচ্ছি? কেন রবের আহ্বানে সাড়া দিতে আমরা অপারগ? কুরআনের সুরলহরি কেন আমাদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দিতে পারে না? উত্তরের জন্য চলুন দৃষ্টি ফেরাই নিজেদের জীবনের দিকে। আত্মসমালোচনার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের জিজ্ঞেস করি—আমি কি আমার সালাত ঠিক রাখতে পেরেছি? আমার সালাত কি সেভাবে আদায় হচ্ছে, যেভাবে আদায় হলে তা সত্যিকারের সালাত হয়ে ওঠে?

যদি আপনি নফসের ধোঁকায় মজে থাকেন, যদি কুপ্রবৃত্তির কালোছায়া গ্রাস করে থাকে আপনার অন্তর, তাহলে ওপরের জিজ্ঞাসার উত্তরে আপনাকে বলতে হবে—না, আমি আমার সালাত ঠিক রাখতে পারিনি। সালাত আদায়ে আমি ভীষণ অলস, অথবা আমার সালাতে কোনো প্রাণ নেই। সালাতে যেভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য অনুভব করতে হয়, তার ছিটেফোঁটাও আমি অনুভব করতে পারি না।

অর্থাৎ, এককথায় আপনি সালাতকে বিনষ্ট করছেন। হয়তো সালাতে হাজিরই হচ্ছেন না, অথবা হাজির হলেও তা একেবারে গা বাঁচানো হাজিরা। সেই হাজিরায় জায়নামাযে আপনার দেহ দাঁড়ায় বটে, মন দাঁড়ায় না। যে সালাতে দেহ আর মনের যৌথ সম্মিলন ঘটে না, সেই সালাত শারীরিক ব্যায়াম বৈ আর কোনোকিছু হয় না।[১]

---

[১] এতে সালাতের হক আদায় হয় না। কেবল সালাতের বিধান পালিত হয়।

তাহলে উপায়? কোন পথে ফেরা যাবে গন্তব্যে? কোন উপায়ে জীবনকে নতুন ছন্দে মাতানো যাবে আবার? কোন সে জিয়নকাঠি, যার স্পর্শে জীবন ফিরে পাবে প্রাণ? মরা গাঙে আসবে বসন্তের জোয়ার? উত্তর আছে ওই একই জায়গায়, ঠিক যে জায়গা থেকে শূন্যস্থানের সৃষ্টি—সালাত। আয়াতটির দিকে আরেকবার খেয়াল করুন—

'তাদের পরে এলো এমন এক অসৎ জাতি, যারা সালাত বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।'[১]

তারা অভিশপ্ত হয়েছিলো, জীবনের ছন্দ হারিয়েছিলো কেবল সালাত বিনষ্ট করে। সালাত বিনষ্ট করায় তারা আপনাআপনি ঢুকে পড়েছে কুপ্রবৃত্তির মায়াবৃত্তে। সেই বৃত্ত থেকে তারা আর বেরোতে পারেনি। তারা হয়েছে পথভ্রষ্ট। আজ আমরা যারা জীবনের ছন্দ হারিয়ে হাপিত্যেশ করছি, জীবনের গতিপথ মন্থর হয়ে যাওয়ায় যারা সমাধানের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমাদের কি একটু সময় হবে সালাতগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করার? যাপিত জীবনের দৈনন্দিন রুটিনে সালাতটাকে 'অবশ্যকর্তব্য' করে নেওয়ার ব্যাপারে একটু মনোযোগী কি আমরা হতে পারি না? বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ না করলে আমাদের অস্তিত্ব যেমন সংকটে পড়ে যাবে, ঠিক সেভাবে সালাতের ব্যাপারে উদাসীনতা মন্থর করে দেবে আমাদের জীবনের সকল ছন্দ, সকল গতিময়তাকে। তাই, কুপ্রবৃত্তির ধোঁকার মাঝে আর হাবুডুবু খাওয়া নয়। আর নয় রোজকার অগোছালো জীবন। আজ, ঠিক এই মুহূর্ত থেকে চলুন আমরা হয়ে উঠি এক অন্য মানুষ। আমাদের জীবনকে আমরা রাঙিয়ে তুলি সালাত দিয়ে। আর রাঙিয়ে তুলি আমাদের দুনিয়া-আখিরাত—দুটোই।

তিন.

জীবনে কি এমন হচ্ছে যে, কোথাও কোনো সফলতা পাচ্ছেন না? মনে হচ্ছে যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই ব্যর্থতা আপনাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য ওত পেতে আছে? পরীক্ষায় আশানুরূপ সফলতা আসছে না, বারবার ব্যবসায় লোকসান গুনছেন, একটা ভালো চাকরির আশায় দিনের পর দিন অপেক্ষার প্রহর গুনছেন, কিন্তু কোনোভাবেই একটা চাকরির বন্দোবস্ত হচ্ছে না। সংসার থেকে যেন বারাকাহ উঠে গেছে। আয়-রোজগারে খুব মন্দা পরিস্থিতি। হয় এমন?

[১] প্রাগুক্ত

আচ্ছা, কখনো কি ভেবে দেখেছেন, কেন এমন হচ্ছে? কেন আপনি বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন? কেন সফলতা হাতছানি দিয়েও দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে? কেন আপনার সংসারে আগের সেই বারাকাহ, আগের সেই স্থিতিশীলতা আপনি এখন পাচ্ছেন না? কেন আপনার ব্যবসার পুঁজি, শ্রম, সময়ের বিনিয়োগ আগের চেয়ে ভালো হওয়া সত্ত্বেও আপনি সাক্ষাৎ পাচ্ছেন না সফলতার? কখনো খতিয়ে দেখেছেন শূন্যতাটা আসলে কোথায়?

আপনার এই ব্যর্থতার একটা সম্ভাব্য কারণের উল্লেখ পাওয়া যাবে কুরআনে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

আর (আমার রব) আমাকে বানিয়েছেন আমার মায়ের প্রতি অনুগত; এবং তিনি আমাকে অবাধ্য, হতভাগ্য করেননি।[১]

আয়াতের কথাগুলো ঈসা আলাইহিস সালামের, যখন তিনি মায়ের কোলে থাকাবস্থাতেই তার গোত্রের লোকজনের সাথে কথা বলেছেন। এই আয়াতে তিনি তার গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'আমার রব আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত বানিয়েছেন।' মায়ের অনুগত মানে কী? মায়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, মায়ের হকের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া। মায়ের অবাধ্য না হওয়া, মায়ের দেখভাল করা, মায়ের প্রতি রূঢ়, বিরূপ আচরণ না করা, মায়ের মনোবাঞ্ছা, মনোবাসনা পূরণ করা ইত্যাদি মায়ের অনুগত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। ঠিক এরপরেই ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'তিনি আমাকে বানাননি অবাধ্য, হতভাগ্য।'

আয়াতটির দুটো অংশ। প্রথম অংশে মায়ের অনুগত হওয়ার কথা, দ্বিতীয় অংশে অবাধ্য না হওয়া এবং হতভাগা না হওয়ার কথা।

এই আয়াতে 'হতভাগ্য' বলতে আরবি 'শাক্বিইয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ—বিফল হওয়া, ব্যর্থ হওয়া, অসফল হওয়া। Lack Of Success এই একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে একই সুরার ৪ নম্বর আয়াতে, যেখানে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম দুআর মধ্যে বলছেন, 'হে আমার রব, আমি তো কখনো আপনাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি।'

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৩২

আয়াতটি থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে—ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের অনুগত হওয়ার দাবি উত্থাপনের ঠিক পরেই বললেন, তাকে ব্যর্থ বা অসফল বানানো হয়নি। তাহলে, মায়ের আনুগত্যের সাথে সফল হওয়া না-হওয়ার একটা সম্পর্ক প্রতীয়মান হচ্ছে না এখানে? এটাই হচ্ছে এই আয়াতে কুরআনের বার্তা।

এবার তাহলে নিজেদের জীবনের দিকে একটু তাকানো যাক। এই যে জীবনজুড়ে অসফলতার ছড়াছড়ি, ব্যর্থতার সকরুণ গল্প, এই ব্যর্থতা ঠিক কী কারণে আপনার ওপর নিপতিত হয়েছে, তা কি খুঁজে বের করা উচিত নয়? যদি জিজ্ঞেস করি—মায়ের সাথে আপনি কি যথাযথ আচরণ করেন? মায়ের হকগুলোর ব্যাপারে, মায়ের অধিকারগুলোর ব্যাপারে আপনি কি সর্বদা তৎপর ছিলেন বা আছেন? আপনি কি মায়ের সাথে গলা চড়িয়ে কথা বলায় সিদ্ধহস্ত? তার মতামতকে, তার আবদারকে অগুরুত্বপূর্ণ মনে করে আপনি কি সহজেই উড়িয়ে দেন? আপনি কি মায়ের চাহিদাগুলোর যথেষ্ট মূল্যায়ন করেন?

এই জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে আজই আপনার মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। যে ভুল আপনি গর্ভধারিণী মায়ের সাথে করে এসেছেন, যে অশোভন আচরণে আপনি বারংবার ক্ষত-বিক্ষত করেছেন তার অন্তর, সমস্ত কিছুর জন্য তার কাছে করজোড়ে ক্ষমা চান। পা জড়িয়ে ধরে কাঁদুন। ছোটোবেলায় যেভাবে তার আঁচল-তলে লুকোতেন, তার গলা জড়িয়ে কাঁদতেন, ঠিক সেভাবে। বিশ্বাস করুন—আপনার ব্যর্থতার কারণ ঠিক এখানেই লুকিয়ে আছে। এখানে এসেই আপনি বারবার হেরে যাচ্ছেন। আপনার জীবনে বারাকাহর যে ঘাটতি, তার শুরুটা ঠিক এখান থেকেই।

মায়ের সামান্য অবাধ্যতা জীবনে কীরকম বিপদ ডেকে আনতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে পাই। হাদিসে বনু ইসরাইল যুগের একজন নেককার বান্দার কথা বলতে গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বনু ইসরাইল সম্প্রদায়ে জুরাইজ নামে অত্যন্ত নেককার একজন লোক ছিলেন। আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য তার ছিলো আলাদা একটা জায়গা এবং সেখানে তিনি সারাদিন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। একদিন এমনই এক সময়ে জুরাইজ যখন তার ইবাদতে মগ্ন, তার মা এসে তাকে ঘরের বাইরে থেকে ডাক দিলেন। মায়ের ডাক শুনে তিনি কি ইবাদত ত্যাগ করে মায়ের কাছে ছুটে যাবেন, না ইবাদত সম্পূর্ণ করে তারপর মায়ের ডাকে সাড়া

দেবেন—এ নিয়ে ভারি দোটানায় পড়ে গেলেন। শেষপর্যন্ত ইবাদত সম্পূর্ণ করে তারপর মায়ের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি মনস্থির করলেন। এভাবে দ্বিতীয়বার এসে তার মা তাকে ডাকলেন, কিন্তু তখনো ইবাদতে রত থাকায় তিনি সাথে সাথে মায়ের ডাকে সাড়া দিতে পারলেন না। তৃতীয়বার আবারও তার মা এলেন এবং তাকে ডাক দিলেন। তৃতীয়বারও ছেলের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মা এবার হতাশ হয়ে বলে বসলেন, 'ইয়া আল্লাহ, কোনো এক নষ্টা নারীর মুখ দেখার আগে যেন ওর মৃত্যু না হয়।'

জুরাইজের ধর্মপ্রীতি এবং একনিষ্ঠ ইবাদত-বন্দেগির সুনাম তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো হুড়মুড় করে। সবাই তার দুনিয়া-বিমুখতা, খোদাভীতির প্রশংসায় গদগদ। সেসময় ওই এলাকায় এক পতিতার আগমন ঘটলো, পুরুষদের সাথে যে অবৈধ সম্পর্ক করে বেড়ায়। লোকের মুখে মুখে জুরাইজের গল্প শুনে সে বললো, 'ও এই ব্যাপার! তোমরা দেখো, আমি যদি তার কাছে যাই, আমাকে দেখে সে তার ধর্মকর্ম শিকেয় তুলতে বাধ্য হবে।'

পতিতা বোঝালো—জুরাইজ যতই ধর্মকর্ম করুক, যতই আল্লাহওয়ালা হোক, তার রূপের কাছে জুরাইজকে হার মানতেই হবে। সকলে বললো, 'তাই নাকি? তো যাও না, গিয়ে পারলে জুরাইজকে গিয়ে বলো এসব।'

সেই পতিতা জুরাইজের কাছে এলো এবং নানানভাবে সে জুরাইজকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলো; কিন্তু আল্লাহর বান্দা জুরাইজকে সে কোনোভাবেই প্রলুব্ধ করতে পারলো না। সে যারপরনাই ব্যর্থ হলো।

জুরাইজকে প্রলুব্ধ করতে না পারার বেদনা তার মাঝে প্রবল হয়ে উঠলো। অপমানের শোধ নিতে সে বেশ কদর্য এক কাজের দ্বারস্থ হলো। এক রাখালের সাথে সে শারীরিক সম্পর্কে জড়ায় এবং অনৈতিকভাবে এক সন্তান গর্ভে ধারণ করে। যখন সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তাকে কোলে নিয়ে সে পুরো জনপদে ঘুরে ঘুরে বলে বেড়াতে লাগল, 'দেখে যাও তোমরা সবাই, জুরাইজ আমার সাথে ব্যভিচারে জড়িয়েছিলো। এই যে শিশুকে দেখছো, এটা জুরাইজের সন্তান।'

বলা বাহুল্য—জনপদের সবাই হতবাক হয়ে গেলো এবং মহিলার এমন চাক্ষুষ প্রমাণ দেখে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো যে—এহেন জঘন্য কাজটা জুরাইজই করেছে। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে জুরাইজকে মারধর করতে শুরু করলো। শুধু তা-ই নয়,

জুরাইজ যেখানটায় বসে এক ধ্যানে আল্লাহর ইবাদত করতো, সেই ঘরটাকেও তারা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো।

জুরাইজের কাছে যখন শিশুটাকে আনা হলো, তখন তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমাকে তোমরা একটুখানি সময় দাও। আমি আমার রবের কাছে একটু প্রার্থনা করতে চাই।'

জুরাইজকে সময় দেওয়া হলো। প্রার্থনা শেষে শিশুটাকে উদ্দেশ্য করে জুরাইজ বললেন, 'বলো, কে তোমার বাবা?'

আল্লাহর কী অপার মহিমা, সদ্যজাত শিশুটা সকলের সামনে বলে উঠলো, 'আমার বাবার নাম অমুক। আর অমুক জায়গায় সে মেষ চরায়।'

কোলের শিশুর মুখে এহেন জবাব শুনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায় সবাই! জুরাইজের ধার্মিকতা নিয়ে, তার আমল-ইবাদত নিয়ে যে সন্দেহ জেগেছিলো তাদের মনে, তা সাথে সাথে উবে যায়। তারা জুরাইজের কাছে বেশ অনুতপ্ত হয় এবং তার প্রার্থনার ঘরটাকে মাটির বদলে স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করে দিতে চায়; কিন্তু সে প্রস্তাবে জুরাইজ সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, 'তার দরকার নেই। আমার ঘরটা আগে যেমন ছিলো, তেমনটা করে দিলেই আমার জন্য যথেষ্ট।'[১]

হাদিসটা এখানেই শেষ হয়। এই যে আল্লাহর নেককার বান্দা জুরাইজের জীবনে এই বিপর্যয় নেমে এসেছিলো, এটা কেন হয়েছিলো? কারণ মায়ের ডাকে সাড়া না দেওয়ায় তার মা একদিন বিরক্তিভরে আল্লাহর কাছে এই বদ-দুআ করেছিলেন। তার মা আল্লাহকে বলেছিলেন, কোনো পতিতার মুখ না দেখিয়ে যেন আল্লাহ জুরাইজের মৃত্যু না দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জুরাইজের মায়ের সেই দুআ কবুল করেছিলেন। জুরাইজের মতো নেককার, আমলদার বান্দাকে তিনি ঠিকই পতিতার মুখোমুখি করেছেন এবং তাকে সম্মুখীন করেছেন ভয়াবহ লাঞ্ছনার। জুরাইজ কেবল প্রার্থনার মাঝে মগ্ন থাকতো বলেই তার মায়ের ডাকে সাড়া দিতে পারেননি এবং সেই কারণে এত কঠিন অবস্থার মুখোমুখি তার হতে হয়েছিলো। শাইখ আব্দুল মাজিদ প্রশ্ন করেছেন—আমরা যারা মোবাইল ইন্টারনেটে বুঁদ হয়ে থাকি সারাদিন,

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১২০৬; *সহিহ মুসলিম* : ২৫৫০; *মুস্তাখরাজু আবি আওয়ানা* : ১১১২১; *শুআবুল ঈমান* : ৭৪৯৪

মায়েরা দশটা কথা বললে আমরা যারা একটা কথাও শুনি না, বিরক্তিভরে এড়িয়ে যাই, আমাদের মায়েরা যদি আমাদের জন্য কোনো বদ-দুআ করেন, তাহলে ভাবুন তো, জীবনে কী ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে আমাদের?

মায়ের অবাধ্য যারা, তারা সত্যিকার অর্থেই হতভাগা। তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় শান্তি। জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে তারা নিদারুণ ব্যর্থ হবেই। আর আখিরাতে চূড়ান্ত ব্যর্থতা তো আছেই। সুতরাং, আমাদের বারংবার ব্যর্থতার কারণ আমাদের নিরন্তর হেরে যাওয়ার সম্ভাব্য সূত্রটা সম্ভবত এখানেই লুকোনো। ভেবে দেখা উচিত, আমাদের জীবনে আমাদের মায়েরা কোন অবস্থানে আছেন।

চার.

আজকালকার দুনিয়ায় 'ভাল্লাগেনা' একটা রোগের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের চারপাশে তাকালে আমরা এমন হাজার হাজার লোকের সন্ধান পাবো, যারা জীবন নিয়ে চরম পর্যায়ের হতাশ। এমন নয় যে, তাদের অর্থকড়ি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা নাম-যশ-খ্যাতির অভাব। তাদের কোনোকিছুরই অভাব নেই। তাদের সবকিছু আছে, তবু সবকিছু থেকেও যেন কোথাও কিছু নেই। তাদের জীবনে যেন এক বিশাল শূন্যতা বিরাজ করে আছে! প্রাপ্তিতে ভরে ওঠা তাদের জীবনপাতাটা জুড়ে যেন এক অদৃশ্য অপ্রাপ্তির আনাগোনা। আচ্ছা, কেন এমন হয়?

কখনো কখনো কি জীবন থেকে পালাতে মন চায় আপনার? মাঝে মাঝে হাহাকার করে ওঠে মন? ভীষণ মর্মপীড়ায় মাঝে মাঝে হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়? দুনিয়াকে বিষাক্ত লাগে? কবির মতন করে বলতে মন চায়, 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ?'

কখনো কি ভেবেছেন, কেন জীবনে আপনি তৃপ্তি পাচ্ছেন না? সবকিছু থেকেও কেন আপনার কিছু নেই? কেন আপনার কাজে মন বসে না? একজীবনে পরিতৃপ্তির জন্য যা কিছু উপকরণ দরকার, তার সবটাই তো আপনার কাছে আছে, তবু কেন আপনি ভীষণরকম একা? আপনি হয়তো জানেন না, আপনার এই দুর্বিষহ জীবনের নেপথ্য কারণ। ঠিক কোন কারণে আপনার ভরা বাসন্তী-জীবনে যাতনার প্লাবন, তা আপনার কাছে অজানা; তবে আপনার এই অজ্ঞাত, অনির্ণেয় দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবনের একটা কারণ সম্ভবত আমি জানি। আপনাকে উদ্দেশ্য করেই সম্ভবত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

'আর যে আমার স্মরণ থেকে বিস্মৃত হবে, তার জীবন হয়ে পড়বে সংকুচিত।'[১]

আয়াতটির সাথে আপনার জীবনের কি কোনো মিল পাচ্ছেন? এই যে আপনার জীবনজুড়ে হাহাকার, অপ্রাপ্তি, অতৃপ্তি এবং গভীর শূন্যতাবোধ—এর কারণ সম্ভবত আপনি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়েছেন। আল্লাহর স্মরণ মানে হলো—জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুশাসন অনুসরণ করে চলা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা যা আপনার জন্য হালাল করেছেন, তা গ্রহণ করা এবং যা-কিছু তিনি হারাম করেছেন, তা এড়িয়ে চলা। প্রকৃতভাবে আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহকে ভালোবাসার নামই হলো আল্লাহর স্মরণ।

উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে আরো সহজ হবে। ধরা যাক, আপনি কোনো অফিসের বড় কর্মকর্তা এবং আপনার অধীনে ব্যাপক আকারে কর্মী নিয়োগ হয়ে থাকে। যেহেতু কর্মী নিয়োগের সকল ব্যাপার-স্যাপার আপনার হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়, সুতরাং আপনি চাইলে এখানে স্বচ্ছভাবেও নিয়োগ দিতে পারেন অথবা রাখতে পারেন কোনো জালিয়াতির সুযোগ।

নিয়োগ সাধারণত মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই হয়। আপনার অফিসেও সেটাই হওয়ার কথা। কিন্তু একজন চৌধুরি সাহেব, যার আবার পকেটভর্তি টাকা, তিনি আপনার হাতে লাখ দুয়েক টাকার একটা বান্ডিল গছিয়ে দিয়ে বললেন, 'অমুক আর অমুক আমার লোক। তাদেরকে অমুক অমুক পোস্টে বসিয়ে দেবেন।'

যে দুটো পোস্টে চৌধুরি সাহেবের লোক বসিয়ে দেওয়ার জন্য আপনার কাছে বায়না এবং লোভনীয় সুযোগ এসেছে, সে পোস্টের জন্য আবেদন জমা পড়েছে হাজার হাজার, কিন্তু কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করে, একটা লোক দেখানো পরীক্ষা কিংবা ইন্টারভিউ নিয়ে আপনি সকলকে একে একে বাদ করে দিলেন নানান ছুতোয়। আপনার পকেটে যেহেতু নগদ দুই লাখ টাকা ঢুকে পড়েছে, সেহেতু আর কোনোদিকে তাকানোর সময় কি আপনার আছে? চুলোয় যাক ওসব সততা আর স্বচ্ছতা!

আরো ধরা যাক, সেই দুই লাখ টাকা দিয়ে আপনি কুরবানির ঈদের জন্য একটা ই-য়া-য়া সাইজের গরু কিনলেন। আপনার কেনা গরুর সাইজ দেখে পাড়া-মহল্লায়

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ১২৪

তো হৈহৈ-রৈরৈ অবস্থা! এত বড় গরু দিয়ে এই তল্লাটে আগে কেউ আর কুরবানি দিতে পারেনি। আপনিই প্রথম!

চারদিক যখন আপনার সক্ষমতা আর সম্পদ ত্যাগ করে এত বড় নজির স্থাপনের ভূয়সী প্রশংসায় মাতোয়ারা, আপনার অন্তরে তখন কিন্তু আনন্দের ছিটেফোঁটাও নেই। কারণ আপনি জানেন আপনার অর্জিত টাকা কোনোভাবেই হালাল নয়। আপনি জালিয়াতি ও প্রতারণা করে এই টাকা লাভ করেছেন। আপনি অনেকগুলো মানুষের হক নষ্ট করেছেন আর ধূলিসাৎ করেছেন অনেকগুলো মানুষের স্বপ্ন। আপনি একজন ঠগ, প্রতারক আর জালিয়াত। আর কেউ না জানুক, আর কেউ না দেখুক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো জানেন আপনার এই অসততার ব্যাপারে। বাইরের দুনিয়া আপনাকে যতই মুত্তাকি, যতই পরহেযগার, যত হৃদয়বানই ভাবুক না কেন, আল্লাহর চোখে আপনি অসৎ ও জালিম ছাড়া আর কিছুই নন। সুতরাং, হালাল টাকায় একটা বকরি কুরবানি দিয়ে একজন প্রকৃত মুমিন যে প্রশান্তি আর পুলক অনুভব করে, দুই লাখ টাকায় গরু কিনে আপনি তার ধূলিকণা পরিমাণ তৃপ্তিও পাবেন না। সেই পুলক আল্লাহ আপনাকে দেবেন না। আপনার হৃদয়ে নেই কোনো স্থিরতা, নেই কোনো প্রশান্তি।

এই যে—আপনার তো সবই আছে। একটা বড় কোম্পানির হর্তাকর্তা আপনি, কত লোক আপনার অধীনস্থ, বড় অঙ্কের টাকা মাস শেষে বেতন পান আপনি, কী বিশাল সাইজের গরু দিয়ে কুরবানি করেন, বছরের উমরাটাও হয়তো-বাদ যায় না। এতসব করেও অন্তরে কেন শান্তির লেশমাত্র পান না জানেন? কারণ আপনি প্রকৃতার্থে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তাতেই আপনি ডুবে আছেন আগাগোড়া। আপনার সব থাকবে—উন্নতি, পদোন্নতি, বাড়ি আর গাড়ি। কিন্তু যা থাকবে না, তা হলো অন্তরের প্রশান্তি। এইটার জন্য বিস্বাদ হয়ে উঠবে আপনার জীবন। বিষিয়ে উঠবে আপনার দেহমন। এক অদৃশ্য যাতনার সাগরে ডুবে থাকবেন আপনি। আপনার দালানকোঠা হয়তো আকাশ ছোঁবে, আপনার ক্ষমতার বলয় হয়তো বহুগুণ বিস্তৃত হবে, আপনার নাম-যশ-খ্যাতি হয়তো সীমানা ছাড়িয়ে যাবে, কিন্তু অন্তরের অন্তর্দহনে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হতে থাকবেন আপনি।

এটা কেবলই একটা উদাহরণ মাত্র। জীবনের পদে পদে, ব্যক্তিক কিংবা সামাজিক অথবা প্রাতিষ্ঠানিক—প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হৃদয়ে অটুট রাখতে হবে। জীবনের প্রতিটা অলিতে-গলিতে আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে

আল্লাহর হুকুম-আহকাম; তবেই আমরা প্রকৃত জীবনের স্বাদ লাভ করতে পারবো, নচেৎ আমাদের জীবন ভীষণ বিভীষিকাময় হয়ে উঠবে ধীরে ধীরে। আমরা হারিয়ে ফেলবো জীবনের ছন্দ। আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হলে আল্লাহ আমাদের জীবনকে কঠিন করে তুলবেন আর নিরানন্দ করে দেবেন জীবনের সবকিছু।

পাঁচ.

জীবনের গোলকধাঁধায় আমরা মাঝেমধ্যেই পথ হারাই। মাঝে মাঝে ভীষণ শূন্যতাবোধে যখন হাহাকার করে ওঠে মন, যখন জীবন খুঁজে পায় না জীবনের মানে, তখন জীবন থেকে এক টুকরো ছুটি নিয়ে আমরা নিজেকে খুঁজতে বসি। ভাবতে বসি—কোথায় গিয়ে ঠিক খেই হারাচ্ছে সব? হুমায়ূন আহমেদের ভাষায়—'আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই।' সেই আপনাকে, অর্থাৎ নিজেকে খুঁজে পেতে হলে, খুঁজে পেতে হলে জীবনের সত্যিকার মানে, আমাদের ফিরতে হবে আমাদের রবের দেখানো পথে। সেই পথে, যে পথ গিয়ে মিশেছে অনন্ত অসীমে।

যে সুতোয় বাঁধা জীবন

এক.

খুব কাছের এক ভাইয়ের সম্প্রতি ডিভোর্স হয়ে যায়। বেচারা জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছে সম্পর্কটা টেকানোর, কিন্তু কোনোভাবেই তা পারা গেল না। মেয়ের মায়ের একটাই কথা—তার সাথে নিজের মেয়েকে সংসার তিনি করতে দেবেন না। শেষমেশ মেয়ের মা'র জেদই জিতলো। তাদের সংসার নামক ফুলটা প্রস্ফুটিত হবার আগে কলিতেই ঝরে পড়লো।

ভীষণ মন খারাপ নিয়ে ভাইটা যখন আমার কাছে এলো, কী বলে যে তাকে সান্ত্বনা দেবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ভাঙা হৃদয় নিয়ে একপর্যায়ে ভাইটা আমাকে বললো, সে আর কোনোদিন বিয়ে করবে না। বিয়ের ওপর, আরো নির্দিষ্ট করে বললে মেয়েদের ওপর থেকে তার আস্থা উঠে গেছে!

গভীর দুঃখবোধ যে তাকে গ্রাস করেছে, তা আঁচ করতে পারলাম। তাকে বোঝালাম যে—এটা যতখানি না মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার, তারচেয়েও বেশি তাকদির-সংশ্লিষ্ট। তাকদিরের ফয়সালা তো এমন-ই। তাকদিরের সকল ফয়সালা সর্বদাই যে আমাদের পছন্দনীয় হবে, অন্তত সাথে সাথে—তা কিন্তু নয়। মাঝে মাঝে আমাদের মনে হতে পারে, 'হায়! আমার সাথেই কেন এমনটা হলো?'

মন খারাপের দিনে, যখন বিচ্ছেদ আর বিরহে কাতর হয়ে ওঠে মন, তখন সকল মর্মযাতনার মহৌষধ একটাই—তাকদিরকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া। এর অপর

নাম তাওয়াক্কুল। আল্লাহর ওপর ভরসা করে যাওয়া।

আমার বন্ধু, যে বিরহ বেদনায় কাতর, তাকে তাকদিরের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। যদিও ব্যাপারগুলো আমার চাইতে তার বেশি ভালো জানা থাকার কথা, তথাপি দুঃখের দিনে জানা বিষয়টাও কাছের মানুষের কাছে শুনতে মন্দ লাগে না। মন ভাঙার দিনে কেউ যখন পাশে এসে একটু কোমল গলায় কথা বলে, যখন সান্ত্বনার সুরে মনে একটু সাহস যোগায়—মানুষের তখন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে হলেও বাঁচতে ইচ্ছে করে।

যদি আল্লাহ চান, এই সংসারের চাইতেও ভালো সংসার, এই জীবনসঙ্গীর চাইতেও ভালো জীবনসঙ্গী তাকে মিলিয়ে দেবেন। এই সংসারের কোথাও হয়তো তার জন্য অকল্যাণ লুকিয়ে ছিলো। কোথাও হয়তো-বা এমন অনিষ্ট লেপ্টে ছিলো, যা সে আজকের সময়ে বসে দেখতে পারছে না কিংবা বুঝতে পারছে না; কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে তা কোনোভাবেই অজানা আর অজ্ঞাত নয়। তিনি সময়ের স্রষ্টা আর তিনি জানেন, বান্দার জন্য ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে। যেহেতু তিনি তা জানেন, তাই অনুগ্রহ করে বান্দাকে বাঁচানোর জন্য তিনি যদি বান্দার জীবনের গল্পটাকে অন্যভাবে পাল্টে দেন, যদি আপাতদৃষ্টিতে 'ঠিকঠাক' বয়ে চলা জীবনের স্রোতকে তিনি অন্য খাতে, অন্যদিকে বইয়ে দেন, তাহলে হতাশ হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। সম্মুখে থাকা সম্ভাব্য সকল ক্ষতি আর অকল্যাণ আল্লাহ-ই দেখতে পান শুধু, আমরা পাই না। তাই সেই অকল্যাণের হাত থেকে আমাদের উদ্ধারের নিমিত্তে যখনই তিনি আমাদের জীবনে বিচ্ছেদ ঘটাবেন, বিরহ যন্ত্রণায় আমাদের নিপতিত করবেন, যখন প্রিয় সাথির সাথে আমাদের সম্পর্কচ্ছেদ হবে, যখন প্রিয় মানুষ আমাদের জীবন থেকে চলে যাবে, তখন ভেঙে পড়া চলবে না। আমাদের জীবনের অপূর্ণ গল্পটাকে পুরা করবার ভার আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত করতে হবে। আর আল্লাহ কখনোই তার অনুগত বান্দার জন্য অকল্যাণ চান না।

দুই.

সুরা কাহফে আমরা খিযির আলাইহিস সালামের সাথে মুসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাতের যে বিবরণ দেখতে পাই, তাতে বিস্ময়কর একটা ঘটনা আছে। মুসা আলাইহিস সালাম এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, খিযির আলাইহিস সালামের সমস্ত কর্মকাণ্ড তিনি ধৈর্য ধরে অবলোকন করবেন ও শিখবেন।

খিযির আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে একটা নৌকায় চড়লেন। নৌকা থেকে নামার আগে ওই নৌকায় তিনি একটা ফুটো করে দেন। এটা দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন মুসা আলাইহিস সালাম। বললেন, 'আপনি এই কাজ কেন করলেন? এটা তো ঠিক করলেন না।'

খিযির আলাইহিস সালাম বললেন, 'কথা ছিলো আপনি আমার সমস্ত কাজ ধৈর্য ধরে দেখবেন। আমি না বলা পর্যন্ত কিছু বলতে পারবেন না।'

নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভেবে লজ্জিত হন মুসা আলাইহিস সালাম এবং তিনি খিযির আলাইহিস সালামের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

এরপর লোকালয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা বালক তাদের সামনে এসে পড়ে। খিযির আলাইহিস সালাম এবার করে বসেন আরো আশ্চর্যজনক কাজ! মুসা আলাইহিস সালামের সামনেই তিনি বালকটিকে হত্যা করে ফেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে যান মুসা আলাইহিস সালাম! তিনি অধৈর্য হয়ে বলেন, 'হায়! হায়! এটা আপনি কী করলেন? এই নিরীহ শিশুটাকে আপনি মেরে ফেললেন? এটা কি আপনি ঠিক কাজ করলেন?'

খিযির আলাইহিস সালাম বললেন, 'আপনি কিন্তু আবারও ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছেন।'

পুনরায় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন মুসা আলাইহিস সালাম।

এরপর চলতে চলতে তারা একটা বাড়ির কাছে এসে ওই বাড়ির লোকেদের কাছে কিছু খাবার চাইলেন; কিন্তু বাড়ির লোকেরা তাদেরকে কিছু খেতে দিলো না। ওই বাড়ির পাশে একটা ভগ্ন-প্রায় দেওয়াল ছিলো, যা অতি-দ্রুতই ভেঙে পড়বে। খিযির আলাইহিস সালাম ওই দেওয়াল নিজ হাতে মেরামত করে দিয়ে রওনা করলেন নিজের পথে। এবারও অবাক হলেন মুসা আলাইহিস সালাম! ভাবলেন, 'আরে! এরা তো আমাদের কিছু খেতেও দিলো না, তথাপি ইনি তাদের দেওয়ালটা মেরামত করে দিলেন কেন? আচ্ছা, তা নাহয় দিলেন, কিন্তু এর বিনিময়ে তো কিছু পারিশ্রমিক তিনি চাইতে পারতেন তাদের কাছে, যা দিয়ে আমরা কিছু কিনে খেতে পারতাম?'

মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'আপনি তো চাইলে এই কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।'

এবার খিযির আলাইহিস সালাম বললেন, 'আপনার সাথে আমার যাত্রা এখানেই সমাপ্ত। ধৈর্য ধরে রাখার শর্তারোপ থাকা সত্ত্বেও আপনি বারে বারে ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছেন; তবে যে তিনটি ঘটনা আপনি দেখেছেন, তার ব্যাখ্যা আমি আপনাকে বলবো।

আপনি দেখেছেন, একটা নৌকায় আমি ফুটো করে দিয়েছিলাম। তা এজন্যই যে—সমুদ্রে, কিছুটা দূরেই এক রাজা জেলেদের যা নৌকা পাচ্ছে, সব অন্যায়ভাবে জব্দ করে নিচ্ছে। আমরা যে গরিব মাঝির নৌকায় চড়েছি, ফুটো করে দেওয়ার ফলে তা বেশিদূর এগোতে পারবে না। যেভাবেই হোক—সে নৌকাটাকে কূলে ভিড়াবে। ফলে ওই লোভী রাজার হাতে জব্দ হওয়া থেকে বেঁচে যাবে দরিদ্র মাঝির নৌকাটা।

দ্বিতীয়বার আপনি দেখেছেন, আমি একটা বালককে হত্যা করেছি। তা এজন্যই যে—ওই বালক বড় হলে আল্লাহর অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে যেতো, কিন্তু তার বাবা-মা আল্লাহর খুবই একনিষ্ঠ বান্দা। ওই সন্তানের কারণে তার পিতা-মাতাকে ভবিষ্যতে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। ফলে আমি ওই বালককে হত্যা করি এবং আমি এ-ও আশা করি, তার বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের নেককার সন্তানাদি দান করবেন।

তৃতীয় এবং সর্বশেষ যে ঘটনাটা আপনি দেখেছেন, তা হচ্ছে—আমি কিছু অকৃতজ্ঞ মানুষদের ভগ্ন-প্রায় দেওয়াল বিনা পারিশ্রমিকে মেরামত করে দিয়েছি। তা এজন্যই—ওই দেওয়ালটা ছিলো শহরের দুই ইয়াতিম শিশুর। দেওয়ালের নিচে তাদের বাবার রেখে যাওয়া কিছু লুকানো সম্পদ আছে। দেওয়ালটা যদি এখনই সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়, তাহলে গুপ্ত সম্পদগুলো প্রকাশ্যে চলে আসবে এবং ওই অন্য লোকেরা তা আত্মসাৎ করে ছাড়বে। ছোটো শিশু দুটোর তাতে কিছুই করার থাকবে না তখন। যেহেতু আমি দেওয়ালটা মেরামত করে দিয়েছি, শিশুগুলো বড় হওয়ার আগে সেটা ভেঙে পড়ার কোনো সম্ভাবনা অবশিষ্ট নেই। আর তারা বড় হওয়ার পরে যখন সেটা ভাঙবে, তত দিনে নিজেদের সম্পদ বুঝে নেওয়ার বয়স তাদের হয়ে যাবে।'[১]

---

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ৭০-৮২

এই ঘটনা তিনটাতে আমরা দেখতে পাই—খিযির আলাইহিস সালামের সাথে ধৈর্য ধরে রাখার শর্তে আবদ্ধ থাকার পরও মুসা আলাইহিস সালাম বারংবার নিজের ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হচ্ছিলেন। এর কারণ হলো—মুসা আলাইহিস সালাম তাকদির সম্পর্কে জ্ঞাত নন। আল্লাহ তাকে সেই জ্ঞান প্রদান করেননি, যা তিনি খিযির আলাইহিস সালামকে দিয়েছিলেন। ফলে একই বিষয়ে মুসা আলাইহিস সালাম বিচলিত, বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত হলেও খিযির আলাইহিস সালাম ছিলেন শান্ত ও স্থির।

খিযির আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে জানতে পেরেছিলেন এক অসাধু রাজার ব্যাপারে, যে দরিদ্র মাঝিদের নৌকা জব্দ করছে। এক মাঝিকে সেই অসাধু রাজার অন্যায় কাজ থেকে বাঁচাতে তিনি মাঝির নৌকায় ফুঁটো করে দেন যাতে নৌকাটা আর বেশিদূর না এগোতে পারে। নৌকার মাঝির কাছে এবং মুসা আলাইহিস সালামের চোখে খিযির আলাইহিস সালামের এই কাজ ভারি অন্যায়ের। এই কাজের ভবিষ্যৎ ফলাফল জানতেন না বলেই তারা এমনভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু তাকদির তথা আল্লাহর কৌশল ভিন্ন। তিনি আপাত ক্ষুদ্র ক্ষতি দিয়ে ওই দরিদ্র মাঝিটাকে বৃহৎ ক্ষতির রাস্তা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

একইভাবে ওই বালক হত্যার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার বাবা-মাকে ভবিষ্যৎ বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। খাবার চেয়ে তিরস্কৃত হওয়ার পরেও ভগ্ন-প্রায় দেওয়াল বিনা পারিশ্রমিকে মেরামত করিয়ে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুই ইয়াতিম শিশুর সম্পদকে সুরক্ষিত করে রাখলেন।

এসব-ই আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ। ভূত ও ভবিষ্যৎ কেবল আল্লাহই জানেন, আমরা জানি না। আর জানি না বলেই আমরা খুব সহজেই বিচলিত হয়ে পড়ি। আপাত ক্ষতিতে, আপাত বিচ্ছেদে, আপাত বিরহে আমরা ভেঙে খান খান হয়ে যাই।

যদি আমি আল্লাহর কাছে সৎ থাকি, যদি আমি এই ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হতে পারি যে, কোনো অন্যায় আমি করিনি; তাহলে আমার কোনোভাবেই উচিত নয় তাকদিরের ফয়সালার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া। কোনোভাবেই আল্লাহর পরিকল্পনাকে দোষারোপ করা আমার কাজ হতে পারে না।

ডিভোর্সের বেলায়, যদি আপনি সৎ থাকেন আপনার সঙ্গীর ব্যাপারে, তার অধিকারের ব্যাপারে যদি আপনার দিক থেকে কোনো অন্যায় না হয়ে থাকে,

আপনার সততা, ভালোবাসা, মায়া এবং যাবতীয় আত্মিক সম্পর্কের নিয়ামকগুলো বহাল থাকা সত্ত্বেও যদি আপনার সংসার ভেঙে যায়, যদি আপনার জীবনসঙ্গী আপনাকে অপছন্দ করে ছেড়ে চলে যেতে চায়—তাহলে তাকে যেতে দিন। আল্লাহ হয়তো-বা আপনার জন্য ভিন্ন কোনো পরিকল্পনা এঁকেছেন, যা আপনি এই মুহূর্তে বসে দেখতে পাচ্ছেন না। হয়তো আরো যোগ্য কেউ, আরো ভালো, আরো চক্ষু শীতলকারী কোনো জীবনসাথি আপনার জন্য তিনি নির্ধারণ করেছেন, যার কাছে যেতে হলে আপনাকে এই সম্পর্ক থেকে বেরোতে হবে। তিনি আপনাকে একটা জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে, একটা নির্মল পরিবেশ দিতে চান। সেই নির্মল, নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে যেতে আপনাকে একটা দুঃখের নদী পার হতে হবে। এই বিচ্ছেদ-ব্যথা হলো সেই দুঃখের নদী। সেটা পার হন, তবে আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞচিত্তে।

সেই মাঝি জানতো না, তার জন্য কী অপেক্ষা করে ছিলো সমুদ্রে; সেই বালকের বাবা-মা জানতো না, ভবিষ্যতে কোন দুর্ভোগ তাদের জন্য ওত পেতে আছে; সেই ইয়াতিম শিশুগুলো জানতো না, তাদের জন্য কী সম্পদ লুকায়িত আছে দেয়ালের নিচে। কেউ-ই কিচ্ছু জানতো না। না জানার কারণে বিচলিত হয়ে পড়াটা মানুষের বৈশিষ্ট্য; তবে এমন দুঃখের দিনে, এমন দুর্ভোগ আর দুর্দিনে যদি আল্লাহর পরিকল্পনাকে ভালোবেসে ফেলা যায়, নিজেকে সেই পরিকল্পনার অংশ মনে করা যায়, তাহলে অন্তর থেকে বিদেয় দেওয়া যায় যাবতীয় দুঃশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনাগুলোকে।

তিন.

জীবনে যা কিছু ঘটে, তার পেছনে আল্লাহর একটা পরিকল্পনা থাকে। কোনো মুমিন বান্দার জীবনে যখন কোনো দুর্যোগ নেমে আসে, যখন কোনো বিপদ এসে লন্ডভন্ড করে দিয়ে যায় তার জীবনের সাজানো উঠোন, তখন হতবিহ্বল না হয়ে সেই পরিকল্পনায় নিজেকে সঁপে দেওয়ার মাঝেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন শিশু ইসমাইল আলাইহিস সালামসহ হাজেরা আলাইহাস সালামকে জনমানবহীন মক্কার রুক্ষ এক উপত্যকায় রেখে যান, সেই দৃশ্যের কথা ভাবলে মনে হয়, একজন নারীর জীবনে এর চাইতে বেদনাবিধুর মুহূর্ত আর থাকতেই পারে না। এমন নির্জন সে প্রান্তর—দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোনো মানবকুলের আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় না। খাবারের বন্দোবস্ত নেই, পানির বন্দোবস্ত

নেই। এমনকি একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত ছিলো না সেখানে। হাজেরা আলাইহাস সালামের জন্য তার ওপর আরো কঠিন বিয়োগ-ব্যথা ছিলো—ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাছ থেকে দূরে থাকা। এই যে এত আসন্ন বিরহ ও বিপদ, সম্মুখে এত রুক্ষ-কঠিন দিনের চোখ রাঙানি—সমস্তকিছু জেনেও সেদিন হাজেরা আলাইহাস সালাম কান্নায়, দুঃখে, রাগে ফেটে পড়েননি। ভীষণ হতাশায় আর্ত-চিৎকার করে তিনি জানতে চাননি, 'কেন আমার সাথেই এমন হচ্ছে? কী দোষ আমি করেছি?' বরং তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনি যা করতে যাচ্ছেন, তা কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশ?'

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, 'হ্যাঁ।'

হাজেরা আলাইহাস সালাম তখন বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় আমার রব আমাকে তার দয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না।'[১]

কোলের শিশুকে নিয়ে হাজেরা আলাইহাস সালাম সেই একাকী রুক্ষ নির্জন প্রান্তরে থাকতে রাজি হয়ে গেলেন শুধু এইটুকু আশ্বাস পেয়ে, এই কাজের নির্দেশ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছ থেকেই পেয়েছেন। এমন ভাগ্যকে বরণ করে নিতে আর কোনো আশ্বাসবাণী, আর কোনো সান্ত্বনাবাক্য হাজেরা আলাইহাস সালামের দরকার পড়েনি। কারণ তিনি জানতেন, আল্লাহর কোনো এক পরিকল্পনার মধ্যে তিনি যুক্ত হতে চলেছেন এবং সেই পরিকল্পনায় তার জন্য এমনকিছু অপেক্ষা করে আছে, যা কল্পনার চেয়েও সুন্দর, স্বপ্নের চাইতেও অবিশ্বাস্য! যেহেতু এই পরিকল্পনাকারী স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা-ই, তাই এই পরিকল্পনায় অখুশি হওয়ার, অতৃপ্তি মনে পুষে রাখার এবং এই পরিকল্পনায় অসম্মতি জ্ঞাপনের কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না।

হাজেরা আলাইহাস সালামের বিশ্বাস অমূলক ছিলো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এক মহা-পরিকল্পনার মধ্যে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন সেদিন। হাজেরা আলাইহাস সালামের সেদিনকার সেই কষ্টের দিনগুলোর বিনিময়ে, সেই রুক্ষ-কঠিন একাকী নির্জন প্রান্তরের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোর বদৌলতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪; *তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড : ১৭; পৃষ্ঠা : ১৯; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬; *তাফসিরুল বাগাভি*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৩৫৬

তাআলা তাকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে এমনভাবে স্মরণীয় করে রাখলেন যে, কিয়ামত অবধি যতজন মুসলিম হজ আর উমরা সম্পন্ন করবে, তাদেরকে অতি-অবশ্যই হাজেরা আলাইহাস সালামের স্মৃতিকে স্মরণ করতে হবে। তার স্মৃতি স্মরণ করে সাফা-মারওয়ায় দৌড়াতে হবে। আর ইসমাইল আলাইহিস সালামের স্মৃতিবিজড়িত যমযম কূপ তো ইতিহাস-ই হয়ে থাকলো!

এটাই হলো সেই প্রাপ্তি, যা আল্লাহর পরিকল্পনায় ভরসা রাখলে পাওয়া যায়। তিনি হয়তো মাঝে মাঝে আমাদের কষ্টে রাখেন, হয়তো-বা মাঝে মাঝে আমাদেরকে তিনি কোনো বিয়োগ-ব্যথা, কোনো বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। কোনো আর্থিক-শারীরিক ক্ষতি হয়তো-বা আমাদের হয়ে থাকে, কিন্তু যখনই আমাদের ভরসার পারদ হাজেরা আলাইহাস সালামের স্তরে উন্নীত হবে, যখনই মন থেকে এই বিশ্বাসের সুর প্রতিধ্বনিত হবে যে, 'নিশ্চয় আমার রব আমাকে তার দয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না', তখনই আমাদের জন্য খুলে যাবে আসমানের দরোজা। আমাদের ধৈর্যের, আমাদের ত্যাগের, আমাদের সকল দুঃখ আর কষ্টের বিনিময়ে তখন এমন প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করা হবে, যা স্বপ্নেরও অতীত!

শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে হত্যার জন্য যখন ফিরআউন বাহিনী পাগলপারা, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে বাকসো-বন্দি করে নদীতে নিক্ষেপ করার জন্য তার মাকে নির্দেশ দিলেন। একজন মায়ের কাছে কোলের শিশুকে নদীতে নিক্ষেপ করবার মতন কঠিন কাজ দুনিয়ায় আর কী হতে পারে? ভয়, শঙ্কা আর বিহ্বলতায় অস্থির হয়ে যাওয়া মুসা আলাইহিস সালামের মা যখন আল্লাহর আশ্বাসবাণী পেলেন, যখন শুনলেন, তার কোলের মানিককে তার-ই কাছে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখনই তার হৃদয়ের সমস্ত ভয়, সমস্ত দ্বিধা কেটে যায়। আল্লাহর কোনো এক পরিকল্পনার অংশ যে তার শিশুপুত্র হতে যাচ্ছে—তা তিনি বুঝে যান সাথে সাথেই। ফলে সেই পরিকল্পনা থেকে ছিটকে না গিয়ে বরং বিপুল আগ্রহে তিনি তাতে জড়িয়ে গেলেন।

তার পরের ঘটনাও আমাদের জানা। মুসা আলাইহিস সালাম বিপুল-বিক্রমে তার মায়ের কাছে ফিরেছিলেন। তার কাছে পদানত হয়েছিলো দোর্দণ্ড প্রতাপের ফিরআউন বাহিনী। সেদিন মায়ের কাছে শুধু সন্তানকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি; বরং তাকে একজন প্রসিদ্ধ নবির মর্যাদা দান করা হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জীবনকে নিয়ে যে ছক আঁকেন, তাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস এনে, তা থেকে কল্যাণ এবং দয়া কামনা করে নিজের চেষ্টাটুকু যদি করে যাওয়া যায়—যেভাবে হাজেরা আলাইহাস সালাম করে গিয়েছিলেন মক্কার একাকী নির্জন প্রান্তরে শিশু ইসমাইল আলাইহিস সালামকে নিয়ে, যেভাবে মুসা আলাইহিস সালামের মাতা করেছিলেন ফিরআউন বাহিনীর বিপরীতে—তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, জীবনের কোনো এক পর্যায়ে সেই চেষ্টার, সেই ত্যাগের, সেই ধৈর্যের ফল আমরা অবশ্যই পাব। দুনিয়াতে অথবা অনন্ত আখিরাতে।

চার.

নবি ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মিশরের মন্ত্রীর পদে আসীন করেছেন; কিন্তু দেখুন—মর্যাদার এই স্তরে উন্নীত করতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কত তীব্র পরীক্ষার মুখোমুখি করেছিলেন। ছোটোবেলায় ভাইদের দ্বারা অন্ধকারকূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া, বণিকদলের দ্বারা অন্যত্র ক্রীতদাস হিশেবে বিক্রি হয়ে যাওয়া, বাদশাহর স্ত্রীর অশালীন প্রলোভন এবং সর্বোপরি জেল! কী এক তীব্র সংকট আর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই না কেটেছে নবি ইউসুফ আলাইহিস সালামের সেই দিনগুলো!

কিন্তু দৃশ্যপটের শেষটা কেমন ছিলো?

আমরা জানি—ইউসুফ আলাইহিস সালাম জীবনের একটা পর্যায়ে এসে সেই সবকিছু পুনরায় ফিরে পেয়েছেন, যা তিনি একদিন হারিয়েছিলেন—তার দয়াময় বাবা, ভাই ও পরিবার। মিশরে একদিন অসহায় ক্রীতদাস হিশেবে যে বালক প্রবেশ করেছিলো, নির্দিষ্ট সময়ের পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে আসীন করে দিলেন সেখানকার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পদে! তাকে নবুওয়াত দান করলেন এবং পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত করলেন একজন সম্মানিত নবি হিশেবে! কী অসাধারণ প্রাপ্তি ছিলো সেগুলো!

মুসা আলাইহিস সালামের জন্য যিনি দরিয়ায় পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন, একদিন তিনিই কিন্তু আদেশ করেছিলেন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করার।

নবি ইউনুস আলাইহিস সালামের মাছের পেটের ভেতর থেকে বেঁচে আসাটা আমাদের পুলকিত করে, কিন্তু সেই পুলকের পেছনের কার্যকারণ কতখানি

ভীতি-জাগানিয়া তা কি ভেবেছি কখনো?

গভীর সমুদ্রতলে, সেই বিশালকায় মাছের পেটে, যেখানে দুনিয়ার কোনো শব্দ, কোনো আওয়াজ পৌঁছে না, যেখানে বিস্তৃত জায়গাজুড়ে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার—এমন পরিস্থিতিতে আরশের অধিপতি নবি ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন।

তিনি যথেষ্ট হলেন ঠিক-ই, তবে নবি ইউনুস আলাইহিস সালামকে কঠিন একটা পরীক্ষার মুখোমুখি করার পরে।

আপনি হয়তো কোনো একটা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। হতে পারে সেই সংগ্রাম ভীষণ দুঃসহ! আপনি হয়তো প্রিয় কোনো মানুষকে জীবন থেকে হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণায় দগ্ধ। কোনো অপ্রিয় বিচ্ছেদ-ব্যথায় হয়তো আপনি ভীষণ নাজেহাল। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো সমস্যা হয়তো আপনাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। হতে পারে জীবন আপনার ছক অনুযায়ী চলছেই না।

জীবনের এইসব সংগ্রামে আপনি ক্লান্ত হতে পারেন মাঝে মাঝে, তবে হতোদ্যম হবেন না। বিচ্ছেদ-ব্যথায় আপনি কাঁদতেও পারেন, যেভাবে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জ্যোতি হারিয়েছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। কাঁদুন, অশ্রু ঝরান, ব্যাকুল হোন; কিন্তু কখনোই আল্লাহকে অভিযুক্ত করবেন না। ধৈর্য রাখুন। আপনার জীবনের যে অংশটা এখনো বাকি, যে অংশে আপনার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে, তা আপনি জানেন না—তার জন্য আল্লাহকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন না।

মাছের পেটে বিলীন হয়ে ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহকে অভিযুক্ত করেননি। শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করে তার মা অভিযোগের তির ছুঁড়ে দেননি আল্লাহর দিকে। প্রিয়তম পুত্র ইউসুফকে হারিয়ে ভীষণ বিচ্ছেদে কাতর হয়ে পড়ার পরেও একটিবারের জন্য আল্লাহর ওপর থেকে ভরসা হারাননি নবি ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। তিনি এত কেঁদেছিলেন যে, তার চোখের জ্যোতি পর্যন্ত চলে গিয়েছিলো; কিন্তু অন্তরের গভীরে তার ছিলো আল্লাহর ওপর টইটম্বুর তাওয়াক্কুল। তিনি জানতেন—আল্লাহ নিশ্চয় একটা সুন্দর পরিণতির দিকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

জীবনের সাময়িক চিত্রনাট্যে বিলীন হয়ে যাবেন না। যে সুতোয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার জীবনকে বাঁধতে চান, তাকে ধৈর্যের সাথে আলিঙ্গান করুন। বিশ্বাস করুন, রাত পোহালে একটা সুন্দর সকাল আপনার জীবনটাকেও রাঙিয়ে যাবে।

গাহি নতুনের গান

এক.

বাড়ি গেলে আজকাল ভীষণরকম মন খারাপ হয়। আমার বড় ভাইকে পইপই করে বুঝিয়ে বলেছিলাম কেন তার স্ত্রীর, অর্থাৎ আমার ভাবির উচিত নয় আমার সামনে আসা, আমার সাথে কথা বলা। যদি কথা বলতেই হয়—তাহলে সে যেন অবশ্যই যথাযথ পর্দার সাথে কথা বলে।

আমার ভাই আমার কথা হয়তো বুঝতে পারেননি অথবা আমি অধম তাকে বোঝাতে হয়তো উপর্যুপরি ব্যর্থ, যার দরুন বাড়ি গেলে এখনো আমাকে সেই আগের করুণ অবস্থার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। কেবল তা-ই নয়, গ্রামের মহিলাদের মধ্যে পর্দার জ্ঞান একেবারে নেই বললেই চলে। পর্দা বলতে তারা কেবল বাইরে বেরোনোর সময় একটা ছিপছিপে বোরকা পরাকেই বুঝতে শিখেছে। মাহরাম ও নন-মাহরামের একটা সরল সীমারেখা যে ইসলামে বিদ্যমান, তার কিঞ্চিৎ জ্ঞানও আমি গ্রামের অধিকাংশ মহিলার মাঝে দেখতে পাই না। দোষটা যে মোটাদাগে তাদের একার, তা কিন্তু নয়। দোষটা সমানভাবে আমাদেরও। আমরা তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পারিনি। আমাদের জুমুআর খুতবাগুলোতে কিংবা ওয়াজ-মাহফিলগুলোতে গতানুগতিক আলোচনার বাইরে আমরা কখনোই পর্দা, মাহরাম নন-মাহরামের মতন ব্যাপারগুলো নিয়ে আলাপ করি না। নারী-পুরষের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে শারিয়ার টেনে দেওয়া যে সীমারেখা, সেই সীমারেখার আলাপ আমাদের আলোচনায় ভীষণভাবে অনুপস্থিত।

ফলে, আগে যেখানে আঁধার ছিলো, এখনো সেখানে ঘোর আঁধারের ঘরবসতি।

একটা কথা আমাদের সমাজে খুব প্রচলিত। লোকমুখে শুনি—'বড় ভাবি মায়ের মতো।' বড় ভাইয়ের বউকে মা জ্ঞান করার বিদ্যে নিয়ে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মুসলিম শিশু বড় হয়ে ওঠে। দ্বীনের বুঝ আসার পরেই আমি বুঝতে পারলাম, কথাখানা কতখানি ভয়ানক! বড় ভাইয়ের বউ, যার সাথে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই, যে ধর্মমতে আমার জন্য মাহরামও নয়, তাকে দেওয়া হয়েছে মায়ের সমান আসন! আমি এমন অনেকগুলো পরিবার সম্পর্কে জানি, যেখানে পরিবারের বড় ভাই বিদেশে আর ছোট ভাই বড় ভাইয়ের বউয়ের সাথে দিব্যি পরকীয়া করে বেড়াচ্ছে। বাঙালি মুসলিম সমাজে আজকাল এসব ব্যাপার এত সহজ আর খোলামেলা হয়ে উঠেছে যে—এগুলোকে এখন খুব গুরুতর অপরাধ হিশেবে দেখা হয় না। সমাজ যাকে তুলনা করেছে মায়ের সাথে, যাকে দিয়েছে মায়ের সমান মর্যাদা আর আসন, ঠিক তার সাথেই আবার পরকীয়া! কেমন অদ্ভুতুড়ে না?

কিন্তু এটাই নিরেট সত্য। বাঙালি মুসলিম সমাজে আজ পর্দা-প্রথার যে করুণ দশা, তা দেখলে দ্বীনের জন্য দরদ রাখে এমন যে-কারো বুক হুহু করে উঠবে। শুধু তো বড় ভাইয়ের বউই নয়, আমাদের বড় ভাইয়েরা, যারা যথেষ্ট যত্নের সাথে বিয়ের পর শালিদের সঙ্গে যে মধুর ভাই-বোনের সম্পর্কটা পাতায়, সেটাও যে কতটা সাংঘাতিক, তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে! এমন আরো বহু এবং নানাবিধ মধুর সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছে আমাদের সমাজগুলো, যা দ্বীন ইসলাম কখনোই, কোনোভাবে, কোনোরূপে সমর্থন করে না।

দুই.

কুরআনে আমরা দেখি—মুসা আলাইহিস সালাম যখন নিরাশ্রয় অবস্থায় মাদইয়ানে আসেন, তখন একটা কূপের অদূরে দুটো রমণীকে তিনি দেখতে পান, যারা তাদের বকরিগুলোকে নিয়ে একপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। কূপ থেকে পানি নেওয়ার বদলে জড়তা নিয়ে অদূরে তাদের দাঁড়িয়ে থাকবার কারণ মুসা আলাইহিস সালামের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠলো।

তখন কূপের কাছে ছিলো কয়েকজন পুরুষ, যারা নিজেদের প্রয়োজনের পানি কূপ থেকে তুলে নিচ্ছিলো। যেহেতু কূপের কাছে পুরুষদের আনাগোনা, ফলে মেয়েদুটো সেই আনাগোনার মাঝে নিজেদের হাজির করার চাইতে অদূরে দাঁড়িয়ে পুরুষদের

প্রস্থানের জন্য অপেক্ষা করাটাকেই শ্রেয় মনে করলো।[১]

আচ্ছা, পুরুষদের পাশাপাশি মেয়ে দুটোও যদি কূপের কাছে গিয়ে পানি নেওয়ার জন্য তোড়জোড় আরম্ভ করতো, কী হতো তাহলে? তারা কি গিয়ে বলতে পারতো না, 'ভাই, জায়গা দেন, আমরাও একটু পানি নিই?'

নিজের অধিকার ও দরকার সামলাবার জন্য এভাবে পুরুষদের সাথে বাদানুবাদে জড়ালে কোনো ক্ষতি ছিলো কি? আসলে ক্ষতি ছিলো কি না, তা বলা যায় না; তবে দ্বীনের উত্তম পন্থা যে লঙ্ঘন হতো, নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আপনি বলতে পারেন—এখানে উত্তম পন্থা কোনটা তাহলে? নিজের অধিকারটুকু ছেড়ে দিয়ে অন্যকে সুযোগ করে দেওয়া? সেটাও নয়। এখানে মূল বিষয়টা লজ্জা তথা—রমণীয় গুণের!

আপনি যদি আধুনিকতাবাদ কিংবা অধুনা দুনিয়ার নারীবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন, আপনার মতামত হবে কূপের কাছে গিয়ে সেসব পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, সমানে সমান জোর খাটিয়ে নিজ প্রয়োজন সেরে নেওয়া। কুরআনে বর্ণিত মেয়েদুটোর জন্য আপনার প্রস্তাবিত পরামর্শ থাকতো এরকম। কতিপয় পুরুষদের দেখে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা, নিজ প্রয়োজন সারা থেকে নিবৃত্ত হওয়াকে আপনি নিতান্তই বোকামো জ্ঞান করবেন নিঃসন্দেহে।

কিন্তু আল্লাহর প্রস্তাবিত পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি নারী ও পুরুষের জন্য একটা লজ্জার বন্দোবস্ত করেছেন। টানিয়ে দিয়েছেন একটা সীমারেখা। মেয়েদুটোর জন্য মাহরাম নয়, এমনসব পুরুষের যাবতীয় সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাই ছিলো তাদের রবের আদেশ। তারা চাইলে সেই কূপের কাছে গিয়ে পানি নেওয়া শুরু করতে পারতো কিংবা কূপের কাছে দাঁড়িয়ে পুরুষদের অনুরোধ করতে পারতো তারা যেন তাদের জায়গা করে দেয়।

তবে এতে করে মেয়েদুটোকে পুরুষদের কাছাকাছি আসতে হতো। হয়তো তাদের সাথে কথাও বলতে হতো, কিন্তু কাজটাকে তারা নিজেদের জন্য সমীচীন মনে করেনি। অপরিচিত, মাহরাম নয়, এমন পুরুষদের সাথে কথা বলা কিংবা তাদের কাছাকাছি অবস্থান করাটাকে তাদের কাছে যথার্থ মনে হয়নি। এমন তো নয়

[১] দ্রষ্টব্য—সুরা কাসাস, আয়াত : ২৩-২৪

যে, পুরুষগুলো কূপটাকে দখল করে বসে থাকবে। মেয়েদুটো জানতো—দরকার পূরণ হলে পুরুষেরা সেখান থেকে নিশ্চিতভাবে সরে যাবে। তখন তারা তাদের বকরিগুলোকে পানি পান করানোর জন্য একটা নির্বিঘ্ন সুযোগ লাভ করবে। তার জন্য একটু অপেক্ষা হয়তো করা লাগবে, কিন্তু তা তো কিছু নন-মাহরাম পুরুষের কাছাকাছি যাওয়া, তাদের সাথে কথা বলার চাইতে ঢের উত্তম।

এই যে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা, পুরুষদের কাছাকাছি না ঘেঁষা, তাদের সাথে কথাবার্তায় না জড়ানো—এসবকে কখন আপনি উত্তম বলে ভাবতে পারবেন? যখন আপনার ভেতর দ্বীন পালনের জন্য একটা দরদ থাকবে। দুনিয়ার চোখ দিয়ে তাকালে আপনি এই ঘটনায় 'অধিকার'কে বড় করে দেখবেন, কিন্তু দ্বীনের দরদ নিয়ে তাকালে আপনি এখানে অধিকারের চাইতেও যা বড় করে দেখতে পাবেন, তা হলো—আপনার লজ্জা এবং মুসলিম রমণী হিশেবে আপনার আত্মমর্যাদা!

ইসলামের একটা অর্থ হলো—আত্মসমর্পণ। জীবনের সবকিছুতে, সবখানে দ্বীনকে বড় করে দেখবেন, দ্বীনের বিধি-নিষেধকে গুরুত্ব দেবেন—এই হলো আপনার ওপর ইসলামের দাবি।

কিছু পর-পুরুষ যেখানে জড়ো হয়ে আছে, সেখানে গিয়ে যদিও-বা আপনি দাঁড়াতে পারেন, কথা বলতে পারেন, তথাপি যেহেতু আপনার দ্বীন আপনাকে একটা সীমারেখা বেঁধে দেয়, তাই আপনি যখন আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আপনার দ্বীনের কাছে সমর্পণ করবেন, তখন ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার ওপরে আপনি দ্বীনটাকেই মূল্য দেবেন বেশি।

ওই মেয়ে দুটো, যারা কূপের কাছে কিছু পুরুষ-মানুষ আছে দেখে ওদিকে ঘেঁষেনি, তারাও দ্বীনটাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে। তারা অপেক্ষা করেছিলো লোকগুলো বিদেয় হওয়ার। লোকগুলো চলে গেলেই তারা দুজনে বকরিগুলোকে পানি খাওয়াবে—এমন চিন্তা থেকেই তারা অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। এই যে অপেক্ষা আর ধৈর্য—এটা হলো দ্বীন পালনের নির্যাস। দ্বীনটাকে বড় করে দেখার প্রয়াস।

মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনাটা এখানেই শেষ নয়। মেয়ে দুটো তাদের বকরিকে পানি পান করাতে পারছে না, ওদিকে কূপের কাছে থাকা লোকগুলোও সরতে দেরি হচ্ছে দেখে মুসা আলাইহিস সালাম স্ব-উদ্যোগে, নিজ থেকে এসে মেয়ে দুটোর বকরিগুলোকে পানি পান করালেন কূপ থেকে।

তাদের বকরিগুলোকে পানি পান করিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম একটা গাছের ছায়ায় এসে বসে পড়লেন। মেয়ে দুটোও তাদের বকরিগুলোকে নিয়ে নিজেদের বাড়ির দিকে গেলো। মেয়েরা তাদের বাবাকে সমস্তটা খুলে বলার পরে তাদের বাবা বললেন, 'যাও, লোকটাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি তোমাদের উপকার করেছেন, তার বিনিময়ে আমি তাকে পুরস্কার দিতে চাই।'

বাবার অনুমতিক্রমে তখন মেয়ে দুটোর একজন এসে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বললো। কুরআন সেই ঘটনাকে বিবৃত করে এভাবে—

'তখন নারী দুজনের একজন তার কাছে সলজ্জ-পদে এলো এবং বললো, 'আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন। আপনি আমাদের বকরিগুলোকে পানি পান করিয়েছেন। আমার পিতা এজন্য আপনাকে পুরস্কৃত করতে চান।'[১]

এই আয়াতে একটা শব্দ বিশেষ-বিবেচনার দাবি রাখে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে খুব স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, 'নারী দুজনের একজন সলজ্জ-পদে তার কাছে এলো।' তাদের মধ্যকার একজন যে খুব 'সলজ্জভাবে' মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো এই শব্দ উল্লেখ না করলেও পারতেন; কিন্তু কেন তিনি এই বিশেষ শব্দটাকে আমাদের সামনে উল্লেখ করলেন বলতে পারেন? কারণ হলো—পর্দা। মুসা আলাইহিস সালাম মেয়েগুলোর জন্য মাহরাম নন, পরপুরুষ। পর-পুরুষের সাথে যদি দরকারবশত কথা বলতে হয়, তার সামনে যেতে হয়, তাহলে কতটা লজ্জা-আব্রু নিজের মধ্যে রাখতে হয়, কতটা পর্দা মেনে তার সামনে আসতে হবে, তার একটা সীমারেখা বোঝাতেই এই শব্দকে বাছাই করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

এটাই হচ্ছে ইসলামের সীমা-পরিসীমা। আপনার মাহরাম নয় এমন কারো সামনে যদি আপনাকে যেতে হয়, তাহলে অবশ্যই আপনাকে যথাযথ পর্দা, যথেষ্ট লজ্জা নিজের মধ্যে রেখে তবে যেতে হবে। কিন্তু আমরা কী করি? আমরা মনে করি—আমাদের বড় ভাইয়ের বউয়েরা হচ্ছে আমাদের বড় বোন কিংবা মায়ের সমান। আমাদের শালিরা হচ্ছে আমাদের মায়ের পেটের বোনের মতো। চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, যারা আপনার মাহরাম নয়, তাদের সাথে যদি আপনি আপনার

[১] সুরা কাসাস, আয়াত : ২৫

মাহরামের মতো করেই কথা বলেন, যথেষ্ট পর্দা-বিহীন তার সামনে যান, তার সাথে খোশগল্প করেন, প্রকারান্তরে আপনি কিন্তু দ্বীনের একটা বুনিয়াদি বিষয়কে হালকা করে দেখছেন।

পর-পুরুষের সামনে নিজেকে কতটা গুটিয়ে নিতে হবে, পর-পুরুষকে কতটা এড়িয়ে চলতে হবে, ভয় পেতে হবে, তার আরো একটা উদাহরণ আমরা মারইয়াম আলাইহাস সালামের ঘটনা থেকেও পাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে যখন জিবরিল আলাইহিস সালাম মারইয়াম আলাইহাস সালামের কাছে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ নিয়ে আসেন, তখন নিজের কক্ষে জিবরিলকে দেখে একেবারে ঘাবড়ে যান মারইয়াম আলাইহাস সালাম। কারণ ইতোপূর্বে তিনি কখনো জিবরিলকে দেখেননি। মানুষের বেশ ধরে আসা জিবরিল আলাইহিস সালামকে তিনি পর-পুরুষ ভেবে ভয়ে তটস্থ হয়ে বলে ফেললেন, 'আমি তোমার কাছ থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এবং (আল্লাহকে ভয় করো) যদি তুমি মুত্তাকি হও।'[১]

মারইয়াম আলাইহাস সালামের এই যে ভয় পাওয়া, মানুষের বেশধারী জিবরিল আলাইহিস সালামকে দেখে ঘাবড়ে যাওয়া, তার কাছ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা—এসবকিছুর পেছনেও নেপথ্য কারণ কিন্তু সেই একটাই, আর তা হলো—পর্দা। একজন পরপুরুষের সামনে নিজেকে মেলে ধরার প্রবণতা কিংবা তার সাথে খোশগল্পে মেতে ওঠার সুযোগ দ্বীন ইসলাম আপনাকে দেয় না। যদি তা থাকতো, তাহলে সেদিন মারইয়াম আলাইহাস সালাম জিবরিল আলাইহিস সালামকে দেখে ঘাবড়ে যেতেন না। তিনি আপ্যায়ন করাতেন, বসতে দিতেন, খোশগল্প করতেন। তিনি কিন্তু তা করেননি; বরং অকস্মাৎ এমন একজন মানুষকে দেখে তিনি ভয়-ই পেয়ে গেলেন। পর্দা লঙ্ঘনের ভয়। নিজের ইজ্জত-আব্রু লঙ্ঘন হওয়ার ভয়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি—একবার অন্ধ সাহাবি ইবনু উম্মি মাকতুম রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির কাছে এলে নবিজি উম্মু সালামা ও মাইমুনা রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে ঘরের ভেতরে চলে যেতে বলেন। এমন আদেশ পেয়ে তারা বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইনি তো অন্ধ।' তখন

---

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ১৮

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা তো অন্ধ নও।'[১]

পর্দার গুরুত্ব বোঝার জন্য বোধকরি এই হাদিসটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। উম্মি মাকতুম রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্ধ। তিনি না নবিজিকে দেখতে পান, আর না উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দেখতে পাবেন। তথাপি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে ভেতরে চলে যেতে বলেছিলেন। ওই সাহাবির হয়তো-বা চোখে আলো নেই, কিন্তু উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা তো অন্ধ ছিলেন না। অকারণে, অহেতুক কেনই-বা একজন পর-পুরুষকে দেখবেন তিনি?

আমরা যারা নারীদের সামনে পুরুষের, পুরুষের সামনে নারীর অবাধ যাতায়াত আর মেলামেশাকে হালকাভাবে দেখে থাকি, আমরা যারা বলি, 'একটু গেলে কীই-বা হয়', তাদের জন্য চমৎকার একটা শিক্ষা রয়েছে এই হাদিসে। 'একটু গেলে কী হয়'—এই জিনিস নবিজির চাইতে আমরা নিশ্চয় বেশি বুঝতে পারবো না। তিনি যেখানে নিজের স্ত্রীকে একজন অন্ধ লোকের সামনে অবস্থান করতে দেননি, সেখানে আমরা কীভাবে চক্ষুমান পর-পুরুষদের সাথে আমাদের মা, স্ত্রী, কন্যা, বোনদের মেলামেশাকে জায়েয করতে পারি?

তিন.

আমি এমনকিছু বোনের কথা জানি, যারা ডিপার্টমেন্টের ভাইবা বোর্ডে পুরুষ শিক্ষকের সামনে নিকাব খুলতে কখনোই রাজি হননি। যদিও-বা নিকাব না খোলার জন্য তাদেরকে অনেক অপমান, অনেক লাঞ্ছনা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্তের হুমকিও দেওয়া হয়েছিলো, তথাপি তারা সব অপমান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে মাথায় নিয়ে, কোনো হুমকি-ধমকিকে দ্বীনের চেয়ে বড় করে না দেখে তারা তাদের মতো অটল-অবিচল ছিলেন। এমন অনেক বোনেরাই আছেন, যাদের চেহারা কোনোদিন তাদের পুরুষ সহপাঠী দেখেনি। অদরকারে তাদের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শুনতে পারেনি। তারা কখনোই ছেলে-মেয়ে মিলে করা ক্লাশ-পার্টিগুলোতে যোগ দেননি। বস্তুবাদী সমাজের চোখে এসব হয়তো বড্ড অসামাজিক আচরণ, কিন্তু আল্লাহর চোখে এই ত্যাগ, এই তিতিক্ষা, এই সংগ্রামের মূল্য অবশ্যই অনেক। তাদের কাছে তাদের

[১] *জামি তিরমিযি* : ২৭৭৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪১১২; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬৫৩৭—হাদিসটির সনদ সহিহ

সহপাঠীরা পর-পুরুষ। পর-পুরুষের সামনে নিজের চেহারাকে অনাবৃত করা, তাদের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলা, পার্টি করা ইত্যাদিকে সেই সব বোনেরা দ্বীন-বহির্ভূত কাজ বলে গণ্য করতেন।

আমার স্ত্রীর মুখে তার এক আত্মীয়ার গল্প শুনেছিলাম। উত্তরবঙ্গের দুপুরের কড়া রোদে ভদ্রমহিলাকে ধান শুকাতে-নাড়তে হতো, খড় শুকাতে হতো; কিন্তু বাড়ির সাথে লাগোয়া ছিলো সদর রাস্তা এবং ওই রাস্তায় বাজার বসতো সকাল থেকে। যেহেতু রাস্তা এবং বাড়ির উঠোনের মাঝে কোনো দেওয়াল ছিলো না, নিদেনপক্ষে একটা বাঁশ বা টিনের বেড়াও না, তাই রাস্তা ও বাজারের সমস্ত লোক বাড়ির লোকেদের এবং বাড়ির সমস্ত লোক বাজারের লোকেদের দেখতে পেতো অনায়াসে। এই অবস্থার মধ্যেই বাইরে ধান শুকাতে হতো ওই আত্মীয়াকে, কিন্তু পর্দা করার ব্যাপারে তিনি যেহেতু নাছোড়বান্দা, তাই ওই কড়কড়ে রোদের মাঝে, বোরকা-নিকাব পরেই তিনি দিনভর ধান শুকাতেন আর খড় নাড়তেন। স্বামীর আদেশ ছিলো এই—পর্দা করো আর যা-ই করো বাপু, তোমার কাজ যেন ঠিকঠাক থাকে। কাজ সামলিয়ে তুমি যা ইচ্ছে করো, আমার তাতে কিছু যায় আসে না।'

মহিলাকে তো কাজও করতে হবে, অন্যদিকে পর্দাও করতে হবে। পর-পুরুষের নজর থেকে বাঁচাতে হবে নিজেকে। তাই সেই কাঠফাটা রোদের মাঝেও তিনি নিজের পর্দার ব্যাপারে এতটুকু ছাড় দেননি। এই যে ত্যাগের গল্প, এই গল্পকে আপনি কিন্তু বস্তুবাদের কোনো প্যারামিটার দিয়েই মাপতে পারবেন না। এই ত্যাগের তৃপ্তি ওই মহিলা বুঝবে না, যার কাছে পর্দাটা নিছক ফ্যাশন কিংবা আহ্লাদের বিষয়। ওই মহিলাও বুঝবে না, যার কাছে পর্দাটা একপ্রকার বোঝা। এই ত্যাগের মর্ম ওই পুরুষ বুঝবে না, যে নিজের মা, স্ত্রী, বোন, কন্যার পর্দার ব্যাপারে সচেতন নয়; যে মনে করে তার স্ত্রী-কন্যা আর বোনেরা পর-পুরুষদের সাথে মিশলে, কথা বললে, খোশালাপে মজলে দুনিয়া উল্টে যাবে না।

চার.

আমাদের আরো একটা ব্যামো আছে। আমরা যখন পর্দার কথা বলি, পর্দা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করি, তখন আমাদের মানসপটে জ্বলজ্বল করে একটা বোরকা পরা নারীমূর্তির ছবি ভেসে উঠে। আমরা, পুরুষেরা ধরেই নিয়েছি, পর্দাটা কেবল নারীদের জন্যই। পুরুষের আবার পর্দা কী? দুঃখের ব্যাপার হলো—পর্দা বলতে

আমরা কেবল বোরকা-হিজাবকেই ভাবতে শিখেছি। দৃষ্টিরও যে পর্দা আছে, শ্রবণেরও যে পর্দা থাকে, তা কি আমরা কখনো জানতে চেয়েছি?

কুরআনে সুরা নুরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পর্দার বিধান নাযিল করেছেন। মজার ব্যাপার হলো—সুরা নুরের পর্দা-সংক্রান্ত প্রথম আয়াতটাই পুরুষদের উদ্দেশ্য করে বলা এবং ওই আয়াতে প্রধানত পুরুষদেরকে দৃষ্টির ও লজ্জাস্থানের হিফাযত করতেই বলা হয়েছে। কুরআন যখন পর্দার বিধান নাযিল করেছে, সবার আগে পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছে, কিন্তু অতীব দুঃখের ব্যাপার হলো এই—আজকের সময়ে আমরা পর্দা বলতে যা কিছু বুঝি, সবকিছু একচেটিয়াভাবে নারীদের ওপরেই চাপিয়ে দিই।

পর্দাটা নারী ও পুরুষ দুজনার জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফরয করেছেন। একজন নারী যেমন নিজেকে বোরকা আর হিজাবে আবৃত করবে, নিজের রূপ-লাবণ্যকে পর-পুরুষের দৃষ্টি থেকে বাঁচাবে, ঠিক একইভাবে একজন পুরুষও এমন পোশাক পরবে না, যা তার শরীরের গড়ন-গাড়নকে প্রকাশ করে দেয়। ঢিলেঢালা পোশাকই সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী। আজকাল আমরা দেখি, অনেক মুসলিম পুরুষেরা এমন ছিপছিপে শার্ট-প্যান্ট পরেন, যা তাদের শরীরের গড়নকে মেলে ধরে। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে ফ্যাশান কিংবা যুগের চাহিদা যা-ই বলা হোক না কেন, এই ধরনের পোশাক নিজেকে এবং বিপরীত লিঙ্গের অন্য কাউকে যেকোনো মুহূর্তে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিতে পারে। পর্দার আবশ্যিকতা-ই হলো এই কারণে যে—পর্দা আপনার দেহকে প্রদর্শনেচ্ছা থেকে বাঁচাবে; কিন্তু আমরা যারা ছিপছিপে শার্ট-প্যান্ট পরি, যা শরীরের সাথে একেবারে লেপ্টে থাকে, তা আদতে কতখানি আমাদের প্রদর্শনেচ্ছা থেকে বাঁচায়, ভেবেছি কি?

ছিপছিপে শার্ট-প্যান্ট পরা যাবে কি না বা শারিয়ায় তা জায়েয কি না, সেসব আমার আলোচনার বিষয় নয়। আসলে আমি এখানে যা বোঝাতে চাই, তা মোটাদাগে এই—সুন্নাহসম্মত পোশাকের অর্থই হলো তা আমাদের শরীরকে এমনভাবে ঢেকে রাখবে, যাতে কোনোভাবে আমাদের শরীরের গঠন, গড়ন প্রকাশ না পায়। আমাদের পোশাকের চেহারা যদি হিন্দি কিংবা তামিল সিনেমার নায়কের মতো হয়, তাহলে সেই পোশাক নিয়ে আমাদের দ্বিতীয়বার ভাবার অবকাশ আছে বৈকি!

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এ ধরনের পোশাক পরলে কি কেউ গুনাহগার হবে? প্রশ্নটার উত্তর অন্যভাবে দেওয়া যাক। গুনাহগার হবে কি না, সেই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে উত্তম

কিংবা অধিকতর উত্তমের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে হয়তো-বা এই ধরনের ছিপছিপে, গায়ে লেপ্টে থাকা পোশাক পরিধান না করাই উচিত।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যুহদের স্তর হচ্ছে তিনটা। মানে, আল্লাহকে ভয় করে, কিংবা আল্লাহকে ভালোবেসে একজন মানুষ তিনভাবে জীবনযাপন করে থাকে।

প্রথম স্তরের মানুষেরা কেবল যাবতীয় হারাম থেকে বেঁচে থাকে।

দ্বিতীয় স্তরের মানুষ হারাম থেকে তো বাঁচেই, হালালের মধ্যে যা অতিরিক্ত, তা থেকেও বিরত রাখে নিজেদের।

তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ হালালের মধ্যেও এমন সব জিনিস এড়িয়ে চলে, যা সাধারণত আল্লাহর ভাবনা থেকে গাফেল করে দেয়।

এখন যদি ধরেও নিই, ছিপছিপে পোশাক পরিধানে কোনো অসুবিধে নেই, এটা জায়েয; তবু এটা তো নিশ্চিত যে—এই পোশাকের চেয়ে ঢিলেঢালা পোশাক-ই সুন্নাহর অধিক কাছাকাছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠতে চায় কিংবা আল্লাহকে বেশিই ভালোবাসতে চায়, তার কি উচিত নয়, এমন হালালের দিকে ঝুঁকে পড়া, যা অন্য একটা হালালের চাইতে অধিক উত্তম?

সাধারণত, বর্তমান জামানায় কিছু নারী যে স্টাইলিশ হিজাব পরে থাকেন, তা অবশ্যই সর্বসম্মতিক্রমে অপছন্দনীয়; কিন্তু আমরা যারা স্টাইলিশ হিজাব অপছন্দ করি, তারা যখন স্টাইলিশ শার্ট-প্যান্ট পরে, স্টাইলিশ হিজাবের বিরুদ্ধে বলতে যাবো, তখন কি আমাদের উচিত নয় আগে অন্তত একবার নিজের দিকে তাকানো?

আলোচনার সারবস্তু হলো—পুরুষেরও পর্দা আছে। পুরুষেরাও দৃষ্টির হিফাযত করবে এবং শালীন পোশাক পরিধান করবে, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, পর্দার আয়াতে যেখানে আগে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলা হয়েছে, সেখানে আমরা পর্দার যাবতীয় হুকুম যেন নারীকুলের ওপরে চাপিয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যাই।

পাঁচ.

এক বন্ধুর বাসায় ছিলো আমার অবাধ যাতায়াত। রোজকার আড্ডা, বিভিন্ন বিষয়ে শলা-পরামর্শসহ নানান কারণে তার বাসায় যাওয়াটা একপ্রকার আমার

রুটিনে পরিণত হলো। বন্ধুটার বিয়ের পরে প্রথম যেদিন তার বাসায় আসি, দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রথমেই খানিকটা থতমত খেলাম। তার বাসার দরোজায় সাদা কাগজের ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে কুরআনের একখানা আয়াত লেখা। আয়াতটা ছিলো—

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যকারো ঘরে প্রবেশ কোরো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং ঘরের লোকদের সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।[১]

এমন নয় যে এই আয়াত আগে কখনোই পড়িনি কিংবা আমার চোখে পড়েনি, কিন্তু সেদিন তার ঘরের দরোজায় এমনভাবে আয়াতখানা সাঁটানো দেখে মনে হলো—আমি বুঝি এই আয়াত সেদিন-ই প্রথম দেখলাম। বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি ইসলাম যে আমাকে দেয়নি, সেটা সেদিন যেন আমি নতুনভাবে অনুভব করতে পারলাম। এখন যে আমার বন্ধুর ঘরে একজন নারী আছে এবং ওই নারী যে আমার জন্য মাহরাম নয়, তার সামনে যাওয়ার অনুমতি আমার নেই—এই আয়াতখানাই সেই নির্দেশটা আমাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

আমাদের গ্রাম-বাংলার আরো একটি চিরাচরিত দৃশ্য হচ্ছে এই—আমাদের চাচা, জেঠা, ফুফা, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাইয়েরা আমাদের ঘরে এসে, আমাদের মা-বোন-স্ত্রীদের সাথে দিব্যি খোশালাপে মেতে ওঠে। বড় আফসোস এবং পরিতাপের বিষয় হলো, পর্দার সামান্য বালাইটুকু এখানে রক্ষা হয় না। একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ঘরে আসতে হলে সবার আগে তাকে বাইরে থেকে, দৃষ্টি অবনত রেখে অনুমতি চেয়ে নিতে হবে। অনুমতি দেওয়া হলে তবেই সে ঘরে ঢুকতে পারবে, নতুবা নয়। এই কথা আমার নয়, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বিষয়ে কুরআনে দুইটা আয়াত নাযিল করেছেন।

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যকারো ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং ঘরের লোকদের সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

[১] সুরা নুর, আয়াত : ২৭

অতঃপর, যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে প্রবেশ কোরো না। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও', তাহলে তোমরা অবশ্যই ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। বস্তুত, তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।[১]

এই যে আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমারেখা, নিয়ম ও নীতিমালা—এসব মেনে চলার কোনো বালাই কি আমাদের গ্রাম-বাংলা এবং আধুনিক মুসলিম পরিবারগুলোতে আছে? আমাদের বন্ধুরা, অফিসের কলিগ, ছেলে-মেয়ের স্কুলশিক্ষকেরা কত সহজে আমাদের ঘরগুলোতে ঢুকে পড়তে পারেন। না কোনো অনুমতির দরকার পড়ে, না দরকার পড়ে কোনো পর্দার। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে—আমাদের মায়েরা, স্ত্রী ও বোনেরা দরোজার কাছে এসে হাসিমুখে এসমস্ত নন-মাহরাম, পর-পুরুষদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে যান। অথচ একজন মুসলিম নারীর উচিত নয় কোনোভাবে একজন পর-পুরুষ, যে তার মাহরাম নয়, সরাসরি রক্ত-সম্পর্কের কেউ নয়, তার সামনে যাওয়া। বাসায় স্বামী, সন্তান কিংবা বাবার অনুপস্থিতিতে যদি কোনো পর-পুরুষ আসে, দরোজার অভ্যন্তর থেকেই তার সাথে কথা বলে নেওয়া উচিত। যদি তার কোনো দরকার থাকে, তাহলে তাকে এমন সময়ে আসতে বলা যখন বাসায় কোনো মাহরামের উপস্থিতি থাকবে। তেমনি আমরা যখন কারো বাসায় যাবো, তখন আগে বাইরে থেকে সালাম দিয়ে অনুমতি চেয়ে নেবো। যদি বাসায় কোনো পুরুষ না থাকে, তাহলে আমাদের উচিত হবে না ওই বাসায় যাওয়া। ওই বাসায় কোনো মাহরাম পুরুষ উপস্থিত থাকলে তখন যাওয়াটাই অধিকতর উত্তম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের শিখিয়ে দিচ্ছিলেন, নবিজির স্ত্রীদের কাছ থেকে কোনো জিনিস চাইতে হলে কীভাবে চাইতে হবে—

তার স্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু চাইতে হলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাও। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।[২]

[১] সুরা নুর, আয়াত : ২৭-২৮

[২] সুরা আহযাব, আয়াত : ৫৩

কারো বাসায় যদি কোনো পুরুষ উপস্থিত না থাকে, আপনি ওই বাসায় যাবেন না। কিছু চাইতে হলে তা পর্দার অন্তরালে থেকে চাওয়ার কথা আল্লাহ আপনাকে জানাচ্ছেন। আপনি যদি একজন নারী হন, মাহরাম নয় এমন কোনো পুরুষ আপনার বাসায় এলে আপনি তার সাথে পর্দার অন্তরাল থেকেই কথা বলুন। এটাই আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমারেখা। এটা আমাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্যই। দুজন নারী-পুরুষ, যারা সম্পর্কে রক্তের কেউ নয়, কেউ কারো মাহরাম নয়, তারা যখন একান্তে খোশালাপ করে, শয়তান সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিশেবে উপস্থিত হয়ে যায়। অন্তরে যত ধরনের কুটিল চিন্তা, কুৎসিত ভাবনা দেওয়া যায়, সব সে আপনার মনে ঢেলে দেবে। কারণ সে চায় আপনি পথভ্রষ্ট হোন। সে তো আপনাকে পথভ্রষ্ট করবে বলেই আল্লাহর সামনে ওয়াদা করেছিলো। শয়তানকে সুযোগ না দেওয়ার জন্যই, নিজের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে, সর্বোপরি নিজেকে হিফাযতের উদ্দেশেই আপনার উচিত নয় নন-মাহরাম কারো বাসায় গিয়ে তার সাথে দেখা করা, গল্প-গুজব-আড্ডা দেওয়া।

বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা কিংবা প্রগতিবাদী ভাবনা এসবকে বড্ড অসামাজিক কাজ বলে আপনাকে বোঝাতে চাইবে। কীভাবে আপনি একজন মানুষকে দরোজা থেকে বিদেয় করে দিতে পারেন? কিংবা ফিরে আসতে পারেন কারো দোরগোড়া থেকে? আদতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।' আমাদের কল্যাণ কীসে, তা আমাদের রব-ই ভালো জানেন; কিন্তু আমাদের রবের আদেশকে পাশ কেটে অন্য কিছুতে, অন্য কোথাও যখন আমরা আমাদের কল্যাণ খুঁজতে যাবো, হতে পারে সেটাই আমাদের জন্য জাহান্নামের চৌরাস্তা।

ছয়.

আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা, পারিপার্শ্বিক রীতি-নীতিতে আমরা এতটাই বেশরম আর বেখবর হয়ে আছি যে, আমাদের কাজকর্মগুলো কখন যে ইসলামের সীমাতিক্রম করে চলে যাচ্ছে, সেই হুঁশ আমাদের নেই। প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত আমরা হারামের মাঝে ডুবে থাকছি, হারাম দেখছি, হারাম কাজ করছি, হারাম খাচ্ছি, কিন্তু কী আশ্চর্য, আমাদের এতে কোনো চৈতন্য নেই! নেই কোনো ভাবান্তর! আমরা যা করছি তা ইসলামের মাপকাঠিতে কতখানি ঠিক আর কতখানি ভুল, তা ভেবে দেখার, তা পরখ করে নেওয়ার কোনো তাড়না আমরা অনুভব করি না। আমাদের

কৃতকর্মের জন্য আখিরাতে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে, সেই ভয়ে আমরা শিউরে উঠি না। যুগের জাহিলিয়াত আমাদের এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে যে, সমস্ত অধার্মিকতা, সমস্ত অ-ইসলামি কার্যকলাপ, সমস্ত অবাধ্যতা এখন আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। আমরা এতে খুব সুন্দর আর পরিপাটিভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

পর্দা এবং দৃষ্টি হিফাযতের গুরুত্ব আর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের পর থেকে পারতপক্ষে আমাদের সমাজের তথাকথিত বিবাহ-আয়োজনগুলোতে না যাওয়ার চেষ্টা করি সাধারণত। কারণ আমাদের মধ্যে জাহিলিয়াত কতটা শক্তপোক্ত আসন গেঁড়ে বসেছে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই সমস্ত বিয়ে-বাড়ি।

কনে সেজেগুজে স্টেজে বসে আছে আর ফটোগ্রাফাররা নানান ভঙ্গিতে, নানান এঙ্গেলে কনের ছবি উঠাচ্ছে। কখনো দূর থেকে, কখনো কাছ থেকে। শুধু তো ভাড়া করে আনা ফটোগ্রাফাররাই নয়, আমাদের হাতে থাকা স্মার্টফোনগুলোও এখানে দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করে। স্টেজে বসে থাকা কনের শারীরবৃত্তীয় সকল কলা আমাদের ক্যামেরাগুলোতে ধরা পড়ে। এরপর সেসব ছবি আমাদের বদৌলতে বিভিন্ন মনোহর আর মনকাড়া ক্যাপশনে ছড়িয়ে পড়ে ভার্চুয়ালে। হাজার-লক্ষ চোখ আর দৃষ্টির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে, কনেকে নিয়ে কত হাজার রকমের চিন্তা যে অন্তরগুলোতে দানা বাঁধে সেই হিশেব কোথাও মিলবে না।

আপনি যদি বলতে চান কিংবা আপনাকে যদি বলা হয়—যে ফটোগ্রাফাররা ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করে, তারা কেনই-বা এমন কুৎসিত, বিদঘুটে চিন্তা করতে যাবে, তাহলে আপনি ভুল করছেন। আপনার মনে রাখা উচিত—এরা পুরুষ, ফেরেশতা নয়। মানুষের ভদ্রস্থ পোশাক কিংবা মার্জিত চেহারা দেখে বিভ্রান্ত হতে নেই একেবারে। আড়ালে, একান্ত গোপনে, নিবিড় নির্জনতায় তারা যে কল্পনার কোন কোন রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়, ইন্টারনেটের কোন অলি-গলিতে ঘোরাফেরা করে, তা আমি আর আপনি কি জানি? একটা সরল চেহারার ওপাশে কোন কুৎসিত চিন্তা আর লোলুপ দৃষ্টিটা লুকিয়ে আছে, সেই সংবাদ তো আমাদের কাছে পৌঁছায় না। তাই সাবধান হতে হবে আমাকে। আমি কারো বাবা কিংবা ভাই। আমার মেয়েকে স্টেজে বসিয়ে হাজারো পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে, আমার বোনকে হাজারো পুরুষের অসংলগ্ন ভাবনা থেকে রক্ষা করতে, ওয়েডিং ফটোগ্রাফির মতো এমন জাহিলিয়াতকে, এমন তথাকথিত সামাজিকতাকে সাহস করে রুখে দিতে

হবে। সামাজিকতার নামে, আধুনিকতার নামে গজিয়ে ওঠা এই উদ্ভট ফিতনাকে মোকাবেলা করতে হবে আমাদের নারীদেরকেই। তাদের ঠিক করতে হবে—ওয়েডিং ফটোগ্রাফির নাম করে হাজারো পুরুষের খায়েশ পূরণের সামগ্রী তারা হতে চায় কি না? সাহস করে তারা যদি 'না' বলতে পারে, যুগের এই জাহিলিয়াত তখন অনেকখানি রুখে দেওয়া সম্ভব হবে বলে বিশ্বাস করি।

সাত.

বাইরে বেরোলে একটা দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে। কোনো আঙ্কেল-আন্টি তাদের মেয়েকে নিয়ে হয়তো শপিংয়ে এসেছেন। আঙ্কেলের মুখে চাপ দাঁড়ির রেশ দেখা যায় এবং আন্টি থাকেন বোরকা পরিহিত অবস্থায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য—তাদের ষোড়শী কন্যা, যে কিনা বিয়ের উপযুক্ত, তার গায়ে বোরকা-হিজাবের নাম-গন্ধও থাকে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়—বোরকা-হিজাবটাকে তারা হয়তো-বা বয়সের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়াদি ভেবে বসে আছেন। তারা হয়তো ভাবেন, বয়স বাড়লেই কেবল গায়ে বোরকা-হিজাব উঠাতে হয়। উর্বর তারুণ্যে, ভরা যৌবনে খোলামেলা চলাফেরাটাই তাদের কাছে কেমন যেন যুক্তিযুক্ত!

আমি যদি জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কি দাইয়্যুস হতে চান?' আপনি হয়তো-বা প্রথমেই থতমত খাবেন। অবাক হয়ে পাল্টা জানতে চাইবেন, 'দাইয়্যুস কী?'

আপনি জানেন না দাইয়্যুস কাকে বলে! কিন্তু নিজের অজান্তে, অগোচরে আপনি হয়তো দাইয়্যুস হয়ে বসে আছেন। দাইয়্যুস হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার অধীনস্থ নারীগণ বেপর্দা চলাফেরা করে।[১] অর্থাৎ, আপনি যখন পরিবারের বড় এবং দায়িত্ববান সন্তান, তখন আপনার মা যদি বেপর্দা চলাফেরা করে, কিন্তু আপনি তাতে বাধা না দেন, তাকে সংশোধন না করেন; আপনার বোন যদি বেপর্দা ঘোরাফেরা করে, তাকে যদি আপনি পরিবারের কর্তা হওয়া সত্ত্বেও সংশোধন না করেন; আপনার স্ত্রী যদি তার মাহরাম নয় এমন পুরুষদের সাথে মেলামেশা করে, বেপর্দা তাদের সামনে যায়, কথাবার্তা বলে এবং তাকেও যদি আপনি সতর্ক না করেন, তাহলে আপনাকে বলা হবে দাইয়্যুস। একজন দাইয়্যুসের সবচেয়ে বড় শাস্তি হচ্ছে এই—

---

[১] *শুআবুল ঈমান*, বাইহাকি : ১০৩১০; *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১৪৩—হাদিসটির সনদ সহিহ লিগাইরিহি

সে জান্নাতের খুশবু পর্যন্ত পাবে না, অথচ জান্নাতের খুশবু চল্লিশ হাজার বছরের দূরত্বে থাকলেও পাওয়া যায়![১] চল্লিশ হাজার বছরের দূরত্বে থাকলেও যার সৌরভ নাকে এসে লাগবে, দাইয়্যুস ব্যক্তির নাকে সেই সৌরভের কণামাত্রও যখন পৌঁছাবে না, তখন ভাবুন তাকে জান্নাতের সীমানা থেকে কতখানি দূরে রাখা হবে!

দাইয়্যুস ব্যক্তির আরেকটা চরম শাস্তি হচ্ছে—কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দিকে তাকাবেন-ই না।[২] সেদিন এমন অনেক গুনাহগার থাকবে, যাদের দিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রহমতের দৃষ্টি দেবেন এবং তাদের ক্ষমাও করে দেবেন; কিন্তু দাইয়্যুস, যে তার অধীনস্থ নারীদের পর্দার ব্যাপারে বেখেয়াল ছিলো, যে তাদের বেপর্দা চলাফেরায় কোনো সমস্যা দেখতো না, তার দিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকাবেন পর্যন্ত না! তার রব তার দিকে তাকাবেন না—একজন মুসলিমের জন্য এর চাইতে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে!

আপনি নিজ হাতে গুনাহ কামাচ্ছেন না, কিন্তু আপনার আমলনামায় গুনাহ লেখা হচ্ছে কেবল আপনার অধীনস্থ নারীকুলের বেপর্দা চলাফেরার কারণে। আপনার মনে হচ্ছে আপনি দোষ করছেন না, কিন্তু আপনার দোষ হচ্ছে এই—আপনি পরিবারের প্রধান অভিভাবক হওয়ার পরেও এহেন চলাফেরার জন্য তাদের সাবধান করেননি; বরং তাদের এমন চলাফেরায় আপনি অনুমতি, মৌন সম্মতি ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—

> যারা চায় যে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বস্তুত আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না।[৩]

পর্দা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দেওয়া ফরয একটা বিধান। ফরযের আবশ্যিকতা এমন যে—এটা অক্সিজেন গ্রহণের মতোই। অক্সিজেন গ্রহণ না করলে যেভাবে আমাদের দেহের মৃত্যু ঘটে, তেমনি আল্লাহর নাযিলকৃত ফরয বিধান ত্যাগ

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৬৯১৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৭৪৫

[২] *সুনানুন নাসায়ি* : ২৫৬২—হাদিসটির সনদ হাসান

[৩] সুরা নুর, আয়াত : ১৯

করলে মৃত্যু হয় আমাদের অন্তরের। আর মৃত অন্তরে শয়তান গড়ে তোলে তার শয়তানির ইমারত।

যুগের জাহিলিয়াত এমন অবস্থায় পৌঁছেছে—এখানে পর্দা মানাটাই এখন নতুন জিনিস, পর্দা না করাটাই চিরাচরিত চলে আসা নিয়ম। পর্দা করলে, পর্দা মানলে আপনার চারপাশ থেকে মানুষ বড় বড় চোখ করে তাকাবে যেন আপনি বেশ অদ্ভুত ভিনগ্রহের কোনো প্রাণী, ভুল করে এই তল্লাটে নেমে পড়েছেন! তাদের সমালোচনাকে, অদ্ভুত চাহনিকে পাত্তা দেওয়ার কোনো দরকার নেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরাবাদের জন্য সুসংবাদ দিয়ে রেখেছেন।[১] গুরাবা হচ্ছে তারাই, যারা ফিতনার সময়ে সঠিক ইসলামের ওপর দাঁত কামড়ে পড়ে থাকবে। গুরাবার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অপরিচিত। আপনি যখন ইসলামের বিধি-বিধান নিজের জীবনে প্রয়োগ করা শুরু করবেন, আপনার চারপাশের লোকজনের কাছে তা বড্ড অপরিচিত, বড্ড বেখাপ্পা আর বেঢপ লাগবে। বিভ্রান্ত হবেন না। গুরাবা হিশেবে আপনার জন্য সুসংবাদ! তাদের চোখে হোক না নতুন, আমরা তবে গাহি নতুনের গান।

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৪৫; *জামি তিরমিযি* : ২৬২৯; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৯৮৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৭৮৪; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৪৩৬৬

পতনের আওয়াজ পাওয়া যায়

এক.

ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ রাহিমাহুল্লাহ খুব চমৎকার একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের সাথে তার শেষ হজ্জে আমি সফরসঙ্গী ছিলাম। আমরা যখন মদিনার শেষ উপকণ্ঠে এসে পৌঁছাই, তখন আমাদের সামনে এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হলেন। বয়সের ভারে তার চোখের ভ্রু-যুগল পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। বয়স্ক লোকটার সাথে তরুণ ও আধ-বয়স্ক মিলিয়ে আরো অনেকগুলো মানুষ ছিলো এবং তাদের একজন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আপনাদের মধ্যে আহমাদ ইবনু হাম্বল কে?'

তখন আমাদের দলে থাকা অন্য লোকেরা হাত উঁচিয়ে আহমাদ ইবনু হাম্বলকে দেখিয়ে দিলো। এরপর, জরাগ্রস্ত ওই বৃদ্ধ লোক, অন্য একজনের সহায়তায় কোনোমতে আহমাদ ইবনু হাম্বলের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'তোমার নাম আহমাদ ইবনু হাম্বল?'

আহমাদ ইবনু হাম্বল বললেন, 'আমার আম্মা এমনটাই আমার নামকরণ করেছেন।'

'বাছা, তুমি কি আমায় চিনতে পেরেছো?'

'আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।'

বৃদ্ধ লোকটা বললেন, 'আমি ওবাইদুল্লাহ ইবনু মুসা ইবনি জাফর ইবনি মুহাম্মাদ

ইবনি আলি ইবনিল হুসাইন ইবনি আলি ইবনি আবি তালিবের বংশের মানুষ। আমি গতকাল স্বপ্নে দেখেছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বাগদাদ অতিক্রম করছেন। এমন সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডান কাঁধ থেকে তার চাদরখানা মাটিতে পড়ে যায়। তারপর আমি দেখলাম, হঠাৎ কোত্থেকে যেন এসে তুমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদরখানা মাটি থেকে কুড়িয়ে পুনরায় তার ডান কাঁধে চড়িয়ে দিলে। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার দিকে তাকালেন। সাথে আবু বকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমাও। তারা হাসিমুখে তোমাকে বললেন, 'আহমাদ! সুসংবাদ গ্রহণ করো! জান্নাতে তুমি আমাদের সাথি হচ্ছো।'

এরপর, ওই বৃদ্ধলোক সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা কি জানো, 'আহমাদ ইবনু হাম্বল নবিজির চাদর কুড়িয়ে নিয়ে নবিজির কাঁধে তুলে দিয়েছেন'— বলতে স্বপ্নে কী বোঝানো হয়েছে? উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন শাইখ বললেন, এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে—নবিজির সুন্নাহকে, যা থেকে এখন মানুষ বিমুখ হয়ে আছে, দূরে সরে আছে, আহমাদ ইবনু হাম্বল তা পুনরায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে।'

ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ বলেন, বৃদ্ধের এই কথা শুনে বিমর্ষ হয়ে যান আহমাদ ইবনু হাম্বল। তিনি বলেন, 'আহা! এই কথা শোনার আগে যদি আমার এবং এই লোকের মাঝে একটা পাহাড় এসে দাঁড়াতো, কতই না উত্তম হতো।'[১]

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, জান্নাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথি হতে পারার যে সৌভাগ্য ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহকে বৃদ্ধ লোকটা শোনালেন, তা কি ইমাম আহমাদ পছন্দ করেননি? এজন্যই কি তিনি বলেছেন, 'এই কথা শোনার আগে আমার এবং এই লোকের মাঝে যদি একটা পাহাড় এসে দাঁড়াতো, কতই না উত্তম হতো'?

না, আসলে ব্যাপারটা তা নয়। জান্নাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথি হওয়ার স্বপ্ন তো প্রত্যেক মুমিনের। ইমাম আহমাদ সেটা অপছন্দ করবেন,

---

[১] *মিহনাতুল ইমাম আহমাদ*, আব্দুল গনি আল-মাকদিসি, পৃষ্ঠা : ৩৩-৩৪; *আল-জামি লি উলুমিল ইমাম আহমাদ*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৪২৪

তা কী করে হতে পারে? বরং তিনি ভয় পেয়েছেন একটা জিনিসকে—আত্মম্ভরিতা। আত্মমুগ্ধতার ভয়। তিনি শঙ্কিত হয়েছেন—যদি এই বৃদ্ধ লোকের কথা শুনে তার মনে অহমিকা প্রবেশ করে? নবিজির হাদিসকে পুনরুজ্জীবিত করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে পুরস্কারের কথা এই বৃদ্ধলোক তাকে জানিয়ে গেলেন, তা থেকে যদি তার অন্তরে আত্মম্ভরিতার জন্ম নেয়? যদি কোনোভাবে তাতে রিয়া তথা লোকদেখানো অনুভূতি প্রবেশ করে, তাহলে তো সর্বনাশ! এ-কূল ও-কূল সবকূলই যে তখন হারাবেন তিনি!

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ ঠিক এই কারণেই সেদিন ভীত হয়ে ছিলেন। নিজের ভেতরে যাতে কোনো অহংকার, আত্মমুগ্ধতা না আসে, সেজন্যই তিনি দুজনের মাঝে একটা পাহাড়ের বাধা আশা করে ছিলেন।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহর এই ঘটনা থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। নিজের ব্যাপারে আমরা যখন অনেক বেশি আত্মতুষ্টিতে ভুগবো, তখন আখিরাতে ভালো ফলাফল লাভের আশা আমাদের জন্য ক্ষীণ হয়ে আসবে। 'আমি তো অনেক বেশি ইবাদত করি, আমল করি, সাদাকা করি, দ্বীন প্রচার করি'—এই অতি-ভাবনাগুলো আমাদের যাবতীয় আমলকে বিনস্ট এবং আমাদের আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার জন্য খুবই যথেস্ট।

দুই.

আবদুল্লাহ নামের একজন বর্ণনা করেছেন, 'তারাসুসে[১] আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং মুতামির ইবনু সুলাইমানের সাথে অবস্থান করছিলাম। এমন সময়, হঠাৎ চারদিকে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো এবং চারদিক থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান এলো। রোমান ও মুসলিমরা মুহূর্তের মধ্যেই মুখোমুখি সমরে লিপ্ত হলো।

রোমানদের একজন দলনেতা বললো, 'আমরা মুখোমুখি, জনে জনে যুদ্ধ করবো। একজনের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র একজন।'

---

[১] বর্তমানে এটি তুরস্কের একটি শহর।

সে মুসলিমদের আহ্বান করলো যেন একজন একজন করে তার সাথে ময়দানে নেমে যুদ্ধ করে। তার কথানুযায়ী মুসলিম শিবির থেকে এক যোদ্ধা তার বিরুদ্ধে ময়দানে নামল এবং ওই যোদ্ধা রোমান দলনেতার হাতে শহিদ হলো। এরপর আরেকজন গেলো এবং সেও শহিদ হলো। এভাবে ওই দলনেতার হাতে মুসলিম শিবিরের মোট ছয়জন যোদ্ধা শহিদ হলেন।

মুসলিম শিবিরে ততক্ষণে একটা চাপা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এবং ওই রোমান দলনেতা খুব গর্বভরে, অহংকারের সাথে বিজয়োল্লাস করে চেঁচিয়ে বললো, 'আর কার বুকে সাহস আছে আসো দেখি?'

এরপর, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আমার দিকে তাকালেন আর বললেন, 'আমি যাচ্ছি তার সাথে লড়তে। আমি যদি মারা যাই, তাহলে তুমি অমুক অমুক কাজ করতে ভুলে যেয়ো না কিন্তু।'

আমাকে এতটুকু বলে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধের ময়দানে রোমান সেনাপতির সাথে সম্মুখ সমরে নেমে পড়লেন তিনি। তখন একটা কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে নিয়েছিলেন, যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। দীর্ঘক্ষণ টানা যুদ্ধের পর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের হাতে ওই দাম্ভিক রোমান সেনাপতির মৃত্যু হয়। তারপরে আরো ছয়জন রোমানযোদ্ধাকে হত্যা করেন তিনি। সম্মুখ সমরে বিজয়াসনে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'আর কে কে লড়তে চাও, এসো?'

কিন্তু আর কোনো রোমান সেনা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সামনে আসতে সাহস করলো না। তারা এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো যে, ওখানেই রণভঙ্গ দিয়ে পালালো।

আবদুল্লাহ নামের ওই লোক আরো বলেন, 'যুদ্ধশেষে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক পুনরায় আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং আমার কানের কাছে মুখ এনে চুপিসারে বললেন, 'আবদুল্লাহ, এতক্ষণ ধরে তুমি যা দেখলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি বেঁচে থাকা অবধি এই ঘটনা তুমি কাউকেই বোলো না।'[১]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৪০৮-৪০৯

সেদিনও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ আত্মম্ভরিতার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জানতেন—আত্মমুগ্ধতার বিষবাষ্প যদি তাকে একবার পেয়ে বসে, তবে তার পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। বিশাল প্রতাপশালী রোমান বীর এবং যুদ্ধবাজ রোমান সৈন্যদের হত্যার সংবাদ যদি দিকে দিকে, মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, সেটা নিয়ে যে তার অন্তরে অহংকার দানা বাঁধবে না, অহমিকা যে জেঁকে বসবে না তার মনে—তার কী নিশ্চয়তা? তিনি ভয় পাচ্ছিলেন—যদি শয়তান তার কৃতিত্বকে তার সামনে বড় করে তুলে ধরে? যদি অবচেতন মনের কোথাও এই আত্মপ্রশংসা ধ্বনিত হয়—'এই মহাবীরকে পরাস্ত করার সকল কৃতিত্ব আমার' 'আমার শক্তিবলেই এই অসাধ্য সাধিত হয়েছে'—তবে ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের পতন ঠেকাবে কে?

আমাদের পূর্বসূরিরা নিজেদের জীবনটাকে এভাবেই সাজিয়েছেন। তারা ছিলেন বীর, কিন্তু বীরত্বের সবটুকু কৃতিত্ব তারা সোপর্দ করতেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে। তারা ছিলেন জ্ঞানের ভান্ডার, তথাপি সেই জ্ঞানের ভারত্ব তাদেরকে বেপরোয়া করে তুলতো না। যুগান্তকারী সকল কর্ম সম্পাদন করতেন, কিন্তু প্রশংসার ভাগিদার তারা হতে চাইতেন না। সমস্ত প্রশংসাকে তারা কেবল মহান মালিকের জন্য তুলে রাখতেন। কৃতিত্বের ভাগ-বাঁটোয়ারা থেকে পালাতেন তারা। বেশ ভালোমতোই তারা জানতেন—যেখানেই কৃতিত্বের আকাঙ্ক্ষা, সেখানেই দাম্ভিকতার সূত্রপাত। যেখানেই প্রশংসা কুড়ানোর লোভ, সেখানেই লোকদেখানো কাজের জন্ম।

তিন.

কুরআনের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখবো এই আত্মম্ভরিতা, আত্মমুগ্ধতার কারণেই কিন্তু ইবলিস অভিশপ্ত হয়েছিলো। আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবাইকে আদেশ করলেন আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করার জন্য। সকল ফেরেশতা বিনা বাক্যব্যয়ে আল্লাহর আদেশ পালন করলো। তারা সিজদা করলো আদম আলাইহিস সালামকে; কিন্তু ইবলিস, যে কিনা একজন উঁচু পর্যায়ের জিন ছিলো, সে রীতিমতো বেঁকে বসলো। আত্মমুগ্ধতায় বিভোর হয়ে সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে বসলো। নিজে আগুনের তৈরি হওয়ায় মাটির তৈরি আদম আলাইহিস সালামকে সে তুচ্ছজ্ঞান করলো। সে বললো, 'আদম মাটির তৈরি, আমি আগুনের। আগুন মাটির চাইতে সেরা। আদমের চেয়ে তাই আমিই শ্রেষ্ঠ। আগুনের তৈরি হয়ে মাটির

তৈরি কাউকে আমি সিজদা করতে পারবো না।'

পরের গল্পটা তো আমাদের সবার জানা। ইবলিস অভিশপ্ত হলো চিরতরে। সে হয়ে গেলো মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু। আত্মম্ভরিতা ও আত্মমুগ্ধতা একজনের জন্য কীভাবে যে ধ্বংস ডেকে আনতে পারে, তা ইবলিসের ঘটনা থেকেই জানতে পাই আমরা।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একটা বড় গুণ হলো—তারা কখনোই আত্মম্ভরিতায় ভোগেন না। আত্মপ্রশংসায় গদগদ হোন না। আত্মবিমুগ্ধতায় ডুবে থাকেন না। কোনোকিছু অর্জন করলে কিংবা কোনো কিছু যদি আমরা ভালো করতে পারি, অথবা ভালো করার যোগ্যতা রাখি, তখনই আমাদের মাঝে অহংকার প্রবেশ করে। আমরা ভাবি—এ বুঝি কেবল আমারই শ্রম আর মেধার ফসল। এ বুঝি কেবল আমারই যোগ্যতা, কিন্তু আল্লাহর কাছে যারা প্রিয় হয়েছেন, যারা নিজেদের নাম লিখে নিতে পেরেছেন আসমানের সোনালি পর্দায়, তারা ভাবতেন ঠিক এর উল্টো।

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম মারইয়াম আলাইহাস সালামের ঘরে এসে নানাবিধ ফলমূল দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন। এমনসব ফলমূল যা ওই অবস্থায়, ওই সময়ে বসে পাওয়া মারইয়াম আলাইহাস সালামের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। চমকিত হয়ে যান যাকারিয়া আলাইহিস সালাম! কৌতূহল নিবৃত করতে না পেরে তিনি মারইয়াম আলাইহাস সালামের কাছে সরাসরিই জানতে চান এতসব ফলমূল তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন। যাকারিয়া আলাইহিস সালামের কৌতূহলের জবাবে মারইয়াম আলাইহাস সালাম সেদিন যা বলেছিলেন, তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। মারইয়াম আলাইহাস সালাম বলেছেন, 'এগুলো আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান তাকে অবারিত রিযিক দান করেন।'[১]

মারইয়াম আলাইহাস সালাম বলতে পারতেন, 'আমি বেশি বেশি ইবাদত করি, তাই তার বিনিময়ে এসব লাভ করেছি।' অথবা তিনি এ-ও বলতে পারতেন যে, 'এগুলো আমি আমার যোগ্যতা-বলে লাভ করেছি।' আপনি কিংবা আমি হলে হয়তো-বা এভাবেই বলতাম, কিন্তু মারইয়াম আলাইহাস সালাম এভাবে বলেননি।

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৩৭

তিনি এই অর্জনকে, এই প্রাপ্তিকে সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যাকারিয়া আলাইহিস সালামের কাছে নিজের বড়োত্ব আর গুরুত্ব জাহির না করে তিনি প্রশংসার ঝুড়িটা তাঁর দিকেই সোপর্দ করে দিয়েছেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে সকল প্রশংসার হকদার।

আমাদের সকল অর্জন, সকল প্রাপ্তি মূলত আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। তাঁর দয়া ব্যতীত কোনোকিছু অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটা আমি আর আপনি না বুঝতে পারলেও, আল্লাহর সত্যিকার প্রিয় বান্দারা বুঝতে পারতেন। তাই, জীবনের সকল অর্জনকে, সকল প্রাপ্তিকে তারা আল্লাহর দিকে ঠেলে দিতেন। আত্মম্ভরিতা, আত্মমুগ্ধতার বশবর্তী হয়ে তারা কখনোই সেগুলোকে নিজেদের যোগ্যতা আর মেধার ফসল ভেবে বসতেন না।

আত্মমুগ্ধতায় বিভোর হয়ে পা ফসকেছে স্বয়ং ইবলিসেরও। নিজের গাঠনিক উপাদানের দিকে তাকিয়ে সে ভেবেছিলো মাটির তৈরি আদমের চেয়ে সে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তো ইবলিস নির্ধারণ করবে না, এটা নির্ধারণ করবেন কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আদম শ্রেষ্ঠ হবে, না ইবলিস—তা নির্ধারণের ক্ষমতা কেবল এককভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার।

এই আত্মমুগ্ধতা থেকে বাঁচতেই সেদিন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ। হাদিসশাস্ত্রের যে যুগান্তকারী কাজ তিনি করেছেন, সেকারণে যদি তার মনে কোনো অহংকার জেঁকে বসে, সেই ভয়েই তিনি বলেছিলেন, 'আহা! এই কথা শোনার আগে যদি আমার এবং এই লোকের মাঝে একটা পাহাড় এসে দাঁড়াতো, কতই না উত্তম হতো।'

আত্মগৌরব দ্বারা নিজের অন্তরকে কাবু হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করতেই সেদিন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ রোমান যুদ্ধবাজকে দারুণভাবে পরাস্ত করার পরেও সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'আবদুল্লাহ, এতক্ষণ ধরে তুমি যা দেখলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি বেঁচে থাকা অবধি এই ঘটনা তুমি কাউকেই বোলো না।'

এই আত্মমুগ্ধতায় বিলীন হননি মারইয়াম আলাইহাস সালাম। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে যে খাবার তার জন্য বরাদ্দ ছিলো, তা পেয়ে তিনি বলেছেন, 'এগুলো আমার রবের কাছ থেকেই আসে। আর, আমার রব যাকে ইচ্ছা অবারিত রিযিক দান করেন।'

আমরা যখন কোনোকিছু অর্জন করবো অথবা অর্জনের যোগ্যতা অর্জন করবো, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, এই অর্জন, অর্জনের এই যোগ্যতা আমাদের প্রতি মহান রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি দয়া করেছেন বলেই এগুলো আমার জীবনে এসেছে। কখনোই এটা ভাববো না যে—এটা আমি এককভাবে নিজ যোগ্যতায় পেয়েছি। এমন ধারণা করাটা আত্মম্ভরিতারই নামান্তর; বরং আমাদের মারইয়াম আলাইহাস সালামের মতোই ভাবতে হবে। আমাদের যা কিছু অর্জন, যা কিছু প্রাপ্তি সব মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

কোনো অর্জন বা অর্জনের কোনো যোগ্যতা যখন আমরা লাভ করবো, তখন আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাবো সবার আগে। এই শিক্ষাটা আমরা কুরআন থেকেই পাই। সুরা নাসরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিজয়ের পূর্বাভাস দেওয়ার সাথে সাথে কয়েকটা করণীয়ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেছেন—

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, আর (হে নবি) আপনি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে ফিরতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুল করেন।[১]

বিজয় অর্জিত হলে এবং লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, যেন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং দ্বীন কায়েমের এই কাজে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, তার জন্য যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। আল্লাহর নবি, যিনি একজন পূত-পবিত্র মানবাত্মা, যাকে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জমিনে বুনেছেন তাওহিদের বীজ, যার মাধ্যমে সুশোভিত করে তুলেছেন তাঁর দ্বীনের সৌন্দর্য, তার জন্যই যদি আল্লাহর আদেশ ও হুকুম এমন হয়ে থাকে, আমাদের বেলায় তাহলে সেটা কেমন হতে পারে?

---

[১] সুরা নাসর, আয়াত : ১-৩

বিজয় অর্জিত হয়ে গেলে আল্লাহ বলেননি উল্লাসে ফেটে পড়তে। তিনি বলেননি তা নিয়ে গর্ব করে বেড়াতে কিংবা বেপরোয়া হয়ে উঠতে; বরং তিনি বলেছেন, বিজয়ের দেখা পেলে আমরা যেন তাঁর দিকেই ফিরে আসি, সমস্ত প্রশংসার মালিক যে একমাত্র তিনিই—তা অকপটে স্বীকার করি এবং বিজয় অর্জনে আমাদের পক্ষ থেকে যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তির জন্য আমরা যেন তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই।

চার.

দ্বীনের পথে হাঁটতে শুরু করার পর আমরা সাধারণ যে ভুলটা সবচেয়ে বেশি করি, তা হলো—আত্মম্ভরিতা। জেনে কিংবা না-জেনে, বুঝে অথবা না-বুঝে জীবনে চলার পথে আমরা কোনো না কোনোভাবে এই ফাঁদে আটকে যাই। জীবন থেকে জাহিলিয়াতের ধুলো ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার পরে আমরা যখন আমলের একটা বৃত্তে প্রবেশ করি, যখন আমরা সালাতে নিয়মিত হই, সিয়ামে তৎপর হই, দান-সাদাকা এবং ভালো কাজে অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে উঠি, এমনকি তাহাজ্জুদেও আমরা যখন নিয়মিত জাগতে শুরু করি, তখন আমাদের মনের কোনো এক সূক্ষ্ম কোণে এই ধারণা উঁকি দিতে শুরু করে যে—'আমার চেয়ে বেশি আমল, বেশি সাদাকা, বেশি সিয়াম, বেশি তাহাজ্জুদ-গুজার বান্দা আশপাশে সম্ভবত আর কেউ নেই।'

হতে পারে দ্বীন নিয়ে আমার মতন তৎপর, উদগ্রীব আর সচেষ্ট মানুষ আমার আশেপাশে আর একটাও নেই, কিন্তু তবু কোনোভাবে এই ধারণা মনে আনাই যাবে না যে—আমি এত বেশি আমল-ইবাদত করছি, এত বেশি আল্লাহর স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি, এমন কেউ নেই, যে আমাকে টেক্কা দেবে। এমন ভাবনা নিঃসন্দেহে শয়তানের ওয়াসওয়াসা। আমাদের আমল-ইবাদত, আমাদের তাকওয়ার উচ্চতা যতই আকাশ স্পর্শ করুক না কেন, নিজেকে বড় আর অন্যকে ছোট হিশেবে দেখতে গেলেই আমাদের নিশ্চিতভাবে পা ফসকে যাবে। এমন চিন্তা অবশ্যই অহংকার থেকে উৎসারিত। আমরা কেউ কি এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমাদের যাবতীয় ইবাদত আল্লাহ কবুল করে নিচ্ছেন? এটাও কীভাবে ভাবতে পারি যে—অন্যদের সামান্য আমলগুলো আল্লাহর কাছে খারিজ হয়ে যাচ্ছে?

আবু ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কাছে অহংকার সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'যখন তুমি লোকদের ব্যাপারে বিদ্রুপ করো, তা-ই হলো অহংকার।' আমি বললাম, 'আত্মম্ভরিতা কি?' তিনি

বললেন, "যখন তুমি ভাবো যে, তুমি এমন কিছু করো, যা আর কেউ করে না।'[১]

আত্মম্ভরিতা বিপদ ডেকে আনে। ভালো আমলগুলোকে রিয়ায় পরিণত করে। যখনই মানুষ নিজের আমল-ইবাদতের ব্যাপারে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, তখনই তার পা ফসকে যায়। সাফা পর্বতে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু দুআ করতেন আর বলতেন, 'ইয়া আল্লাহ, আপনি বলেছেন, 'আমাকে ডাকো—আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো', আর আপনি তো কখনোই আপনার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তাই আজ আমি করজোড়ে আপনাকে ডাকছি, আমার কাছ থেকে আমার দ্বীনকে ছিনিয়ে নেবেন না এবং মুসলিম হয়েই যেন আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি।'[২]

নবিজির একজন সাহাবি যদি এভাবে দুআ করতে পারেন, যদি তিনি দ্বীন থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা করতে পারেন, মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করার ভয়ে তিনি যদি ভীত হতে পারেন, আমরা কেমন ঈমানদার আর তাকওয়াবান যে, নিজেদের আমল-ইবাদত নিয়ে হরহামেশা আত্মম্ভরিতায় ভুগবো? নিজেদের আমলকে, নিজেদের ইবাদত, যাবতীয় রাত্রি-জাগরণ, যাবতীয় ভালো কাজকে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহাবিরা 'যথার্থ' ও 'যথেষ্ট' ভাবতে পারেননি। নবিজিকে সামনে থেকে দেখেও তারা নিজেদের নিয়ে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। আর একটু আমল করতে শুরু করলেই নিজেকে ছাড়া আশপাশের সবাইকে আমরা কিনা গাফিল, উদাসীন আর বিস্মৃত ভাবতে শুরু করি!

হিদায়াত আল্লাহর দেওয়া বড় একটা নিয়ামত। আত্মম্ভরিতা সেই নিয়ামতের রাস্তাকে করে তোলে রুক্ষ ও খড়খড়ে। আমল-ইবাদতের ব্যাপারে অধিক পরিমাণ আত্মবিশ্বাস, অধিক আত্মম্ভরিতা আমাদের এটা ভুলিয়ে দেয়—যেকোনো মুহূর্তেই আমরা পা ফসকে পড়ে যেতে পারি, যেকোনো মুহূর্তেই দ্বীন থেকে আমরা ছিটকে যেতে পারি। একজন হিদায়াতপ্রাপ্ত লোক যে আজীবন হিদায়াতের রাস্তায় অবিচল থাকবে, তার যে পথ হারাবার কোনো আশঙ্কা থাকবে না—এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। আবার হিদায়াত পায়নি এমন লোকও যে আজীবন হিদায়াতের বাইরে থেকে

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ১৫; পৃষ্ঠা : ৩৯৫

[২] *মুআত্তা মালিক* : ১২৮; *আল-ইস্তিযকার*, ইবনু আব্দিল বার, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ২২৪; *জামিউল উসুল*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ২১৮

যাবে, এমন ধারণারও কোনো অবকাশ নেই। তাই হিদায়াতপ্রাপ্ত লোক যেমন আত্মগৌরব, আত্মম্ভরিতায় ভুগবে না, তেমনি দৃশ্যত হিদায়াতের রাস্তায় নেই এমন লোককেও কটাক্ষ করা, ছোট করে দেখা সমীচীন নয়।

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন স্ত্রী। তার কাছে যখন জানতে চাওয়া হলো, 'কোন সে দুআ, যা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশি করতেন?'

তিনি বললেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশি পড়তেন এই দুআটা—يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ—'ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব, সাব্বিত কালবি 'আলা দ্বীনিক।' অর্থাৎ—'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন।'[১]

অন্তরকে দ্বীনের ওপর দৃঢ় রাখা মানে হলো—অন্তর যেন দ্বীন থেকে কখনোই সরে না যায়। যেন সর্বদা হিদায়াতের রাস্তায় আমরা থাকতে পারি। মানুষের অন্তরের অবস্থা যেকোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে। যেকোনো সময় অন্তর ঝুঁকতে পারে এমনসব দিকে, যা আমাদেরকে দ্বীনের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। এজন্যই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে দুআটা করতেন, তা এই অন্তরকে দ্বীনে স্থির রাখা বিষয়ক। আমাদের অন্তরের অবস্থা নবিজি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি এমন একটা দুআ আমাদের শিখিয়ে গেছেন। যেখানে অন্তরের স্থিরাবস্থার কোনো নিশ্চয়তা নেই, সেখানে আমল নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়ার, বেপরোয়া আর অহংকারী হয়ে ওঠার তো প্রশ্নই আসে না।

শাইখ সালিহ আল-উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'সর্বপ্রথম আমি নিজেকে উপদেশ দিই এবং অন্যদেরও বলি যে, দ্বীনের পথে অটল-অবিচল থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহর কাছে মিনতি করুন। কারণ আমাদের প্রত্যেকের পায়ের তলায় লুকিয়ে আছে ফাঁদ। আল্লাহ যদি আমাদের দ্বীনের ওপর অবিচল না রাখেন, নিশ্চিতভাবে আমরা সেই ফাঁদে আটকে যাবো এবং ধ্বংস হবো।'[২]

---

[১] *জামি তিরমিযি* : ২১৪০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৮৩৪—হাদিসটির সনদ সহিহ

[২] *শারহুল আকিদাতিল মুমিত*, ইবনু উসাইমিন, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৩৮৮

পাঁচ.

আমাদের আমলগুলো যেন আমাদের বেপরোয়া না করে তুলে। অহংকারে মোড়া আমলের কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই। অহংকার-বিহীন কম আমল অহংকারে ভরা অধিক আমলের চাইতে ঢের উত্তম। অহংকার আর বিনয় একসাথে থাকতে পারে না, যেভাবে মিশে থাকতে পারে না তেল আর জল।

অহংকার অন্তরে প্রবেশ করলে আমাদের ভেতর থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা বিলুপ্ত হয়ে যায় তা হলো বিনয়। ইবলিসের অন্তরে অহংকার ঢুকেছিলো। সে নিজের ব্যাপারে এতই বেশি আত্মবিমুগ্ধ ছিলো যে— আল্লাহর আদেশ পর্যন্ত সে অমান্য করলো। আত্মম্ভরিতা ইবলিসকে অভিশপ্তের পথে নিয়ে গেলো।

আবার, যখন অন্তরে বিনয় প্রবেশ করে, আমাদের ভেতর থেকে সবার আগে যে জিনিসটা ধূলিসাৎ হয়ে যায় তা হলো অহংকার। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আদম আলাইহিস সালাম। ইবলিসের ধোঁকায় পড়ে, আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহাস সালাম জান্নাতের নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। আদম আলাইহিস সালাম ভুল করেছেন ঠিক, কিন্তু সেই ভুলের ওপর স্থির থাকেননি। সেই ভুলের ওপর গো ধরে বসে থাকেননি। সেই ভুলটাকে তিনি সঠিক প্রতীয়মান করতে উদ্যোগী হোননি। বরং, ভুলটাকে ভুল হিশেবে জেনে এবং মেনে নিয়ে তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। নিজেদের কৃত ওয়াদা-চ্যুত হয়ে তারা যে ভুল করেছিলেন তা স্বীকার করে, আল্লাহর করুণা ভিক্ষা করে মাফ চাইলেন তারা, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের মাফও করে দেন। অন্তরে বিনয় ছিলো বলেই তারা আল্লাহর কাছে নত হতে পেরেছিলেন। আর, বিনয়ের অভাবেই ইবলিস আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করতে পারেনি।

অহংকার, আত্মমুগ্ধতা, আত্মম্ভরিতা একটা খাদের নাম। এই খাদে একবার পড়ে গেলে ফিরে আসাটা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। তাই, আমাদের উচিত কখনোই আত্মবিমুগ্ধ না হওয়া, আত্মম্ভরিতায় না ভাসা। নিজের যোগ্যতাকে এমনভাবে প্রকাশ না করা, এমনকিছু না ভাবা যেখানে অহংকারের ছাপ ফুটে ওঠে। নিজের যোগ্যতার জন্য আমরা যেন আল্লাহর কাছে আরো বেশি কৃতজ্ঞ, আরো বেশি অনুগত আর বিনয়ী হতে পারি। যদি কখনো মনে হয় আমরা কিছু অর্জন করেছি বা করতে যাচ্ছি,

তখনই আমরা যেন আল্লাহর দিকে ফিরে আসি। অধিক হারে আল্লাহর তাসবিহ তথা তাঁর প্রশংসা করি এবং নিজেদের যাবতীয় ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করি। মনে রাখতে হবে— অহংকারী ব্যক্তি কেবল অহংকার করে না, নিজের পতনের আয়োজনটাও করতে থাকে।

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর

এক.

বনশ্রীর যে বাসায় আমি থাকতাম, ও বাসার নিচে আমার স্ত্রী এক হাফিযা মহিলার কাছে প্রতিদিন সকালে হিফয করতে যেতেন। তাদের সাথে, এক থুরথুরে বৃদ্ধা মহিলা, বয়স কম করে হলেও সত্তর-পঁচাত্তরের কোঠায়, দেখতাম তিনিও রোজ কুঁজো হয়ে যাওয়া শরীর নিয়ে চলে আসতেন আরবি পড়তে। আরবি পড়া মানে একেবারে আলিফ, বা দিয়ে শুরু করা। এমন বয়সে একজন অতি-বৃদ্ধা মহিলা রোজ নিয়ম করে শিশুদের মতন কায়দা পড়ছে—তা দেখে শুরুর দিকে আমি খানিকটা বিস্মিত হয়েছিলাম বৈকি! কিন্তু পরে বৃদ্ধা মহিলার কুরআন দেখে দেখে পড়তে পারার যে অদম্য স্পৃহা, তা দেখে ভেতরটা সম্মান আর শ্রদ্ধায় কানায় কানায় ভরে উঠলো।

আমাদের একটা বাতিক আছে। বয়স কম থাকলে আমরা বলি, 'এই বয়সেই তোমাকে কেন ওসব শিখতে হবে বাপু? জীবন তো এখনো অ-নে-ক পড়ে আছে। বয়স বাড়ুক, আস্তে আস্তে না হয় শিখবে।'

আবার যাদের বয়স বেড়ে গেছে, তারা ভাবে, 'জীবনের আর ক'টা দিনই তো বাকি! এই জীবন-সায়াহ্নে বসে আমি আর কী এমন শিখতে পারবো? সময় যে ভারি অল্প।'

আমার ধারণা, ওপরের এই দুই ভাবনাই শয়তানের প্ররোচনা। শয়তান ভালো মানুষের মতন, দেখতে ভালো এবং যৌক্তিক ধারণা দুটো মানুষের মস্তিষ্কে এমনভাবে গেঁথে দেয়, যেন সে জ্ঞান অর্জনে নিজেকে ডুবিয়ে না রাখে। মানুষকে জ্ঞান আহরণের রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে শয়তান 'এখনো বয়স হয়নি কিংবা আর কি সময় আছে?'—ধরনের প্ররোচনাগুলোকে আমাদের সামনে রঙচঙ মাখিয়ে উপস্থাপন করে, যাতে আমরা বিভ্রান্ত হই এবং জ্ঞানের সাগরে ডুব না দিতে পারি।

আমি এমন অনেককে চিনি, যারা শয়তানের এই প্ররোচনায় প্ররোচিত না হয়ে জ্ঞান আহরণের চেষ্টায় নিবিড়ভাবে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। আমার বাবার বয়সী অনেক মানুষকে চিনি, যারা সারাদিনের কাজকর্ম সেরে, সন্ধ্যার অবসরে আরবি ভাষা শেখার জন্য হয়তো-বা অনলাইন কোর্স কিংবা অফলাইন ক্লাশে গিয়ে খাতা-কলম নিয়ে বসে পড়েন। আমি এমন অনেক জুনিয়র ভাই-বন্ধুকে চিনি, যারা জ্ঞান অর্জনের প্রতিযোগিতায়, শেখার প্রতিযোগিতায়, নিজেকে সমৃদ্ধ করার দৌঁড়ে আমার চাইতে আলোকবর্ষ এগিয়ে। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাস, সাহিত্যে তারা আমার চেয়ে ঢের অগ্রগামী। এই দুই ভিন্ন বয়সী, যারা শেষে এসেও হতোদ্যম হয়নি, আর যারা আগেভাগেই নিজেদেরকে নিয়ে এসেছে সঠিক স্রোতে, তাদের উভয়ের জন্যই আমার অফুরান ভালোবাসা।

দুই.

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু নিঃসন্দেহে এই উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। মানবজাতি এমন বিপর্যয়ের মুখোমুখি না আগে কখনো হয়েছে, না পরে আর হবে। আসমান থেকে প্লাবিত হয়েছে রহমতের যে ফল্গুধারা, যাকে বিশ্ব-মানবতার জন্য মুক্তি-দূত বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, তার মৃত্যু অতি অবশ্যই আমাদের জন্য এক বিশাল ধাক্কা! আসমানি এই রহমত কখনো ফুরিয়ে যেতে পারে, কখনো তা মৃত্যুর হাত ধরে অলক্ষ্যে চলে যেতে পারে, এই ভাবনাটুকুও অনেক সাহাবি ভাবতে পারতেন না। তাই তো আমরা দেখি, নবিজির প্রয়াণ-দিবসে, নবিজিকে মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে হতবিহ্বল চিত্তে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'কখনোই নয়। নবিজি তো মৃত্যুবরণ করতেই পারেন না। যে বলবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে, তাকেই আমি হত্যা করবো।'

প্রিয়মুখ, প্রিয়জন গত হলে আমরা যেভাবে ভেঙে পড়ি, শোকের সাগরে হাবুডুবু খাই, সাহাবিদের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু-দিনটাও ছিলো এমনই এক ঘোরতর শোকের সময়; কিন্তু সেদিন শোক আর বিষণ্ণতার মাঝেও, দুঃখ আর দুঃসহ যন্ত্রণার দিনে এমন এক সাহাবি ছিলেন, যিনি সবকিছু সত্ত্বেও, সবকিছুকে ছাপিয়ে একটি অনন্য দিকেও নিবদ্ধ রেখেছিলেন নিজের সবটুকু মনোযোগ।

তার নাম আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। নবিজির চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সন্তান। নবিজির মৃত্যুকালে আবদুল্লাহর বয়স ছিলো মাত্র তেরো বছর। শৈশবের পাঠ চুকিয়ে কৈশোরে পা রাখা এক দুরন্ত বালক আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন নবিজির বিশেষ স্নেহধন্যদের একজন। শিশুদের সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিষ্টি-মধুর সম্পর্কের কথা তো সর্বজনবিদিত। তার ওপর নিজের পরিবারের একজন হওয়ায় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস নবিজিকে কাছে পেয়েছিলেন অন্যদের চাইতে অনেক বেশি। খুব কাছ থেকে নবিজিকে দেখা, তার কথা শোনা, তার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের এক অনুপম ও অনন্য সুযোগ ছিলো ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে এবং তা তিনি হেলায় নষ্ট করেননি মোটেও।

নবিজির মৃত্যুর দিন সবাই যখন শোকাহত, বিষণ্ণতার ভীষণ ভারে যখন নুইয়ে আছে উম্মাহর তনু-মন, সেদিন ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ভাবলেন একেবারে ভিন্ন কিছু। যা হয়তো-বা ঘুণাক্ষরেও কারো মনে আসতো না, তেমন একটা কাজ তিনি করেছিলেন সেদিন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়েই ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ শুরু করে। আরব-ভূমির বাইরেও মুসলিমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে থাকে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। যেহেতু দ্বীনের মশাল পৃথিবী-ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, তাই নতুন করে যারাই ইসলামকে আপন করে নিচ্ছিলো আপন আলয় হিশেবে, তাদের মাঝে দ্বীনের বার্তাটুকু এবং আসমানি আলোর প্রভাটুকু বিলিয়ে দিতে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অনেক সাহাবিকে দীক্ষা দিয়ে ওই-সমস্ত অঞ্চলগুলোতে পাঠিয়েছিলেন। তারা কুরআনের সুমহান বার্তা, রিসালাতের অমিয় বাণী মানুষের দ্বারে দ্বারে, যেভাবে নবিজির কাছ থেকে তারা রপ্ত করেছিলেন, সেভাবেই তাদের কাছে পৌঁছে দিতেন।

কিন্তু যখন প্রিয় নবিজির মৃত্যুসংবাদ তাদের কাছে পৌঁছালো, তারা কি আর সেখানে থাকতে পারেন? সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচাইতে আপন মানুষটার বিদায়-বেলায় যদি হাজির না থাকা যায়, যদি চর্মচক্ষু দিয়ে প্রিয় মুখখানা শেষবারের মতন নাই-বা দেখা গেলো, তাহলে যে বন্ধুত্ব, যে ভ্রাতৃত্ব, যে প্রেম আর প্রণয়ের সম্মেলন হয়েছিলো হৃদয়ে, তা কি অপূর্ণতার গ্লানিতে ভরে উঠবে না?

তাই নবিজিকে শেষবারের মতন বিদায় জানাতে, শেষ দেখাটুকু দেখতে এসেছিলেন সাহাবিরা। যারা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তারা দলে দলে আসতে লাগলেন প্রিয় নবিকে 'আল-বিদা' জানাতে।

নবিজির প্রয়াণ-দিনে শোকে একেবারে আবিষ্ট হয়েও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ভাবলেন—দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়া সাহাবিরা যখন নবিজিকে শেষ দেখা দেখতে মদিনায় ফিরছে, তাহলে জীবিত সব সাহাবিকে একত্রে, একসাথে পাওয়ার এই তো সুযোগ! এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে, এমনটা বলা যায় না কোনোভাবে। আজ এমনসব সাহাবিরা মদিনায় ফিরছেন, যারা নবিজিকে কাছ থেকে দেখেছেন, নবিজির কাছ থেকে শিখেছেন। কুড়িয়ে নিয়েছেন রত্নের আকর। যেহেতু সবাই আজ দলে দলে মদিনায় ফিরে আসছেন, তাই নবিজির কাছ থেকে তারা যা পেয়েছেন, তা কুড়িয়ে নেওয়ার, সংগ্রহ করে ফেলার এই তো সুবর্ণ সুযোগ!

জ্ঞান অর্জনের প্রতি কতটা প্রবল আগ্রহ, অনির্বাণ ইচ্ছে, অদম্য প্রেরণা থাকলে এমন বেদনাহত দিনেও এমনকিছু কেউ ভাবতে পারে? অন্য কোনো সাহাবির মানসপটে যে ভাবনার বিন্দু-বিসর্গ পর্যন্ত ছিলো না, তা-ই কিনা ভেবে বসলেন মাত্র তেরো বছরের এক কিশোর!

তবে এ কথা ভাববার অবকাশ নেই যে—আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রয়াণে কাতর ছিলেন না। অন্য সবার মতন তিনিও শোকাহত ছিলেন। নবিজির বিদায়ে তারও হৃদয় ভেঙে চৌচির। এই বিপর্যয়ে তার মনেও কালবোশেখির ঝড়, কিন্তু সেই শোকের আবহ থেকে, সেই কালবোশেখির অন্ধকারেও তিনি জ্ঞান অর্জনের চিন্তা থেকে নিবৃত হননি। বিপদের মাঝেও তিনি আশা খুঁজে নিতে চেয়েছেন। শোকের মাঝেও খুঁজে নিতে চেয়েছেন সান্ত্বনার বস্তু।

তিনি ভেবেছিলেন—মদিনার বাইরে ছড়িয়ে পড়া সাহাবিরা, তাদের মাঝে এমন জ্ঞানের সন্ধান মিলতে পারে, যা হয়তো-বা আমার জানা নেই। হতে পারে—নবিজির কাছ থেকে তারা এমনসব জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, যা আর অন্য কেউ জানে না। এই সুযোগে আমি যদি তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের কাছ থেকে সেই দুর্লভ মণিহার আহরণ করে নিতে পারি, তাহলে আমার জানার জগৎ আরো সমৃদ্ধ, আরো পোক্ত হবে।

তিনি তা-ই করলেন। নবিজির মৃত্যু উপলক্ষে মদিনার বাইরে থেকে আগত অসংখ্য সাহাবির দরোজায় দরোজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস। তাদের বলতেন, 'আমি ইবনু আব্বাস। আমি জানি আপনি নবিজির প্রিয় একজন সাহাবি। আপনি তো দিন কয়েক বাদেই মদিনা ছেড়ে চলে যাবেন, তাই আমি আপনার কাছ থেকে এই ফাঁকে কিছু শিখতে এসেছি। আপনি আমাকে এমনকিছু শেখান, যা নবিজি আপনাকে শিখিয়েছেন। হতে পারে, আপনার আহরিত জ্ঞানে এমন অসংখ্য মণি-মুক্তো আছে, যা আমার জানা নেই। আমি শিখতে চাই।'[১]

তেরো বছরের এক কিশোর, যার স্বভাব-স্নিগ্ধ কোমল চেহারা থেকে এখনো মোছেনি কৈশোরের দ্যুতি, সেই বালক জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণের তাগিদে কী অদম্য প্রয়াসেই না মানুষের দ্বারে দ্বারে ধরনা দিতে এলো!

ইনিই সেই আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি কুরআনের তাফসির করার জন্য ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাকে বলা হয় তাফসিরকারকদের শিরোমণি। তাফসিরশাস্ত্রে তার মতন প্রজ্ঞা আর পাণ্ডিত্য আর কারো মাঝেই ছিলো না। পৃথিবীর যেখানেই, যে-কেউই কুরআনের তাফসির করতে গেলে, তাকে অবশ্যই অবশ্যই আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সামনে রাখতে হবে। তার মত ডিঙিয়ে তাফসির করা একপ্রকার অসম্ভব। জ্ঞান অর্জনে তার যে ব্রত ছিলো, যে অনির্বাণ, অনিঃশেষ স্পৃহা নিজের মাঝে তিনি ধারণ করেছিলেন, তা-ই তাকে এই মর্যাদায় আসীন করেছে নিঃসন্দেহে।

'বয়স কম, এখনো তো জীবনের অনেক সময় বাকি' এই অজুহাত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহাকে দমাতে পারেনি। যে বয়সটা

---

[১] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩২৮

হেসেখেলে পার করবার, সেই বয়সে তিনি হয়ে উঠেছিলেন জ্ঞানের এক অনন্য বাতিঘর! একদিনের চমৎকার এক ঘটনা থেকে আমরা যার প্রমাণ পাই।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন মুসলিম জাহানের খলিফা। রাষ্ট্রের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি শুরা বৈঠক ডাকতেন এবং অভিজ্ঞ, প্রবীণ কিন্তু দূরদর্শী—এমন সব সাহাবিদের সাথে শলা-পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। এমন এক বৈঠকে, যখন প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ সাহাবিরা বসে আছেন, তখন সেখানে একদিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে উপস্থিত। সাধারণত এমন বৈঠকে তার উপস্থিত হওয়ার কথা নয়। একে তো আবদুল্লাহ বয়সে অনেক ছোটো, সবে কৈশোর যায় যায় করছে, তার-ওপর, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এমন এক বৈঠকে হঠাৎ করে তার আগমনে সবাই বেশ বিস্মিত! কেউ কেউ প্রশ্নও উত্থাপন করে বসলেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! মার্জনা করবেন। আমাদের শুরা মজলিসে বালক আবদুল্লাহর উপস্থিতির কারণ আমাদের কারো বোধগম্য হয়নি। আপনি কি আমাদের জানাবেন, কেন এমন একটা বৈঠকে আবদুল্লাহকে ডাকা হলো?'

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আবদুল্লাহ বয়সে ছোটো, কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে সে আপনাদের অনেকের চেয়ে এগিয়ে।'

উত্তরটা উপস্থিত অনেকের মনপূত হলো না। আবদুল্লাহর বয়েসী অনেক ছেলেপিলে তাদেরও আছে। তাদের কাউকে তো এখানে ডাকা হয় না। তাহলে আবদুল্লাহকেই বা কেন ডাকা হবে?

অন্য আরেকদিন আবারও শুরা মজলিসের ডাক পড়লো। মজলিসের প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ সকল সাহাবি উপস্থিত। উপস্থিত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুও। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত সকল সাহাবির দিকে তাকিয়ে সুরা আন-নাসর তিলাওয়াত করে বললেন, 'আচ্ছা, আপনাদের কাছে আমি একটা বিষয় জানতে চাই। আপনাদের কেউ কি বলতে পারবেন, এই সুরা নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের কীসের ইঙ্গিত দিয়েছেন?'

মজলিসে শুরার প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ সাহাবিদের অনেকে বললেন, 'আমি জানি না'; আর অনেকে চুপ করেই থাকলেন। এরপর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ফিরে বললেন, 'আবদুল্লাহ, তুমি কি কিছু বলতে

পারো এই ব্যাপারে?'

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সুরার মাধ্যমে আমাদের খুব সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। 'যখন বিজয় আসবে এবং মানুষেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে'—এই কথাগুলোর মাধ্যমে তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, ইসলামের বিজয় যখন অত্যাসন্ন হবে, ঠিক তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও দুনিয়ার জীবনের সময়কাল ফুরিয়ে আসবে। এই সুরা থেকে ইসলামের বিজয়ের সাথে সাথে আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুরও একটা পূর্বাভাস পাই।'

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর উত্তর শুনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আবদুল্লাহ, এই ব্যাপারে আমি যা জানতাম, তুমিও ঠিক তা-ই জানো।'[১]

খেয়াল করা যাক—মজলিসে শুরায় কত প্রবীণ, অভিজ্ঞ সাহাবিরা ছিলেন, তথাপি সুরা আন-নাসরের মাঝে থাকা এই সূক্ষ্ম বিষয়, এই সুপ্ত জ্ঞান তাদের কেউই কিন্তু জানতেন না; অথচ তারা সকলে যা জানতেন না, তা জানতেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। অতোটুকুন বয়সে, জ্ঞানের শাখায় কীরকম বুৎপত্তি লাভ হলে তিনি এই সূক্ষ্ম বিষয়টা জানতে পারেন, তা কি অনুমান করা যায়? এই হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের কুরআনকেন্দ্রিক অর্জিত জ্ঞান ও চিন্তা। আর এই কারণেই, বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, মজলিসে শুরার অন্যতম সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছিলেন।

'বয়স কম'—এই অজুহাতে আমরা যারা নিজেদের জ্ঞানার্জন থেকে নিবৃত করতে চাই কিংবা আমাদের পরিবার-সমাজ, যারা আমাদের দমিয়ে রাখতে চায় 'বয়স হয়নি' বলে, সবার জন্যই একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ আছে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই ঘটনায়। কম বয়স যে শেখার পথে কোনো বাধা নয় বরং উৎসাহ—সেটা আমরা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে শুরার ঘটনায় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনন্য-সাধারণ মেধার পরিচয় থেকে অনুধাবন করতে পারি।

---

[১] *আল আকিদা ফি আহলিল বাইত বাইনাল ইফরাত ওয়াত তাফরিত*, পৃষ্ঠা : ৩২৪-৩২৫; *সহিহুল বুখারি* : ৪২৯৪

তিন.

বয়স বেশি হয়ে গেছে বলেও আমাদের অনেকসময় মনোকষ্টে, অসহায়ত্বে ভুগতে দেখা যায়। যদি ভেবে থাকেন যে, জ্ঞান অর্জনের বয়স আপনি পার করে এসেছেন, এই বয়সে আপনি আর কতই-বা জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন, যদি মনে করেন জ্ঞানার্জনে আপনি অন্যদের চাইতে পিছিয়ে পড়েছেন, আর কোনোভাবেই আপনি জ্ঞানার্জনের ধারায় অগ্রগামীদের কাছাকাছি আসতে পারবেন না, তাহলে আপনাকে জাগিয়ে তুলতে, ফিরিয়ে আনতে আপনার হারানো আত্মবিশ্বাস—আমার কাছে একটা চমৎকার উপায় আছে।

সাহাবি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম শুনেছেন নিশ্চয়? হাদিসের গ্রন্থগুলোর পাতা উল্টালে কিংবা অন্য অনেক জায়গায়, যখনই আপনি হাদিস পড়তে গেছেন, অসংখ্য অসংখ্যবার আপনি এই নামখানা দেখেছেন অবশ্যই। আপনি পড়েছেন, 'আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন...।'

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হলেন সেই সাহাবি, যিনি সবচেয়ে বেশি-সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছিলেন। সাহাবিদের মধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস সবচেয়ে বেশি মুখস্থ করেছিলেন তিনিই। পরবর্তী সময়ে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন উম্মাহর মাঝে। এমনকি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি এগিয়ে আছেন নবিজির স্ত্রী, উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চাইতেও। এ এক অনন্য, অসাধারণ কীর্তি!

কিন্তু জানলে অবাক হতে হয়, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ পেয়েছিলেন মাত্র তিনবছর। নবিজির গোটা তেষট্টি বছরের জীবন থেকে কেবল তিনটে বছর তার সংস্পর্শে থাকার সৌভাগ্য হয় আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর। তার ইসলাম গ্রহণের তিন বছর পরেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেন।

মাত্র তিনটি বছর কাছে পেয়েছিলেন নবিজিকে। নবিজির সাথি হওয়ার সময়কালটা তার জন্য বড়োই সংক্ষিপ্ত; অথচ এই তিন বছরেই তিনি কিনা হয়ে উঠলেন জ্ঞানের এক অনন্য উদাহরণ! এই তিন বছরেই তিনি নিজেকে নিয়ে গেলেন এমন এক উচ্চতায়, যেখান থেকে আজ গোটা মুসলিম উম্মাহ নিত্যদিন, নিত্য-নিয়ম

করে তাকে পড়ে, তার নাম উচ্চারণ করে। হোক হাদিসের ছাত্র কিংবা সাধারণ তালিবুল ইলম, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চেনে না, তার নাম শোনেনি কোনোদিন—এমন ঘটনা ঘটা একেবারে অসম্ভব।

'অন্যেরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, আমি পিছিয়ে পড়েছি', কিংবা 'জীবনের সূর্যটা অস্তগামীপ্রায়, আর কি সময় হবে নতুন করে শেখার'—ভাবনার এমন দোলাচলে আমরা যারা দোদুল্যমান আছি, আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার এক অনন্য বাতিঘর হলেন সাহাবি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু। কত কম সময়ে কতকিছু যে শিখে ফেলা যায়, তা আমরা এখান থেকে শিখতে পারি।

তাই, শেখার শুরুটা আপনি কবে করছেন তা বিবেচ্য নয়। করছেন কি না, আর করলেও তাতে কতখানি আন্তরিকতা বিদ্যমান, তা-ই হচ্ছে ব্যাপার।

বয়সের ভার যদি জ্ঞানার্জনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, একবার মনে করুন সাহাবি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা। মাত্র তিনটে বছর-ই তো! এর পরেরটুকু ইতিহাস!

চার.

সময় ফুরিয়ে যায়নি। দরকার একটা ইস্পাত-কঠিন সংকল্প আর অদম্য ইচ্ছের। আপনার বয়স কম, সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। ব্যাপার হচ্ছে, আপনার ভেতরে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতন সবুজ-সতেজ চেতনা আছে কি না, যেই চেতনা গভীর শোকের মাঝেও খুঁজে নেবে শেখার উপকরণ। যে চেতনা আপনাকে আন্দোলিত করবে নতুন করে শিখতে। নতুন কিছু শিখতে।

বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে গেলেও ঘাবড়াবেন না, চিন্তিত হবেন না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের জন্য বরাদ্দ আছে অবারিত সুযোগ। আরবি পড়তে পারেন না কিংবা এককালে পারলেও এখন ভুলে গেছেন, তা কোনো সমস্যা না। সমস্যা তখনই যখন শেখার জন্য আপনার মাঝে কোনো তাড়না না থাকে। বনশ্রীর সেই বৃদ্ধা, যাকে আমি দেখতাম কুঁজো হয়ে যাওয়া শরীর নিয়ে রোজ আরবি পড়তে আসতেন, তার দৃঢ়তা আর ধৈর্যকে আমার কাছে কখনোই নুইয়ে পড়া কিংবা ম্লান হয়ে আসা কোনোকিছু মনে হতো না; বরং মনে হতো—থুরথুরে শরীরের আড়ালে একটা অদম্য যৌবনশক্তি কোথায় যেন লুকিয়ে আছে, যা তাকে জীবনের শেষলগ্নে

এসেও কাবু হতে দেয়নি। বয়সের ভার কিংবা সময়ের স্বল্পতা কখনোই শেখার পথে বাধা নয়। সাহাবি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতন যাদের অন্তরে আছে শেখার অদম্য তৃষ্ণা, তাদের জন্য জীবনের শেষ দিন, এমনকি শেষ মুহূর্তটাও সুবর্ণ সুযোগ। কবি বলেছিলেন, 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র।' ছাত্র হওয়ার একটা দারুণ মজা আছে! শিখতে পারার মজা!

কখনো ভুল হলে

এক.

ঘটনাটা পরিচিত একজনের। কোনো এক কারণে তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে তিনি সেদিন অফিস থেকে ফিরছেন। মাথা এমন ভার—যেন মস্তিষ্কের নিউরনগুলোতে জট বেঁধে গেছে। এমন অস্বাভাবিক রাগ তার হয় না সাধারণত। কেন যে সেদিন তিনি এত রেগে গেলেন এবং মেজাজখানা-ই বা কেন একেবারে সপ্তমে চড়ে বসেছিলো কে জানে! বাসায় ফেরার জন্য একজন রিকশাওয়ালাকে বললেন,

'অমুক জায়গায় যাবেন?'

'যামু।'

'কত টাকা ভাড়া?'

'এত দেওন লাগব। রাস্তায় জ্যাম বেশি।'

প্রথমত অসহ্য গরম, তার ওপর মস্তিষ্কের কোষগুলোতে তখন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যুদ্ধের দামামা বাজতে শুরু করেছে; খুব বেশি বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে ভাড়াটাকে যে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনবেন, মনের সেই অবস্থা নেই। একপ্রকার সওয়াল-জওয়াব ছাড়াই রিকশায় চড়ে রাস্তার বাড়ি-ঘর, মানুষ আর যানবাহন গুনতে গুনতে বাসার উদ্দেশে পথ পাড়ি দিতে লাগলেন তিনি।

রিকশাওয়ালাকে যে জায়গার কথা বলে রিকশায় চড়েছেন, তার মূল সড়কে এনে রিকশাওয়ালা বললেন, 'নামেন। আইয়্যা পড়ছি।'

যদিও মাথার তেজ কমার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই, তথাপি নিজেকে শান্ত রাখার সবটুকু চেষ্টা চেহারায় ফুটিয়ে তুলে এবং গলাটাকে যতখানি নরম করা যায়, তার সবটুকু ঢেলে দিয়ে বললেন, 'এই দিকে একটু ভেতরে যান। সামনের মোড় পার হলেই আমার বাসা।'

কিন্তু তার ভদ্র-কথা আর ভদ্রোচিত চেহারা—কোনোটাই রিকশাওয়ালার মন গলাতে পারলো না। তার আবদারকে সম্পূর্ণভাবে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে রিকশাওয়ালা বললেন, 'যেখানের কথা কইছেন ওইখানে আইয়্যা পড়ছি। এর বেশি আমি আর যাইতে পারুম না।'

অন্যকোনো দিন হলে একটা ব্যাপার ছিলো, কিন্তু সেদিন নিজের মন-মেজাজের বেহাল দশা, তার ওপর এখন আবার সামান্য একটা বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি! দেড় মিনিটের রাস্তা, একটুখানি সামনে গেলে কী এমন ক্ষতি হবে রিকশাওয়ালার?

তখনো নিজেকে স্বাভাবিক রাখার সবটুকু কসরত করে তিনি বললেন, 'দেখুন ভাই, আমি এই জায়গায় নামবো বলেছি ঠিক আছে, কিন্তু তার মানে তো এই না যে, আপনি আমাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। আর এই এলাকা মানে তো কেবল এই রাস্তাটাই নয়। এলাকাটা বিশাল। রাস্তায় নেমে যাওয়ার জন্য তো আমি আপনার রিকশায় উঠিনি।'

তিনি ভেবেছিলেন তার যুক্তিতে রিকশাওয়ালা একেবারে কুপোকাত হয়ে যাবেন, কিন্তু তাকে নিরাশ করে দিয়ে রিকশাওয়ালা বললেন,

'এত কথা কইয়েন না মামা। যে জাইগার নাম কইছেন ওই জাইগাই আইছি। অহন নামেন আর ভাড়া দেন।'

'তার মানে আপনি আর সামনে যাবেন না?'

'না।'

'আমাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যাবেন?'

'যেখানে কইছেন ওইখানে নামাই দিছি।'

নিজেকে আর ধরে রাখা গেলো না কোনোভাবে। সারাদিনের ক্লান্তি, মস্তিষ্কের ওপর মেজাজের যে ভারিক্কি চাপ পড়েছে সেটা এবং রিকশাওয়ালার অনড় কিন্তু অবিবেচক অবস্থান তাকে একেবারে অন্য-মানুষ হয়ে উঠতে বাধ্য করলো যেন। কোনোদিন যা করেননি, কোনো সময়ে যা তাকে দিয়ে হয়নি এবং যা করার কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না, তা-ই করে বসলেন। মাথায় অসম্ভব রাগ চেপে রেখে তাকে বললেন, 'আপনি জানেন আপনি কার এলাকায় এসে কথা বলছেন?'

'আপনের এলাকা? তো হইছে কী? আপনে আমারে মাইরবেন?'

'মারবো তো অবশ্যই না, কিন্তু মানুষ যে আপনাদের গায়ে হাত তোলে, তা মনে হয় মাঝে মাঝে ঠিক-ই আছে। আপনাদের গোয়ার্তুমির কারণে আপনারা মার খান।'

'এত কথা কইয়েন না মামা। টেহা দেন, যাইগা।'

তার সাথে বেশিদূর কথা আগানোর অবস্থায় তিনি ছিলেন না আর। রাগে গজগজ করতে করতে, টাকা ক'টা গুনে একপ্রকার তাচ্ছিল্যের সাথে তার হাতে দিয়ে সোজা রাস্তা ধরলেন; কিন্তু তার রাগ, তার অহংকার আর দম্ভোক্তি বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। হোক রাগের মাথায়, হোক রিকশাওয়ালা-ই ভুল কিংবা অন্যায় করেছে, কিন্তু যে অন্যায় তিনি রিকশাওয়ালার সাথে করে ফেলেছেন, যে কদর্য ব্যবহার, যে অশালীন আচরণ তিনি প্রদর্শন করেছেন খানিক আগে, তা যখন পুনরায় তার মানসপটে ভেসে উঠলো, তিনি যেন ভেতর থেকে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে লাগলেন! যেন তিনি ভেঙে যেতে লাগলেন হুড়মুড় করে। একটু আগে যে রূপ তিনি দেখিয়েছেন, যে ভাষা মুখ দিয়ে বের করেছেন, তা কোনোভাবেই তার পরিচিত নয়। এই 'তিনি'কে তিনি চেনেন না।

রিকশাওয়ালা তাকে যে জায়গায় নামিয়ে দিয়ে ভাড়া গুনে নিয়ে ফিরে গেছে, সেখান থেকে হেঁটে বাসায় যেতে তার বড়োজোর চার থেকে পাঁচ মিনিট লাগে। ওই চার/পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করে বাসায় ফেরার আগেই তিনি বিবেকের দংশনে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে লাগলেন। বারবার তার মনে হচ্ছিলো, 'হায় আল্লাহ! এ আমি কী করে ফেললাম?' আল্লাহর দরবারে বারংবার ক্ষমাপ্রার্থনা করেই চললেন তিনি। গরিব একজন মানুষের সাথে তার এমন কদর্য ব্যবহারের কারণে, এমন অশালীন আচরণের কারণে মালিক যেন তার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন, সেজন্য তার চিন্তার জগতে, তার মস্তিষ্কের নিউরনে নিউরনে কেবল একটাই ব্যাপার ঘটে চলেছে তখন—ইস্তিগফার। আল্লাহর কাছে বারে বারে মাফ চাওয়া।

দুই.

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন বান্দা পর্বত পরিমাণ ভালো আমল নিয়ে হাজির হবে, কিন্তু সে দেখবে—কেবল কদর্য ভাষার কারণে তার সমস্ত ভালো আমল ভেস্তে গেছে।'[১]

সারাজীবনের চেষ্টায় যেটুকু আমল নিয়ে মহামহিম রবের দরবারে হাজির হতে হবে, যা কিছু সঞ্চয় ওপারের জন্য জমা আছে, কেবল রিকশাওয়ালার সাথে এমন অমানবিক আচরণের কারণেই যদি সব হারাতে হয়, তাহলে এর চাইতে বড় দেউলিয়াত্ব আর কী আছে?

কারো কারো মনে হতে পারে, কী এমন আহামরি রিকশাওয়ালাকে বলে ফেলেছেন, যার দরুন তিনি এভাবে ছটফট শুরু করেছেন? হতে পারে আহামরি কিছুই তিনি বলেননি। হতে পারে সাধারণ বাঙালি মুসলিম, তার রোজকার জীবনে শ্রমিক শ্রেণি আর নিম্নশ্রেণির মানুষের সাথে যে ভাষায় কথা বলে, তার চাইতেও অধিক সভ্য-ভব্য তার শব্দচয়ন, বাক্যের মাত্রা। রিকশাওয়ালাকে তিনি না চড় লাগিয়েছেন, না থাপড়ানোর হুমকি দিয়েছেন। এসবের ধারে-কাছেও ঘেঁষেননি তিনি। তথাপি কেন তার ভেতর এত অনুতাপ, অনুশোচনা?

মানুষ হয়তো-বা তার কথাগুলোতে তেমন কোনো শ্লেষ, তেমন কোনো তিরস্কার খুঁজে পাবে না; কিন্তু উচ্চারণের সময় তাতে কী পরিমাণ অহংকার, দাম্ভিকতা আর বড়োত্ব জাহিরের প্রয়াস ছিলো, তা কেবল তিনিই জানেন। আর একজন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ, যিনি নিতান্তই সংগ্রাম করে জীবনযাপন করেন, তার সামনে নিজের এহেন দাম্ভিকতা প্রদর্শন, অহংকারের এমন পসরা সাজানোর ফলে আল্লাহর দরবারে কোন কৈফিয়ত নিয়ে তিনি হাজির হবেন? হাজারো পাপের ভিড়ে আপাতদৃষ্টিতে 'পাপ নয়' এমন বিষয়টাও যদি তাকে পাকড়াও করার জন্য কিয়ামতের ময়দানে হাজির হয়ে পড়ে, কোন সে পথ, যা দিয়ে তিনি পলায়ন করবেন সেদিন? এই বোধটাই তাকে অনুতপ্ত করে তুলেছিলো সেদিন। ওই রিকশাওয়ালার কাছে মাফ চাওয়ার সুযোগটা তার হাতে ছিলো না, কিন্তু গাফুরুর রাহিম, যিনি জানেন বান্দার অন্তরের অবস্থা, তার কাছে অনুনয় করে তিনি ক্ষমা

---

[১] *আদ-দাউ ওয়াদ-দাওয়া* : ১৮৮

চেয়েছেন। তিনি বুঝলেন যে, তার ভুল হয়েছে। ভুল হয়ে গেলে ভুলের ওপর স্থির না থেকে, যুক্তি-তর্ক সাজিয়ে সেই ভুলকে সমর্থন করে অন্তরে প্রবোধ লাভের চাইতে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নিজেকে শুধরে নেওয়ার মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ।

ভুল হয়ে গেলে হোক সে ভুল একেবারে সামান্য কিংবা অণু পরিমাণ, তবু তার জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হতে পারা, ক্ষমা লাভের আশায় অশ্রু বিসর্জন করতে পারা, মুনাজাতে দুহাত উত্তোলন করতে পারা একটা সবুজ সতেজ হৃদয়ের স্বাক্ষর বহন করে। যারা ছোটোখাটো ভুলে একেবারে নত হয়ে যায়, অন্তর্দহনে অস্থির হয়ে পড়ে, তাদের দ্বারা বড় কোনো ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব সামান্য। তারা পথ হারায় কম। পদস্খলনের ব্যাপারে তারা সম্যক সতর্ক।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'একজন তাকওয়াবান পাপ কাজকে এমন ভয় পায়, সে মনে করে সে কোনো পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, আর পাহাড়টা তার ওপর বুঝি ধ্বসে পড়তে যাচ্ছে। অপরদিকে পাপে নিমজ্জিত ব্যক্তি পাপ কাজকে এতই হালকাভাবে দেখতে শুরু করে, পাপ কাজ করাকে সে নাকের ডগায় থাকা একটা মাছির মতো মনে করে, যেন একটু হাত নাড়লেই তা উড়ে পালাবে।'[১]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যে উপমা এখানে দিয়েছেন, তা খুবই যথাযথ। একজন তাকওয়াবান ব্যক্তি, যার হৃদয়ে সবসময় আল্লাহর ভয় কাজ করে, তার কাছে পাপ কাজকে পর্বত পরিমাণ বোঝা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ তার নফস এটার সাথে কোনোভাবেই অভ্যস্ত না। মিথ্যে কথা বলার আগে তার মন দুরুদুরু করতে থাকে। 'হায়! আমি কীভাবে মিথ্যে বলবো'—এমন মর্মযাতনায় সে বিধ্বস্ত হতে থাকে বারবার। কাউকে ঠকিয়ে কোনোকিছু অর্জনের মতন পাপ কাজ সামনে এলে সে শিউরে ওঠে। জীবনের এমন জটিল সমীকরণ থেকে সে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কারণ সে জানে—জগতের আর কেউ জানুক বা না-জানুক, আর কেউ দেখুক কিংবা না-দেখুক, আসমানে যিনি আছেন, যিনি মানুষের অন্তঃকরণ থেকে শুরু করে গভীর পাতালে থাকা অণুজীবের ব্যাপারেও ওয়াকিবহাল, তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। হাশরের ময়দানে যখন আমলনামা

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৬৩০৮; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ২৩৫৮; *শুআবুল ঈমান* : ৬৭০২—হাদিসটির সনদ সহিহ

হাজির করা হবে, সেদিন আজকের এই খুচরো মিথ্যে যা একান্ত হাসতে হাসতেই, কৌতূকাচ্ছলেই বলে ফেলা হলো, আজকের এই লোক ঠকানি, যা কেউ দেখেনি ভেবে সেরে ফেলা হলো নির্বিঘ্নে, সবকিছুই যে একে একে সামনে তুলে ধরা হবে—সে ব্যাপারে তাকওয়াবান ব্যক্তি মাত্রই সবিশেষ জ্ঞাত। তাই জীবনের যেকোনো অনুষঙ্গে, যেকোনো পাপ কাজের সুযোগে সে শিউরে ওঠে, পালায় আর ভাবে, 'এই বুঝি আযাবের পর্বত ধ্বসে পড়লো আমার মাথায়।'[১]

অন্যদিকে যার অন্তঃকরণে নেই আল্লাহর ভয়, যার কাছে আখিরাত কেবল কেতাবি আলোচনার বিষয়বস্তু, পাপ কাজকে সে খুব সস্তাভাবেই দেখে; এমন সস্তা ভাবে যে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জুতসই উপমার মাধ্যমেই বলেছেন সেটা—যেন নাকের ডগায় বসা কোনো মাছি, হাত নাড়ালেই উড়ে চলে যাবে।

এ হলো আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল আর আল্লাহকে স্মরণকারী দুটো হৃদয়ের উদাহরণ। কোন শিবিরে আমরা নিজেদের দেখতে পছন্দ করি, তা বেছে নেওয়ার দায়িত্ব নিজেদের। সেই শিবিরে, যে শিবিরে সদা-স্মরণে গুঞ্জরিত হয় মহামহিমের নাম? নাকি সে শিবিরে, যাদের অন্তঃকরণে পড়ে গেছে অবাধ্যতার মরিচা?

তিন.

ভুল করার পরে যদি আপনি ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হন, অনুতপ্ত হন, যদি অনুশোচনায় কাতর হয়ে ওঠে আপনার তনুমন, তাহলে জানুন—আপনার অন্তরের কোথাও এখনো জিইয়ে আছে এক টুকরো সবুজ। সেই সবুজটাকে বাড়তে দিলে তা নিশ্চিতভাবে একদিন ঘন-অরণ্যে পরিণত হবে। তাতে যদি পানি দেওয়া হয়, পরিমিত পরিচর্যা করা হয়, একদিন সেই অরণ্যের বনে বসবে মহীরুহের মেলা।

ভুল করার পরে 'আল্লাহর সামনে কীভাবে দাঁড়াবো'—এই ভয়ে যদি প্রকম্পিত হয় আপনার অন্তর, তাহলে নিশ্চিত হন—আপনার হৃদয়ের কোথাও এখনো মিটিমিটি করে জ্বলছে একটুকরো আলো। আলোটাকে নিভতে না দিয়ে যদি আরো ভালোভাবে জ্বলে ওঠার বন্দোবস্ত করা যায়, তাহলে অন্ধকার হৃদয় একদিন আলো ঝলমলে উঠোনে পরিণত হবে।

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১০৩-১০৪

মানুষ-ই ভুল করে এবং মানুষকেই ভুল শুধরানোর, ভুল থেকে ফিরে আসার, তাওবা করার সুযোগ দেওয়া হয়। মানুষকে মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা যদি কোনো পাপ না করতে, তাহলে আল্লাহ অন্য কাউকে তোমাদের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত করতেন। তারা পাপ করতো আর মাফ চাইতো, এবং তাদেরকে মাফও করা হতো।'[১]

মানুষকে এই কাঠামোতেই তৈরি করা হয়েছে। বান্দা পাপ করবে, ভুল করবে এবং অবাধ্য হবে; তবে দিনশেষে সে প্রত্যাবর্তন করবে তার রবের কাছে। নিজের যাবতীয় কৃতকর্মের জন্য সে হবে অনুতপ্ত। অনুশোচনায় কাতর হয়ে উঠবে তার হৃদয়-মন। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে। যে পাপ থেকে সে ফিরে আসবে, তার নিকটবর্তী না হওয়ার এক কঠিন সংকল্প নিজের ভেতর রাখতে হবে।

শাইখ আলি তানতাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'একবার আমার জানতে ইচ্ছে হলো, আল্লাহ কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন? আগ্রহ ও কৌতূহলের জায়গা থেকে আমি এর উত্তর পেতে চাইলাম কুরআন থেকে। কুরআন খুলে দেখতে লাগলাম যে, আল্লাহ কাদের ভালোবাসেন? কী তাদের বৈশিষ্ট্য?

আমি কুরআন খুলে দেখলাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নেককারদের ভালোবাসেন। ভাবলাম, 'আমি কি নেককার বান্দা?' মনে হলো, না। তাহলে তো আমি এই তালিকা থেকে বাদ পড়লাম।

তারপর দেখলাম, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন; কিন্তু নিজেকে খুব বেশি ধৈর্যশীল বলে মনে হলো না আমার। ফলে এই তালিকা থেকেও বাদ পড়ে গেলাম।

এরপর দেখলাম, আল্লাহ মুজাহিদদের ভালোবাসেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে; কিন্তু আমার মতন অলস আর অক্ষম ব্যক্তি তো এই তালিকায় ওঠার কথা ভাবতেও পারি না। ফলে এখান থেকেও ছিটকে গেলাম।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৭৪৯

তারপর দেখলাম, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা সৎ কাজে এগিয়ে; কিন্তু নিজের আমল আর আখলাকের দৈন্যদশা দেখে এই তালিকাতেও নিজেকে ভাবা গেলো না।

একপ্রকার হতাশা আর গ্লানিবোধ নিয়েই আমি কুরআন বন্ধ করে ফেলি। নিজের আমল, তাকওয়া আর ইখলাসের দিকে তাকিয়ে আমি তাতে রাজ্যের ভুল-ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলাম না। কিন্তু একটু পরেই আমার মনে হলো, 'হ্যাঁ, আল্লাহ তো তাদেরও ভালোবাসেন যারা তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।'

মনে হলো, এই একটা বৈশিষ্ট্যই বুঝি আমার জন্য মজুদ আছে এবং আমি তা যখন-তখন নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারি। এরপর আমি খুব বেশি পরিমাণে ইস্তিগফার পড়তে থাকি, যাতে করে আমি আল্লাহর সেসব বান্দাদের তালিকাভুক্ত হতে পারি, যারা অধিক পরিমাণে তাওবা করে এবং যাদের আল্লাহ ভালোও বাসেন।[১]

আমরা হয়তো-বা নেককার হতে পারলাম না, আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হওয়ার সৌভাগ্যও হয়তো আমাদের কপালে নেই। অনুপম ধৈর্যের অধিকারী কিংবা যারা বেশি ভালো কাজে অগ্রগামী—তাদের দলভুক্তও হয়তো হতে পারলাম না; কিন্তু তাই বলে কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভালোবাসার তালিকা থেকে একেবারে বাদ পড়ে যাবো? কখনোই নয়। আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার একটা রাস্তা সদা-সর্বদা খোলা রয়েছে আমাদের জন্য। আর সেই রাস্তা হলো—তাওবার রাস্তা। অধিক পরিমাণে তাওবা করা। আল্লাহর কাছে নিজের পাপ, নিজের ভুল, নিজের অবাধ্যতার জন্য কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাওয়া।

ভুল করেও ভুলের ওপর স্থির থাকা এবং সেই ভুলকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে জায়েয বানানোর চেষ্টা করাটা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে অস্বীকার করাটা ছিলো ইবলিসের ভুল আর সেই ভুলকে—'আমি আগুনের তৈরি আর আদম মাটির তৈরি, তাই আমি সেরা হয়ে কেন আদমকে সিজদা করবো'—যখন সে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণে লেগে গেলো, তখন সে ভুলের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো একেবারেই। এই মাত্রা ছাড়ানোটাই তাকে অভিশপ্ত বানিয়ে ছাড়লো।

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২২

অপরদিকে ভুল করার পর তা বুঝতে পারা, তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া, তা থেকে বিরত হওয়া এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া একটা সতেজ, সুন্দর এবং সবুজ অন্তরের প্রমাণ বহন করে। জান্নাতে শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কারণে যখন আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহাস সালামকে দুনিয়ায় নামিয়ে দেওয়া হয়, তখন তারা নিজেদের কৃত ভুল বুঝতে পেরে, তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে, গভীর অনুশোচনাসহ তারা আল্লাহর কাছে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ভুল হয়ে গেলে তা নিয়ে অন্তরে পেরেশানি দেখা দেওয়াটা তাকওয়ার লক্ষণ।

তাই, কখনো ভুল হলে, কখনো পাপ কাজ হয়ে গেলে—হোক তা যত ক্ষুদ্র আর নামমাত্র, তা থেকে ফিরে আসার তাগাদা হৃদয়ে মজুত রাখতে হবে। ভুলের ওপর অটল না থেকে, তা থেকে বিরত হয়ে, নফল সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইতে পারলে অন্তর প্রশান্ত হয়। বারে বারে সেই ভুলের কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত হওয়া, তার জন্য বারে বারে আল্লাহর ক্ষমা আশা করে ইস্তিগফার পাঠ করা এবং নিজের পাপ মোচনের নিমিত্তে কিছু দান-সাদাকা করতে পারলে একদিকে যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভে এগিয়ে যাওয়া যায়, অন্যদিকে ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে ধারণ করা যায় ভালো কিছু আমলের চর্চা।

বন্দিশিবির থেকে

এক.

মানুষ বন্দি হয়ে বাঁচতে চায় না। সে স্বাধীন পাখির মতো ডানা মেলে আকাশপানে উড়তে চায়। সে উড়ে বেড়াবে সবুজ অরণ্যে, বৃক্ষের ডালে-ডালে। সে কথা বলবে ফুলের সাথে। মুক্তবিহঙ্গ হয়ে সে উপভোগ করবে জীবন আর জীবনের ছন্দ। সে তন্ময় হয়ে দেখবে আদিগন্ত নীল আকাশ! দখিনা বাতাসে সে এলিয়ে দেবে গা। ঝুম বৃষ্টির ঐকতানে সে কান পেতে শুনবে প্রকৃতির নির্মল সংগীত। নদীর কলতান, ঝরনার গান আর দৃষ্টি ছাড়িয়ে যাওয়া দূর পাহাড়ের ছায়া—প্রকৃতির শোভা দু-চোখে নিয়ে বাঁচতে চায় সে।

কিন্তু মানুষ তা পারে না। দিনশেষে তাকে বন্দি হতে হয়। সমাজের শৃঙ্খলে, অনিয়মের অন্ধকারে। কখনো-বা নিরন্তর সংগ্রামের বাঁধনে। সে দেখতে চায় নীল আকাশ, কিন্তু জীবন তাকে উপহার দেয় বেদনার নীল। পাহাড় তার পছন্দ, কিন্তু যাপিত জীবনে দুঃখ আর বেদনা হয়তো তার জীবনে হিমালয় হয়ে বর্তমান।

মানুষ কোনো না কোনোভাবে জীবনে বন্দি হয়ে পড়ে। সে ছটফটায়। সে মুক্তি চায়। সে চায় শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে যেতে। বেদনার যে নীল সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে সে, সেখান থেকে বেঁচে উঠবার তার আকুল ইচ্ছে। দুঃখের যে হিমালয় চেপে আছে তার ওপর, তা সরিয়ে মুক্তির সুবাস পেতে তার অনন্ত অভিপ্রায়।

তবে, এই বন্দিদশা থেকে মানুষের মুক্তি কীসে?

দুই.

বন্দিত্বের কথা মনে আসলে আমার মনে পড়ে যায় বনু ইসরাইলের সেই তিনজন মানুষের কথা, যারা একদিন আটকা পড়েছিলো একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে। চমৎকার সেই ঘটনাটা আমাদের প্রায় সবারই জানা। ঘুরতে বের হয়ে পথিমধ্যে রাত হয়ে গেলে তারা রাত্রি যাপনের জন্য একটা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েন। উদ্দেশ্য ছিলো রাতটা এই গুহার মধ্যে কাটিয়ে ভোর হলেই নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যাবেন। রাত তাদের কাটলো বটে, কিন্তু ভোরে উঠে তাদের সকলের তো মাথায় হাত! গুহার যে প্রবেশদ্বার দিয়ে তারা প্রবেশ করেছিলেন এখানে, সেই উন্মুক্ত দ্বার যেন কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো! দৃষ্টিসীমার মধ্যে তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

ঘটনার আকস্মিকতায় শুরুতে ঘাবড়ে গেলেও, খানিক বাদে তারা আবিষ্কার করলেন যে—পাহাড়ের ওপর থেকে কোনো কারণে বেশ বড়োসড়ো একটা পাথর ঠিক গুহাটার মুখে এসে পড়েছে। পাথরের আকৃতি এতই বিশাল ছিলো, পুরো গুহাটার মুখ তাতে বন্ধ হয়ে গেলো।

ভাবুন তো—কোনো এক দূরের জায়গা থেকে গন্তব্যে ফিরছেন আপনি। পথিমধ্যে রাত নেমে যায়। এমতাবস্থায় বনজঙ্গাল পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ আপনার জন্য। যেকোনো সময় সামনে চলে আসতে পারে বাঘ-ভাল্লুক কিংবা হিংস্র কোনো প্রাণী। বিপদ মাথায় নিয়ে ঘরে ফেরার চাইতে পাহাড়ের কোলে থাকা একটা নির্জন গুহার মধ্যে আশ্রয় নেওয়াটাই আপনার জন্য অধিক উত্তম এবং আপনি তা-ই করলেন। একটা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেন যাতে নির্বিঘ্নে রাতটা কাটানো যায়।

কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙার পরে যদি সেই গুহার প্রবেশমুখ খুঁজে না পান? যে দ্বার দিয়ে সেখানে পা রেখেছিলেন, তা যদি ভোর বেলাতে ভোজবাজির মতো হাওয়া হয়ে যায়—ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে?

ঘন বনজঙ্গাল পরিবেষ্টিত একটা পাহাড়। তার কোলে থাকা নির্জন একটা গুহা। সেই গুহায় আপনি এখন বন্দি! গুহা থেকে বেরোনোর কোনো রাস্তাই আপনার সামনে খোলা নেই। সারাদিন চিৎকার-চেঁচামেচি করলেও আপনার আওয়াজ বাইরে বেরোবে না। কেউ জানতেও পারবে না যে, এই গুহায় কোনো এক মানুষ আটকা পড়ে আছে। হিংস্র জন্তুর থাবা থেকে বাঁচতে আপনি আশ্রয় নিয়েছিলেন গুহার মধ্যে, কিন্তু সেই গুহার মধ্যেই এখন আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে ক্ষুধা আর

তৃষ্ণার যন্ত্রণা এবং সেই যন্ত্রণার শেষ পরিণতি—মৃত্যু! কেমন হবে এই দৃশ্যপট?

এমন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে আপনার যে অনুভূতি হবে, গুহার মধ্যে বন্দি হয়ে পড়া বনি ইসরাইলের সেই তিনজন মানুষের অনুভূতিও একই ছিলো—সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি! তবে বন্দি হয়ে পড়া সেই আল্লাহর বান্দাদের ঝুলিতে কিছুটা সম্বল ছিলো, যা দিয়ে তারা এই নিশ্চিত মৃত্যু-কূপ থেকে মুক্তির আশা করতে পারেন।

কী সেই সম্বল জানেন? সেই সম্বল ছিলো তাদের সৎকর্ম। কেবল আল্লাহকে খুশি করবার জন্য তারা যে কাজগুলো করেছিলো, যেগুলোর ব্যাপারে তারা ছাড়া দুনিয়ার কেউ জানে না, সেগুলোকে অসিলা করে তারা আল্লাহর কাছে সেই বন্দিদশা থেকে মুক্তি চাইলেন।

তাদের প্রথমজন গাভীর দুধ দোহন করে সবার আগে বাবা-মাকে পান করাতেন। বাবা-মা পান করার আগে পরিবারের কাউকেই দুধ পান করানো হতো না। এমনকি নিজেও খেতেন না। কোনো এক কাজে একবার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায় এবং দুধের পেয়ালা হাতে বাবা-মায়ের ঘরে ঢুকে তিনি দেখতে পেলেন—তারা দুজনেই ঘুমে বিভোর। একদিকে বাবা-মা দুধ পান না করলে পরিবারের অন্য কেউ দুধ পান করতে পারবে না, আবার অন্যদিকে ঘুমের ব্যাঘাত হবে ভেবে বাবা-মার ঘুম ভাঙিয়ে তাদের দুধ পান করানোও পছন্দ হচ্ছে না। ফলে দুধের পেয়ালা হাতে তিনি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন তাদের মাথার কিনারে। সকালবেলা বাবা-মার ঘুম ভাঙলে তারা দেখতে পান—তাদের সন্তান বিছানার কাছে দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলের এই কাজে বাবা-মা সন্তুষ্ট হলেন এবং তৃপ্তিভরে দুধ পান করলেন।

গুহায় বন্দি হয়ে পড়া সেই প্রথম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ, আমি যদি এই কাজ কেবল আপনাকে সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে করে থাকি, তাহলে আপনি আমাকে আজকের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।'

মুহূর্তেই তার দুআ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করলেন। তারা দেখতে পেলেন—গুহার মুখ থেকে পাথর খানিকটা সরে গেছে। তবে বের হওয়ার মতো অবস্থা তখনো তৈরি হয়নি।

দলের দ্বিতীয়জন একবার অনৈতিক সম্পর্কে জড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন। চাচাতো বোনের সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়াবার তার ছিলো অদম্য নেশা এবং তাকে নানাভাবে প্রলোভনও দেখাতেন তিনি, কিন্তু বরাবরই মেয়েটা তাকে এড়িয়ে যেতো। একদিন বেশ বিপাকে পড়ে মেয়েটা তার কাছে উপস্থিত হয় এবং নিরুপায় হয়ে তার কাছে কিছু অর্থকড়ি চায়। এমন সুযোগ হাতে পেয়ে তার ভেতরে এতদিনের পুষে রাখা সুপ্ত অনৈতিক ইচ্ছেটা জেগে ওঠে এবং শারীরিক সম্পর্কের বিনিময়ে মেয়েটাকে অর্থ দিতে রাজি হন তিনি। নিরুপায় মেয়েটা তাতে রাজি হয় শেষ পর্যন্ত।

কামনা চরিতার্থ করবার লক্ষ্যে যখন তিনি মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবেন, এমন সময় মেয়েটা বললো, 'আল্লাহকে ভয় করো। আমার পবিত্রতা তুমি নষ্ট করো না।'

মেয়েটার প্রতি তার ছিলো দুর্নিবার আকর্ষণ, তথাপি তার এমন আকুতি শুনে তিনি ছিটকে দূরে সরে গেলেন আর তাকেও চলে যেতে বললেন। মেয়েটাকে যে অর্থকড়ি দিয়েছিলেন অনৈতিক সম্পর্ক পাতানোর শর্তে, তা-ও ফিরিয়ে নিলেন না।

গুহার সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর কাছে করজোড়ে ফরিয়াদ করে বললেন, 'মাবুদ, সেদিন যদি কেবল আপনাকে ভয় করে আমি ওই অসৎ কাজ থেকে বিরত থেকে থাকি, তার অসিলায় আজকের বিপদ থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দুআও কবুল করলেন এবং গুহার মুখে থাকা পাথর আরো খানিকটা সরে গেলো তাতে, কিন্তু বেরোনোর জন্য তখনো তা যথেষ্ট নয়।

তাদের তৃতীয়জনের অধীনে কিছু লোক কাজ করতো। কাজ সম্পন্ন হলে সবাইকে সবার মজুরি পরিশোধ করে দেন তিনি; তবে মজুরদের মধ্যে একজন তার মজুরি না নিয়েই অন্যত্র চলে যায়।

সেই মজুরের টাকাটা তিনি একটা ব্যবসাতে বিনিয়োগ করে দেন। আস্তে আস্তে দেখা গেলো—সেই ব্যবসাতে প্রচুর লাভ ও অর্থকড়ি হতে লাগলো।

অনেক আগের সেই মজুর একদিন তার কাছে ফেরত আসে এবং তার না নিয়ে যাওয়া মজুরি দাবি করে। তখন লোকটা বললেন, 'এই যে দেখছো উট, গাভী, বকরি আর ছাগলের খামার, এ সমস্তকিছুই তোমার। তুমি সব নিয়ে যেতে পারো।'

লোকটার কথায় বেশ বিভ্রান্ত হয় সেই মজুর। সে বললো, 'একদিন আপনার এখানে কাজ করে মজুরি না নিয়ে চলে গিয়েছিলাম আমি। সেই মজুরি চাইতে এসেছি আজ। আপনার সহায়-সম্পত্তি দাবি করতে আসিনি। দয়া করে আমার সাথে উপহাস করবেন না।'

লোকটা বললেন, 'আল্লাহর বান্দা, আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না। তুমি মজুরির যে টাকা নিয়ে যাওনি, তা আমি ব্যবসাতে বিনিয়োগ করেছিলাম। এই যে উট, গাভী, বকরির খামার দেখতে পাচ্ছো, এ সবকিছুই সেই ব্যবসার লাভ থেকে করা। সুতরাং, এসবকিছুর প্রকৃত মালিক তুমি। এগুলো তুমি নিয়ে যেতে পারো।'

মজুর লোকটা সবকিছু বুঝে নিয়ে প্রস্থান করলো।

গুহার সেই তৃতীয় ব্যক্তিটা বললেন, 'মালিক, সেদিনের সেই কাজটা যদি আমি কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যই করে থাকি, তাহলে আজকের এই বিপদের ঘনঘটা থেকে আপনি আমাদের মুক্ত করুন।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর এই বান্দার আকুতিটাও কবুল করলেন এবং তারপর গুহার মুখ থেকে বিশালকায় সেই পাথর পুরোপুরিভাবে সরে যায় আর তারা বাইরে বেরিয়ে আসেন।[১]

বন্দিত্বের এমন চরম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে, শিয়রে মৃত্যুর এত সুনিশ্চিত হাতছানি থাকা সত্ত্বেও তাদের হাতে মুক্তি লাভের একটা উপায়, একটা অবলম্বন ছিলো। তারা তাদের সৎ আমলগুলোকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন, যা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করা।

তিন.

কুরআনও কয়েকটা গা ছমছমে বন্দি অবস্থার কথা আমাদের শোনায়। আমরা স্মরণ করতে পারি মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা। ফিরআউনের বিশাল বাহিনী যখন তাড়া করেছিলো মুসা আলাইহিস সালামকে, তখন অনুসারীদের নিয়ে তিনি লোহিত সাগরের দিকে চলে যান। একপর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়ালো—

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২২৭২; *সহিহ মুসলিম* : ২৭৪৩; *শুআবুল ঈমান* : ৬৭০৪; *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ১; *মুস্তাখরাজু আবি আওয়ানা* : ৫৯৯৮

সামনে কূল-কিনারাবিহীন সমুদ্র আর পশ্চাতে শত্রুর নিশ্চিত উপস্থিতি। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লে মৃত্যু সুনিশ্চিত। আর ফিরআউন বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও আছে প্রাণনাশের শঙ্কা। বনু ইসরাইল সম্প্রদায়ের সামনে এ যেন জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের মতো অবস্থা! এমন ঘনঘোর বিপদের মুখে মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারীরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে বলতে লাগলো, 'আমরা তো নিশ্চিত ধরা পড়ে গেলাম।'[১]

অনুসারীরা যতই ব্যাকুল আর বিহ্বল হোক, উপনীত বিপদে তারা যতই ঘাবড়ে যাক, নবি মুসা আলাইহিস সালাম তা নিয়ে বিন্দুমাত্রও বিচলিত নন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে তিনি যেভাবে চেনেন, আর কেউ তো সেভাবে চেনে না। মহাপরাক্রমশালী রবের ক্ষমতার ব্যাপারে তার হৃদয়ে আছে অপরিসীম ভরসা। তার অন্তর তাওয়াক্কুলে টইটম্বুর। তাই, অন্য সবাই যেখানে ভয়ে কাবু, সেখানে মুসা আলাইহিস সালাম শোনালেন ভরসার সেই অমিয় বাণী। তিনি বললেন, 'কখনোই নয়। আমার পালনকর্তা আমার সাথে আছেন। অতিসত্বর তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।'[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে ঠিক ঠিক পথ দেখালেন। সমুদ্রের বিশাল জলরাশিকে তিনি নবি মুসার জন্য পরিণত করলেন প্রশস্ত রাস্তায়, যে রাস্তা ধরে মহাসমুদ্র পার হবে তার অনুসারীরা। সেদিন মুসা আলাইহিস সালামকে পথ দেখিয়েই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা থেমে যাননি, ওই একই পথকে ফেরাউনের জন্য তিনি পরিণত করেছিলেন মৃত্যুফাঁদে।

এই যে অনুসারীদের নিয়ে এমন কঠিন বন্দিদশায় পড়েছিলেন মুসা আলাইহিস সালাম, সেই বিপদ কাটাতে কোন জিনিসটা তাকে সহায়তা করেছে জানেন? সেটা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপর তার টইটম্বুর তাওয়াক্কুল। অনুসারীরা যেখানে নিশ্চিত মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই দেখছিলো না, নবি মুসা আলাইহিস সালাম সেখানে দেখছিলেন বেঁচে ওঠার আলোকরশ্মি! কেউ যেখানে মর্মান্তিক পরাজয় ব্যতীত কোনো পথ দেখছে না, সেখানে মুসা আলাইহিস সালাম দেখছিলেন বিজয়ের রক্তিম সূর্যোদয়! তিনি জানেন, পথ তৈরির মালিককে ডাকতে

---

[১] সুরা শুআরা, আয়াত : ৬১

[২] সুরা শুআরা, আয়াত : ৬২

জানলে, তাঁর ওপরে ভরসা করতে জানলে পথ তৈরি হতে সময় লাগবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপরে যারা ভরসা করে, তাদেরকে তিনি অবিশ্বাস্যভাবে পথ প্রদর্শন করেন।

হিজরতের দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে যাত্রা করলে মক্কার মুশরিকরা সেদিন তাদের পিছু নিয়েছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো যেকোনো প্রকারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বন্দি করে হত্যা করা। নবিজিকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে তারা শুরুতে হামলা করেছিলো তার ঘরে। সেখানে নবিজিকে না পেয়ে, হত্যার নেশায় উন্মত্ত আর পাগলপারা হয়ে তারা পিছু নেয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর।

পেছনে শত্রুবাহিনী আর সম্মুখে যেন এক অনন্ত মরুভূমি! বিপদের এমন ঘনঘোর সময়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ নিয়ে তারা আশ্রয় নিলেন একটা গুহার মধ্যে।

কিন্তু, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ গুহার মুখে টের পাওয়া গেলো শত্রুর উপস্থিতি! শত্রু যদি ভুল করে একবার নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তাহলে গুহার ভেতরে থাকা আবু বকর এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধরা পড়ার সম্ভাবনা শতভাগ। বন্দিত্বের এমন করুণ মুহূর্তে ঘাবড়ে গেলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। কী হবে যদি ধরা পড়তে হয়? নিজের চাইতেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তা নিয়েই তিনি সবিশেষ আতঙ্কিত! তাকে যে নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন তিনি!

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এমন বিচলিত অবস্থা, বিমর্ষ চেহারা দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন অভয়বাণী হিশেবে যে কথাটা বলেছিলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটাকে কুরআনে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

'চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'[১]

নাকের ডগায় শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়ে দুজনের একজন ঘাবড়ে যাচ্ছেন আর অন্যজন নির্ভার-চিত্তে বলছেন, 'চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন!'

---

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ৪০

এই যে অন্তরের গভীরে প্রোথিত থাকা এই নির্ভরতা, এই নির্ভরতার নাম তাওয়াক্কুল। এই তাওয়াক্কুলের কারণেই সেদিনকার সেই বন্দিদশা থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আমরা আরো স্মরণ করতে পারি নবি ইউনুস আলাইহিস সালামকে। গভীর সমুদ্রতলে মাছের পেটে আটকে পড়তে হয় তাকে। জগতে এরচেয়ে করুণ, ভয়ংকর, বিভীষিকাময় বন্দিদশা আর কার হয়েছে! একে তো সমুদ্রের অতল অন্ধকার, তারওপর মাছের পেটের ভেতরের সংকীর্ণতা এবং সেখানেও অন্ধকারের আরেক স্তর—সে কী এক মহাবিপদই না ছিলো আল্লাহর নবি ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্য!

কিন্তু এমন ঘোরতর বিপদের মুখে পড়লে যেখানে দুনিয়ার কঠিনপ্রাণ মানুষও বিহ্বল হয়ে যাবে, সেখানে আল্লাহর নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহর স্মরণে মত্ত হয়ে গেলেন। যেন মাছের পেট থেকে উদ্ধার হওয়া নয়, নিজের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে লজ্জিত, অনুতপ্ত হওয়াটাই তার ধ্যান-জ্ঞান। সেই শোচনীয় অবস্থার মধ্য থেকে তিনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে ফরিয়াদ করলেন—

'আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আপনি মহা-পবিত্র, আর নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিম।'[১]

গভীর সমুদ্রতলে এক মহাবিপদের মাঝে নিপতিত হয়েও নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম যা ভুলে যাননি, সেটা হলো—তাকওয়া। ওই মহাবিপদ থেকে বাঁচবার কী পথ, তা নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। প্রাণবায়ু আর কতক্ষণ তার শরীরে অবশিষ্ট থাকবে—তা নিয়েও তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তার সমস্ত চিন্তা কেবল আল্লাহকে ঘিরে—যে পদস্খলন তার থেকে হয়েছে, তা কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করবেন? নিজের কৃতকর্মের জন্য একটা অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে তিনি তাই আল্লাহর কাছে ফরিয়াদে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার সেই ব্যস্ততার কাছে মাছের পেটের সংকীর্ণতা, সমুদ্রতলের গভীর অন্ধকার আর বাঁচবার তীব্র আকুলতা—কোনোকিছুই মুখ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

---

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৭

কিন্তু ইউনুস আলাইহিস সালামের শেষ পরিণতি সম্পর্কে আমরা জানি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যে দুআ তিনি করেছিলেন, তা তো কবুল হলো-ই, সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইউনুস আলাইহিস সালামকে বাঁচিয়ে নিলেন সেই মহা সংকট থেকে। মাছের পেটের দুর্ভেদ্য সংকীর্ণতা, সমুদ্রতলের অন্ধকার—সবকিছুকে ডিঙিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসলেন। ইউনুস আলাইহিস সালামের অন্তরে তাকওয়ার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো, অনুতপ্ত অন্তরের যে স্বাক্ষর তিনি বিপদের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখিয়েছিলেন, তা ছিলো অনন্য-অসাধারণ!

সে এক সু-কঠিন বন্দিদশা থেকে ইউনুস আলাইহিস সালাম মুক্তি পেলেন আর তার সেই মুক্তির পেছনে নিয়ামক হিশেবে যা কাজ করেছে, তা হলো—তাকওয়া।

চার.

হয়তো গুহা-মুখের পাথর এসে দাঁড়ায় না আমাদের যাপিত জীবনের পথে। হয়তো মুসা আলাইহিস সালামের জীবনের মতো সমুদ্র আর শত্রু বাহিনীর দ্বৈত দ্যোতনার বিপদ নেমে আসে না আমাদের সম্মুখে। মক্কার মুশরিকদের মতো ধাওয়া করবার মতো শত্রু হয়তো উপস্থিত নেই আমাদের জীবনে। সমুদ্রের অতল অন্ধকার আর মাছের পেটের সংকীর্ণতাও হতে পারে আক্ষরিক অর্থে আমাদের জীবনে বিপদ হয়ে আসে না, কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের জীবনেও বন্দিত্ব আসে। কখনো কখনো আমাদের জীবন আটকে যায় তীব্র সংকীর্ণতায়। আমাদের দুআ কবুল হয় না, সুখ হারিয়ে যায় আমাদের জীবন থেকে, কাজকর্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, পড়াশোনা কিংবা সাংসারিক জীবনে—কোথাও আমরা পাই না এতটুকু বারাকাহ। দুনিয়াটাকে তখন খুবই সংকীর্ণ মনে হয়। মনে হয়, পৃথিবী তার সকল ভারত্ব নিয়ে ভেঙে পড়বে আমাদের মাথার ওপরে। হতাশা, অশান্তি আর অপূর্ণতা তখন আমাদের কুরে কুরে খায়। আমরা চিন্তার বন্দিত্বে ভুগি আর ভুগি স্বাধীনতার সংকীর্ণতায়। তখন ইচ্ছে করে—ইশ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি আমার অমুক দুআটা কবুল করতেন! যদি তিনি আমাকে উদ্ধার করতেন অমুক বিপদ থেকে! যদি কেটে যেতো আমার বন্দিত্বটা! যদি খুলে যেতো আমার মুক্তির পথ!

জীবনের এমন বন্দি শিবিরে শিকলবন্দি হয়ে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অপার অনুগ্রহ লাভের আশায় অস্থির হয়ে ওঠে আমাদের মন, যখন সকল

প্রতিকূলতা, বিপদ আর বন্দিত্ব থেকে মুক্তির জন্য আশায় কাতর হয় আমাদের হৃদয়, তখন গুহায় আটকে যাওয়া আমাদের সেই পূর্বসূরিদের মতো করে, নিজেদের আমলনামাতে আমরা একটু চোখ বুলাতে পারি। যদি তাতে পাওয়া যায় কোনো গোপন আমল, যার সাক্ষী কেবল আমি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, যদি তা আমি লোকের প্রশংসা লাভের আশায় না করে থাকি, যদি তাতে না থাকে মানুষের বাহবা লাভের কোনো আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনই যদি তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে—তাহলে গভীর অন্ধকার রাতে, জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে বলতে পারি—'মালিক, আমার সেদিনকার সেই কাজটা আমি একান্তই আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করেছিলাম। মানুষের চোখে বড় আর মহান হতে, তাদের বাহবা কুড়াতে আমি সেই কাজটা করিনি। মাবুদ, অন্তরের খবর আপনার চাইতে ভালো আর কে জানে! আপনি আমার অন্তরের সেদিনকার অবস্থাও জানতেন, আর আজকের অবস্থাও জানেন। আজ যে বিপদ, যে দুর্যোগ আর দুর্ভোগে আমি নিপতিত, জীবনের যে সংকীর্ণতা আজ আমার শ্বাসরোধের দ্বারপ্রান্তে, সেদিনকার সেই কাজটার অসিলায় আপনি আমার জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতা, সমস্ত বিপদ আর দুর্যোগ দূর করে দিন। নিশ্চয় বান্দার ডাকে আপনি সাড়া দেন আর বান্দার বিপদে আপনার আশ্রয়ের চাইতে উত্তম আশ্রয়স্থল আর কোথায় আছে?'

দুর্যোগ জীবনের এক অনিবার্য বাস্তবতা। সেই বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার আগে আমরা মেরামত করতে পারি আমাদের তাওয়াক্কুল আর তাকওয়ার স্তরকে। যদি তাতে মরচে ধরে থাকে, যদি তা হয়ে থাকে ভীষণ দুর্বল আর নড়বড়ে, যত্ন নিয়ে সেটাকে আমরা সেই স্তরে উন্নীত করতে পারি, যে স্তরে গেলে গভীর সংকটেও পথিক পথ হারায় না। তাওয়াক্কুল বুকে থাকলে সম্মুখের পথহীন অবস্থাতেও পথ তৈরি হয়ে যায়, যেভাবে দরিয়া ফুঁড়ে পথ তৈরি হয়েছিলো মুসা আলাইহিস সালামের জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আকাশ-সমান ভরসার প্রাচুর্য বুকে ছিলো বলেই হিজরতের দিন নিশ্চিত মৃত্যুর সামনেও নির্ভার থাকতে পেরেছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর অন্তরে তাকওয়ার অথৈ জোয়ার ছিলো বলেই মাছের পেটের সংকীর্ণতার মাঝেও বাঁচবার কথা ভুলে আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচতে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পেরেছিলেন নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম। তাকওয়া তার জন্য সেই বিপদ থেকে, সেই সংকীর্ণতা থেকে, সেই অতল অন্ধকার থেকে মুক্তির মাধ্যমে পরিণত হয়ে গেলো।

জীবনের বন্দিশিবির থেকে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে চলুন আমরা আমাদের আমল, আমাদের তাওয়াক্কুল আর তাকওয়ার যত্ন নিই। আমলনামায় যোগ করি এমন গোপন আমল, যা বিপদের দিনে আমাদের জন্য বর্ম হয়ে দাঁড়াবে। অন্তরে চাষ করি তাওয়াক্কুল আর তাকওয়ার বীজ, যা মহীরুহ হয়ে একদিন রুখে দেবে জীবনের প্রতিকূলতা, বিপদের তপ্ত-কঠিন সময়ে, যা আমাদের ছায়া দেবে আর দেবে নিরাপত্তা।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

এক.

আমার এক বন্ধু দ্বীন পালন শুরু করবার পর থেকে প্রচুর নিগ্রহের শিকার হতো—স্বয়ং তার পরিবার থেকে। টিপিক্যাল বাঙালি মুসলিম পরিবারগুলো যেরকম হয় সাধারণত—হয়তো তারা আদৌ দ্বীন পালন করে না, নতুবা দ্বীন পালন বাদ দিয়ে দ্বীনে নব-উদ্ভাবিত বিদআতে বুঁদ হয়ে থাকাই তাদের নিত্যকার রুটিন হয়ে দাঁড়ায়। তারা শুক্রবার ছাড়া মসজিদের আশপাশে ঘেঁষবে না, শবে-বরাতে খাবার-দাবারের ধুম আয়োজনে মত্ত থাকবে ইত্যাদি; কিন্তু পরিবারের ভেতর থেকে দ্বীনটাকে সঠিকভাবে বুঝে এবং উপলব্ধি করে কেউ যদি তা পালন করতে যায়, তখন বাকি সদস্যরা রীতিমতো ক্যাওয়াজ লাগিয়ে দেন। তারা তখন মনে করেন, বাপ-দাদাদের পালিত ধর্মে এ আবার নতুন কী সংযোজন? এভাবে তো কোনোদিন কাউকে ধর্ম পালন করতে দেখিনি!

কিন্তু তাদের আসলে কে বোঝাবে যে, বাপ আর দাদারা কখনোই দ্বীনের জন্য দলিল হতে পারে না। বাপ-দাদারা যে সর্বদাই সঠিক হবে, তাদের আনীত, পালিত রেওয়াজ যে সবসময় প্রশ্নাতীত থাকবে—এমন নিশ্চয়তা কোথাও দেওয়া নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব দলিল হননি, তার জন্য দলিল হয়েছে কুরআন এবং আল্লাহর বাতলে দেওয়া পদ্ধতি।

আমার বন্ধুটাকে ঘর থেকে প্রায়-ই বলা হতো, ‘নামাজ-কালাম শুধু আমাদের

ছেলেটাই পড়ছে, দুনিয়ার আর কেউ তো পড়ছে না!' 'ধর্ম শুধু আমাদেরটাই বুঝতেছে, দুনিয়ার আর কেউ তো ধর্ম বোঝে না!'

কটাক্ষ আর কটু মন্তব্যের এমন ঘাত-অভিঘাতে জর্জরিত হয়ে আমার বন্ধুটা আমাকে মাঝেমধ্যেই বলত, 'আর পারছি না রে!'

একটা মানুষের বিপরীতে দুনিয়া দাঁড়িয়ে যাওয়াটাও মেনে নেওয়া সহজ, কিন্তু ঘরের আপন মানুষগুলো যখন ভুল বুঝে দূরে ঠেলে দেয়, যখন বাবা-মা আর ভাই-বোনেরা ঘৃণার ঝুড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল সঠিকভাবে দ্বীনটাকে পালন করছে বলে, তখন সেই কষ্টটা আসলে সহ্যের বাইরে চলে যায়।

আমার বন্ধুই কেবল নয়, চারপাশের এমন আরো অনেক মানুষকেই আমি চিনি, যারা নিজ ঘরে নিগ্রহের স্বীকার হয় বা হচ্ছে কেবল ভুলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সঠিক দ্বীনটাকে আঁকড়ে ধরার জন্য। অনেকে আমার কাছে পরামর্শ চায়, কীভাবে তাদের বাবা-মাকে সঠিক দ্বীনটা বোঝানো যায়, কীভাবে পরিবারের মানুষগুলোকে হিদায়াতের রাস্তায় আনা যায়। পরিবারের সদস্যদের কথা আর আচরণের দ্বারা যে নিঃসীম কষ্টের ভেতর দিয়ে তারা দিন যাপন করে, তা আমি অনুধাবন করতে পারি। সেই কষ্টের গভীরে বসবাস করেও আপন আপন লোকগুলোর হিদায়াতের জন্য তাদের আহাজারি সত্যই একটা সুন্দর হৃদয়ের স্বাক্ষর বহন করে।

দুই.

সত্যের সাথে অবহেলার, শুদ্ধতার সাথে অবজ্ঞার সম্পর্কটা চিরন্তন। আপনি মানুষকে ভুলের গহ্বর থেকে উদ্ধারের কাজে নামবেন, কিন্তু পাড়ি দেবেন না একটা কণ্টকাকীর্ণ পথ—তা হবে না।

যেদিন, যে উষালগ্নে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হলো, সেই সু-সংবাদ আবু লাহাবের কাছে বয়ে নিয়ে এসেছিলো তারই এক ক্রীতদাসী। বলাই বাহুল্য—আবু লাহাব ছিলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচা। মৃতভাই আবদুল্লাহর ঘরে এক পুত্র সন্তানের জন্মের সংবাদে আবু লাহাব এতটাই প্রফুল্ল আর আনন্দিত হয় যে, যে দাসী নবিজির জন্মের সংবাদ বয়ে এনেছিলো তার কাছে, তাকে সাথে সাথেই মুক্ত করে দেয় সে। যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে এতটা ভালোবাসা দিয়ে বরণ করেছিলো আবু লাহাব, একদিন নিজেই পরিণত হলো সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের

সবচেয়ে বড় শত্রুতে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যের যে পয়গাম ধরায় এনেছিলেন, তাকে স্বাগত জানাতে অপারগ ছিলো আবু লাহাব, কারণ বাপ-দাদাদের পালিত দ্বীনকে তারা জ্ঞান করতো পবিত্র বিধান হিশেবে। সেই ভুলে ভরা দ্বীনকে তারা এতটাই পূত আর পবিত্র মনে করতো যে—তার বিপরীত যেকোনো কিছুকেই তারা তাদের ধর্মের জন্য হুমকি মনে করতো।

আপনি যখন সত্যের পথে হাঁটতে শুরু করবেন, তখন মিথ্যেরা দলবেঁধে আপনাকে আক্রমণ করতে আসবে। আপনি যে আসলে কতখানি কূপমণ্ডূক, আপনার জ্ঞান যে কতটা বিকৃত আর আপনি কী পরিমাণ বিভ্রান্ত—সেসব তখন আপনার চারপাশে নিয়ম করে বাজতে থাকবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবি, গণক, জাদুকর, পাগল, বদ্ধ উন্মাদ-সহ কত যে অপবাদ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!

আপনার থাকতে হবে ত্যাগ স্বীকার করার অপরিসীম ধৈর্য। বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা চিন্তা করুন। ইসলামের সুমহান বার্তা পাওয়ার পর যখন ঈমান আনয়ন করলেন তিনি, তখন তার মনিব মাথার ওপর গনগনে সূর্যের তাপে মরুভূমির তপ্ত বালুতে তাকে শুইয়ে রাখতো এবং বুকের ওপর তুলে দিতো বিশালকায় পাথর। সূর্যের তাপ আর বুকের ওপর চেপে বসা জগদ্দল পাথরের চাপের কাছেও নতি স্বীকার করতে রাজি হননি ইসলামের প্রথম মুআজ্জিন বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু। সে কী সীমাহীন যন্ত্রণা! কী ভারি দুঃখের ছিলো সেই দিনগুলো! কিন্তু বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের কাছে বারেবারে পরাস্ত হয় নিষ্ঠুর-নির্দয় মনিব। আঘাত যত তীব্র হয়, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর কণ্ঠ থেকে ততটাই ভালোবাসা-মিশ্রিত সুরে ভেসে আসে 'আহাদ আহাদ' শব্দ! ঈমানের সে এক অনুপম, অনন্য দৃষ্টান্ত!

শারীরিক নির্যাতন ছাড়াও আপনাকে সম্পদ আর প্রতিপত্তিও ত্যাগ করতে হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে সাহাবি আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছিলো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা-বাণিজ্য। মক্কায় তিনি পরিচিত ছিলেন একজন অসাধারণ সফল ব্যবসায়ী হিশেবে, কিন্তু ঈমান আনয়নের পর যখন মক্কাবাসী তাদের ওপর খড়গহস্ত হলো, আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্য অনেক সাহাবির মতো, নিজের ব্যবসা, বসত-ভিটা, সম্পত্তি সবকিছু ছেড়েছুড়ে আবিসিনিয়ায় চলে গেলেন।

কেবল ঈমানের জন্য, ইসলামের জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য আপনি ফেলে চলে যাচ্ছেন আপনার সফল ব্যবসা, ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পত্তি—দৃশ্যটা একবার ভাবুন তো!

ঈমানের পথে হাঁটবেন, সত্য আর ন্যায়ের পথে চলবেন, সঠিক দ্বীন চর্চা করবেন, কিন্তু শত্রু পাবেন না—এমনটা অসম্ভব। আপনাকে হয়তো আপনার পরিবার তিরস্কার করে, আপনার বাবা-মা অবজ্ঞা করে আর পাড়া-প্রতিবেশি কটু কথা শোনায়, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবিদের জন্য বিরূপ হয়ে উঠেছিলো গোটা দুনিয়াটাই। তাদের ত্যাগের সাথে আপনার-আমার ত্যাগ তো তুলনাতেই আসতে পারে না।

সুতরাং, দ্বীনের পথে আপনাকে চর্চা করতে হবে ধৈর্য আর সীমাহীন সংযমের।

আপনি যখন দাড়ি রেখে দেবেন, তখন আপন লোকেরাই আপনাকে বলবে, 'এই বয়সে দাড়ি কেন রাখতে হবে তোমায়?' 'তোমার বাপের মুখে তো দাড়ি নেই, তোমার মুখে দেখছি একহাত লম্বা দাড়ি।' 'দাড়ি রাখার কি বয়স চলে গেছে?'

গোপনে গোপনে তারা আরো বলবে, 'ছেলেটা কি বখেই গেলো, নাকি? কাদের খপ্পরে পড়েছে কে জানে!'

এতদিন বেপর্দায় চলতেন, ধামাকা জীবনযাপন করতেন, কিন্তু হঠাৎ করে যখন আপনি বোরকা-হিজাব পরা শুরু করবেন, যখন আপনি নন-মাহরাম কোনো পুরুষের সামনে আসতে চাইবেন না, কথা বলতে চাইবেন না, আপনার আপন মানুষেরা, হতে পারে আপনার বাবা-মা, ভাই-বোন কিংবা আত্মীয়স্বজন, আপনাকে বলবে, 'এই বয়সে এত ঢেকে-ঢুকে চলতে হবে কেন? বিয়ের আগে একটু খোলামেলা চলা উচিত।'

'এভাবে চোখ-মুখ ঢেকে রাখলে বিয়ে হবে? পুরুষ মানুষের চোখে না পড়লে বিয়ের প্রস্তাব কোত্থেকে আসবে?'

যখন আপনি তাদের সামনে দ্বীনের সঠিক বিষয়টা তুলে ধরে ভুলটা শুধরাতে যাবেন, তারা তেড়েফুড়ে আপনাকে বলবে, 'মাতব্বরি বাদ দাও। আমরা কি তোমার চাইতে কম বুঝি? দুই-চারটা বই পড়ে ওস্তাদ হয়ে গেছো? আমাদের বাপ-দাদারা সবাই ভুল আর দুনিয়ায় তুমি একাই কেবল সঠিক?'

আপনি বুঝতে পারবেন—আপনার জন্য দুনিয়াটা তখন সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। আপনজনেরা মুখ ফিরিয়ে নেবে, আত্মীয়স্বজনেরা দূরে চলে যাবে, বন্ধুরা এড়িয়ে চলবে। হেনস্থা, অবজ্ঞা আর অবহেলার জাতাকলে পিষ্ট হয়ে আপনার মন বিষিয়ে উঠবে ভীষণভাবে।

এমন অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

একটাই উপায়—আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়ানো। আপনি যখন দেখবেন দুনিয়াশুদ্ধ লোক আপনার বিপরীতে, কিন্তু হৃদয়গহীনে যদি আপনার সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়ে থাকে, চারপাশের কটুকথা, অবজ্ঞা-অবহেলা, তিরস্কার-লাঞ্ছনা—কোনোকিছুই তখন আপনাকে আর আশাহত করতে পারবে না। আপনাকে দগ্ধ করতে পারবে না হতাশার অনলে। মানুষের চোখে নীচু হয়েও আপনি তখন গর্ব অনুভব করবেন এটা ভেবে যে—আল্লাহর পথে আছেন বলেই আপনার জন্য তারা বরাদ্দ করেছে এত ঘৃণা, চাষ করেছে এত বিদ্বেষ। মানুষের এতসব ঘৃণা-বিদ্বেষের বিপরীতে উপহারস্বরূপ যদি আখিরাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে জান্নাত দান করেন, ভাবুন তো কী এক মহাসাফল্য লাভ করবেন আপনি!

তিন.

সাধারণত একটা পর্যায়ে গিয়ে পরিবারের লোকেরা আপনার কথাকে গ্রাহ্য করতে চাইবে না। আপনি যতই তাদেরকে সঠিক পথে, সঠিক দ্বীনে আহ্বান করুন না কেন, তারা আপনাকে গুরুত্ব দিতে চাইবে না, যদি না পরিবারে আপনি ভালো রকমের অবদান রাখতে পারেন।

পরিবারে অবদান রাখা বলতে আর্থিকভাবে পরিবারে আপনি কেমন ভূমিকা রাখছেন সেটাকেই বোঝানো হয়েছে মূলত।

ধরা যাক আপনি একজন ফুল-টাইম বেকার। আপনাকে চলতে হচ্ছে বাবা কিংবা ভাইয়ের কাঁধে ভর করে। এমতাবস্থায় পরিবারে আপনার মন্তব্য কম গুরুত্ব বহন করবে। যেহেতু আপনি টাকা-পয়সা রোজগার করেন না, অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে চলতে হয় আপনাকে, তাই আপনি যতই ভালো কথা, জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সঠিক বার্তাই তাদের কাছে তুলে ধরুন না কেন—তাদের কাছে আপনার যাবতীয় জ্ঞান,

যাবতীয় শুভাকাঙ্ক্ষার চাইতেও বড় হয়ে থাকবে আপনার বেকারত্ব। তাদেরকে যদি আপনি গিবত থেকে বাঁচতে বলেন, সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করেন, মিথ্যা বলা ছাড়তে বলেন, নিয়মিত সালাত আদায়ের তাগিদ দেন, মহিলাদের পরিপূর্ণ পর্দা মেনে চলতে বলেন, আপনি দেখতে পাবেন—এই সবকিছুকে তারা কেমন হালকাভাবে নিচ্ছে। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেওয়া যাকে বলে।

কিন্তু অবদান রাখার দিক থেকে আপনি যদি পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কেউ হয়ে উঠতে পারেন, অর্থাৎ যদি আর্থিকভাবে পরিবারে আপনার অবদান দৃশ্যত মুখ্য আর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, আপনি অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করবেন যে—ওপরের দৃশ্যটা কীরকম ভোজবাজির মতো পাল্টে গেছে! তখন আপনার যাবতীয় ভালো কথা, ভালো উপদেশ, ভালো পরামর্শের আলাদা একটা মর্যাদা থাকবে। বাড়ির বড়রাও আপনার কথাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখবে আর ছোটোরা তো আপনার বেঁধে দেওয়া রুটিনের বাইরে চলতেই পারবে না।

এটা আসলে মানুষের মনস্তত্ত্ব। মানুষ ক্ষমতাকে পছন্দ করে। যার হাতে ক্ষমতা থাকে, মানুষ তার কথা শুনতে আর মানতে চায়। সামর্থ্যবান মানুষের সান্নিধ্য মানুষ উপভোগ করে। যদিও এই ধারণার সাথে ইসলামের তেমন একটা সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমি মনে করি, পারিবারিক আর সামাজিকভাবে দ্বীনের কাজ করার জন্য যেহেতু এটা ভালো একটা নিয়ামক হিশেবে কাজ করে, তাই আমাদের উচিত নিজ নিজ আর্থিক সামর্থ্য বাড়ানোর ব্যাপারেও মনোযোগী হওয়া।

আমি খেয়াল করে দেখেছি, আমার বেকারাবস্থায় পরিবারে আমার কথার গুরুত্ব ছিলো একরকম, আমার আর্থিক স্বচ্ছলতায় পরিবারে আমার গুরুত্ব হয়ে ওঠে অন্যরকম। আগে যেখানে কেউ আমার কথাকে তেমন গ্রাহ্য করতে চাইতো না, স্বাবলম্বী হওয়ার পরে এই মানুষগুলোই আমার কথাকে মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং ভুল-শুদ্ধ বাতলে দিলে তা পালনে তৎপর থাকে। অন্তত আর যা-ই হোক—ভুলটাকে ভুল হিশেবে মেনে নিতে আগের মতো কার্পণ্য কেউ আর করে না।

ঠিক একই ব্যাপার এলাকাতেও। আগে যেখানে সবাই নিতান্তই বেকার বলে অবহেলা করতে চাইতো, এখন তারাই অনেকটা সমীহ করে। দেখা হলেই ভালো-মন্দ জিগ্যেশ করে, হাসি মুখে কথা বলে, দু-চার কথা বলতে চাইলে বিমুগ্ধ শ্রোতার মতো সেসব শুনতে চায়।

সবকিছুর মূলে নিয়ামক একটাই—আর্থিক স্বচ্ছলতা।

তাই, আমরা যারা আমাদের পরিবার ও সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি, চিন্তা-ভাবনা করি, আমাদের উচিত নিজ নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়ানো। হালাল উপার্জন দিয়ে যখন আমরা আর্থিকভাবে নিজেদের একটা অবস্থান তৈরি করতে পারবো পরিবার আর সমাজে, তখন দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে যে অবজ্ঞা-অবহেলা-তিরস্কারের মুখোমুখি হতে হয় আমাদের, তা বহুলাংশেই হ্রাস পাবে, ইনশা আল্লাহ। আর হালাল উপার্জনের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তোলাটা অতি-অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামও সমানভাবে এটাকে গুরুত্ব দেয়। মনে রাখতে হবে—হালাল উপার্জন আমাদের ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। আমরা যত ইবাদত-বন্দেগিই করি না কেন, আমাদের উপার্জনের উৎসটা যদি অসৎ পন্থায় হয়ে থাকে, আমরা যে খাবার খাই, তা যদি অসৎ উপায়ে কেনা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের সকল ইবাদত, সকল দ্বীনি প্রচেষ্টাই বৃথা। আল্লাহর কাছে তার কানাকড়িরও মূল্য নেই।

আর্থিকভাবে নিজেদের অবস্থান তৈরির জন্য আমাদের তাহলে কী করা উচিত?

আমাদেরকে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে। তার পাশাপাশি আমাদেরকে দক্ষতা অর্জনের পন্থাগুলোতেও রাখতে হবে সতর্ক দৃষ্টি। চাকরির বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে আধুনিক বিশ্বে টেকনোলজি-নির্ভর জ্ঞানের অপরিসীম কদর। টেক দুনিয়ায় যারাই এগিয়ে, দিন দিন দুনিয়াকে তারাই পুরে নিচ্ছে হাতের মুঠোয়। আমরা যদি ফেইসবুক, গুগল, ইউটিউব আর টুইটারের দিকে তাকাই, এই কথার সত্যতা আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গেলো মার্কিন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উলটাপালটা বক্তব্যের কারণে ফেইসবুক আর টুইটার একযোগে ট্রাম্পের সোশ্যাল অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করে দেয়। দিনকয়েক আগেও যে ছিলো পৃথিবীর সেরা পরাশক্তির সর্বাধিনায়ক, তার সাথে এরকম খবরদারি করার জন্য কতখানি সাহস আর নেপথ্যে কতখানি শক্তিমত্তার দরকার ভাবুন তো!

টেকনোলোজির জ্ঞান আর দক্ষতা আপনাকে কেবল আর্থিক সক্ষমতার রাস্তাই দেখাবে না, একইসাথে মুসলিমদের উন্নয়নে আপনি রাখতে পারবেন প্রভূত অবদান। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, যোগ্যতা-দক্ষতায় আমাদের যত উন্নতি হবে, পশ্চিমা বিশ্বসহ ইসলামের শত্রুদের চোখ রাঙানি আর খবরদারির মাত্রাও ততই কমে আসবে। আগেই বলেছি—মানুষ আসলে ক্ষমতার পূজারি। যার হাতে ক্ষমতা থাকে, মানুষ তাকেই সমীহ করে।

তার মানে, আমাদের সবাইকে যে দলবেঁধে টেক দুনিয়ার পেছনে ছুটতে হবে তা নয়। ব্যক্তিগত পছন্দ আর রুচিশীলতার ওপর নির্ভর করছে আমরা কে কোন দিকে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলবো। আমাদেরকে শিল্প-সাহিত্য, ব্যবসা, উদ্যোক্তাসহ নানান কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকতে হবে। যারা ভালো লিখতে পারে, তারা লেখালেখি সম্পর্কিত পড়াশোনা করবে; যাদের শখ নির্মাতা হওয়ার, তারা ভিডিও মেইকিং, ভিজ্যুয়ালাইজেশানের ওপরে প্রশিক্ষণ নেবে। লক্ষ্য হবে হালাল কন্টেন্টগুলোকে চমৎকারভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা। ডিজিটালাইজেশানের দুনিয়ায় সবাইকে প্রযুক্তিমুখী হতেই হবে। আজ নয়তো কাল। দক্ষ মানুষদের জন্য কাজের ক্ষেত্র দুনিয়াতে অভাব নেই। এসবের বাইরে আমাদের প্রাণ-বৈচিত্র আর কৃষি নিয়েও ভাবতে হবে। যাদের প্রচুর পরিমাণ আবাদি জমি-জমা আছে, তারা সেগুলোতে মৌসুমি ফসল, ফলমূল চাষ করতে পারে। রপ্তানি করা যায় এমন নানান ফল এবং খাদ্য দেশে অনেকেই উৎপাদন করছে। কৃষি আমাদের জন্য এক বিরাট সম্ভাবনা! 'পড়াশোনা করে চাকরিই করতে হবে'—এমন মানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। পেশাকে বরণ করে নিতে আমাদের মাঝে কোনো কার্পণ্য থাকা চলবে না, তা যদি পার্কে পার্কে ঝালমুড়ি বেচতে হয়, তবু।

তবে স্মরণে রাখতে হবে—দুনিয়ার পেছনে ছুটতে গিয়ে আমরা যেন আমাদের আখিরাত নষ্ট না করি। তাহলে আমরা দুনিয়া আর আখিরাত—দুটোকেই হারাবো।

দুনিয়ার পেছনে আমাদের ছুটবার মাত্রা কীরকম হওয়া উচিত তার একটা চমৎকার দিকনির্দেশনা আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন থেকে পাই। আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মক্কার সফলতম একজন ব্যবসায়ী। আমরা যেমন এখন 'বিজনেস ম্যাগনেট' বলতে জেফ বেজোস, ইলন মাস্কসহ নানান ব্যক্তিকে চিনি, নবিজির সময়ে তখন আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেভাবে চিনতো সবাই।

ইসলাম গ্রহণের পর বাধ্য হয়ে অন্য সাহাবিদের সাথে তাকেও নিজের সকল সহায়-সম্পদ, সকল ব্যবসাপাতি ছেড়ে মদিনায় হিজরত করতে হয়। মক্কায় যিনি ছিলেন একজন সেরা ব্যবসায়ী, তাকে মদিনার মাটিতে পা রাখতে হলো একান্ত নিঃস্ব অবস্থায়! অবশ্য, অবস্থাটাকে তারা খুশি মনে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

মদিনার আনসার সাহাবিরা যখন মুহাজির সাহাবিদের সাথে নিজেদের সহায় সম্পদ ভাগাভাগি করে নিচ্ছিলেন, তখন একজন আনসার সাহাবি এসে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার সম্পদের একাংশ দিতে চাইলেন যাতে মদিনায় জীবিকা নির্বাহে খুব বেশি অসুবিধে না হয়। তখন আনসার সাহাবিকে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ বলেছিলেন, 'আল্লাহ তোমার পরিবারে আর সম্পদে অঢেল বারাকাহ দিন, কিন্তু তোমার সম্পদের আমার কোনো দরকার নেই। তারচে বরং তুমি আমাকে বাজারটা দেখিয়ে দাও।'

হিজরতের সময়ে যে যৎসামান্য টাকা সাথে এনেছিলেন, তাকে সম্বল করেই আব্দুর রহমান ইবনু আউফ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চাইলেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে কীভাবে নিজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করা যায়—সে ব্যাপারে তার চাইতে ভালো আর কে জানে! তাই তিনি আনসারি সাহাবির দয়ার আশ্রয়ে না থেকে, নিজের একটা কিছু দাঁড় করানোর জন্য বাজারের সন্ধান চাইলেন।

তার কিছুদিন পরেই একদিন খুশিমনে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। তার শরীরে তখন দামী সুগন্ধির গন্ধ। নবিজি বললেন, 'কি হে আব্দুর রহমান, কী ব্যাপার?'

তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি বিবাহ করেছি?'

বিস্মিত হয়ে নবিজি বললেন, 'মাশাআল্লাহ! মোহরানা কী দিয়েছো?'

'স্বর্ণ। একটা খেঁজুর আঁটির সমান।'

'বাহ, তাহলে এখন তো খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করা লাগে। যাও, একটা বকরি দিয়ে হলেও ওয়ালিমার ব্যবস্থা করো।'[১]

চিন্তা করুন, সবকিছু ছেড়েছুড়ে আসায় আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে ছিলো মদিনায় বিনা পরিশ্রমে সম্পত্তি লাভের সুযোগ। সে সুযোগ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৈরি করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এমন সুযোগ গ্রহণ করলেন না। যোগ্যতা দিয়ে তিনি অর্জন করতে চেয়েছেন নিজের অবস্থান।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২০৪৮, ৩৭৮০; *জামিউল মাসানিদ*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২০৬; *রাহমাতুল্লিল আলামিন* : ২৬২; *আর রাহিকুল মাখতুম* : ১৬৮

দক্ষতার জায়গাটা তো তার চেনাই আছে। পথ খুঁজে পেলে লেগে পড়তে পারেন।

বিনা পরিশ্রমে সম্পদ লাভের চাইতে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ চেনা পথটার সন্ধানে নেমে গেলেন বরং। অর্পিত সম্পদের প্রস্তাবকে নাকচ করে তিনি জেনে নিলেন বাজারের রাস্তা। সেখানে গিয়ে সাধ্যমতো মালপত্র কিনে তা বিক্রি-বাট্টাতে লেগে গেলেন। আর আমরা তো জানি—যে লেগে থাকে এবং প্রাণান্তকর চেস্টা করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও তাকে সাহায্য করেন। অলস আর অকর্মণ্য লোকের জন্য কখনোই আল্লাহর সাহায্য আসে না।

রিক্তহস্তে আসা একজন সাহাবি ওই সময়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিবেশে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করে স্বর্ণ দিয়ে মোহরানা পরিশোধ করে বিয়ে করছেন—মদিনার আনসারদের কাছেও তা ভারি আশ্চর্যের ছিলো বটে!

হালাল উপার্জনের মাধ্যমে আমরা যারা বড় হতে চাই, নিজের একটা অবস্থান তৈরি করতে চাই, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ আমাদের জন্য এক বিরাট অনুপ্রেরণার নাম। নিজের দক্ষতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলেই তিনি সম্পদের প্রস্তাব নাকচ করে পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আমরাও যদি আমাদের দক্ষতার জায়গাগুলোকে পোক্ত করতে পারি, যদি নিজেদের যোগ্য করে তুলতে পারি জ্ঞানে-দক্ষতায়, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো আমরাও নিজেদের পথটাকে খুঁজে নিতে পারবো অন্যের গলগ্রহ হয়ে না থেকে।

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ দুনিয়া অর্জন করেছেন, কিন্তু হারিয়ে ফেলেননি অনন্ত সুখের আখিরাত। কেমন তাকওয়াবান, ঈমান আর আমলদার হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দুনিয়াতেই জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করেন, ভাবা যায়?

দুনিয়াকে খুঁজতে কোনো অসুবিধে নেই তা যদি আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো হয়।

চার.

পরিবারে দাওয়াহ দেওয়ার ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু হলে চলবে না। দ্বীনের পথে হাঁটতে গেলে অনেক অপমান-অপবাদ-তিরস্কার ধেয়ে আসবে—এটাই অমোঘ নিয়তি। এটা মাথায় রেখেই আমাদেরকে চারপাশের পরিস্থিতি এবং পারিবারিক পরিস্থিতি

সামাল দিতে হবে। আমরা রাতারাতি পরিবার এবং আশপাশের সবাইকে পাক্কা ধার্মিক বানিয়ে ফেলতে তৎপর হয়ে পড়ি। তার ফলে, যখন দেখা যায় যে, কেউ আমাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছে না বা আমাদের কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না, তখন আমরা ব্যাপকভাবে হতাশ হয়ে পড়ি। নিকটজনেরা সদুপদেশে সদিচ্ছা প্রদর্শন না করলে খারাপ লাগে বটে, তবে সেই খারাপ লাগা যেন আমাদেরকে এমন কোনো অবস্থায় না নিয়ে যায়, যেখানে আমার দ্বীন পালনটাও কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, মানসিকভাবে আমাদেরকে শক্ত থাকতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে—ইচ্ছে হলেই আমি কাউকে দ্বীনের পথে টেনে আনতে পারবো না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পারেননি। এটা হিদায়াতের ব্যাপার। আল্লাহ যাকে দেবেন, সে লাভ করবে; যাকে দেবেন না, সে বঞ্চিত হবে।

দাওয়াহ দিতে গেলে যদি তা ফলপ্রসূ না হয়, কেউ যদি সেই দাওয়াহ গ্রহণ না করে, হোক তা পরিবার কিংবা সমাজে—আমাদের ভেতরে তখন যে খারাপ লাগা তৈরি হয়, তা স্বাভাবিক। মক্কার মুশরিকদের এতভাবে তাওহিদের দাওয়াহ দেওয়ার পরও যখন তারা ফিরতে চাইলো না, ঔদ্ধত্য দেখালো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বেশ বিমর্ষ হয়ে যান। মানসিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি।

'আরেকজন দ্বীনের দাওয়াহ কবুল করছে না বলে নিজে হতাশ হয়ে পড়া'—এটা কোনো কার্যকরী পন্থা নয়। তাই মুশরিকদের বিমুখতায় যখন নবিজি ভেঙে পড়লেন, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলেন, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবিজিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন—

'তারা ঈমান আনয়ন করছে না দেখে মনে হচ্ছে, আপনি তাদের জন্য পরিতাপ করতে করতে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবেন।'[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবিজিকে বলছেন, কেন আপনার এত হতাশ, বিমর্ষ আর বিধ্বস্ত হওয়া লাগবে? আপনার যা দায়িত্ব, তা তো আপনি পালন করেছেন। দ্বীনের যে দাওয়াহ পৌঁছানোর কথা, তা তো আপনি পৌঁছিয়েছেন। এখন কে হেদায়াত পাবে আর কে পাবে না, তা নির্ধারণ করবেন আল্লাহ। যারা হিদায়াত পাচ্ছে না, তাদের কথা ভেবে নিজের দেহ আর মনকে অশান্ত রাখবার কোনো দরকার নেই।

---

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ৬

পরিবার আর সমাজ আমাদের কথা শুনছে না, আমাদের ডাকে সাড়া দেয় না, আমাদের দাওয়াহকে তারা প্রত্যাখ্যান করে, দ্বীন পালন করতে দেখলে আমাদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়—এসবকিছুকে একটা পরীক্ষা হিশেবে নেওয়া যাক। আমাদের দেখতে হবে যে—সঠিকভাবে, সঠিক পন্থায় তাদের কাছে আমরা দ্বীনকে তুলে ধরতে পেরেছি কি না। যদি কোনো ঘাটতি থাকে এই কাজে, সেই ঘাটতি পূরণে মনোনিবেশ করতে হবে। আমাদের আহ্বানে কতজন সাড়া দিচ্ছে তা কখনোই বিবেচ্য নয়। দুনিয়া থেকে আল্লাহর এমন অনেক নবি-রাসুল গত হয়েছেন, সারাজীবনে যাদের ডাকে একজন মানুষও সাড়া দেয়নি। সুতরাং সংখ্যা নয়, কাজ এবং কাজের ধারাবাহিকতাই আমাদের সামনে বিবেচ্য বিষয়।

যে যাই বলুক পিছে

এক.

আমার পরিবারকে কোনোভাবেই প্র্যাক্টিসিং পরিবার বলা যাবে না। গতানুগতিক গ্রাম্য পরিবারগুলো যেমন হয় অনেকটাই সেরকম। আম্মা আমার সাথে ঢাকায় থাকার ফলে ইসলামি অনুশাসনের রীতি-নীতিকে নতুনভাবে জানা শুরু করেছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ সে-মতে চলবার আপ্রাণ চেষ্টাও আম্মার মাঝে লক্ষণীয়।

যেহেতু আমার পরিবার সেভাবে প্র্যাক্টিসিং না, তাই একজন প্র্যাক্টিসিং মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করাটা আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিলো রীতিমতো। চ্যালেঞ্জটা বহু দিক থেকে—একটা নন-প্র্যাক্টিসিং পরিবেশে একজন প্র্যাক্টিসিং মেয়েকে সর্বোতভাবে সহায়তা করা, যাতে তার দ্বীন পালনে কোনো অসুবিধে না হয়। আবার সেটা করতে গেলে আত্মীয়স্বজনদের যে টিটকারি, কথা কানাকানি, এমনকি নিজের পরিবারের মানুষগুলোর বিরূপ মনোভাবগুলোকেও সমানভাবে সামলানোটা কতটা দুরূহ, তা বিবাহিত জীবনের শুরুর দিকে বেশ ভালোমতন টের পেয়েছিলাম।

আমার বিয়ের দিনের ঘটনা। মসজিদ থেকে বিয়ের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে আমরা বাসায় এলাম। আমাদের গ্রাম্য রীতিনীতি অনুসারে বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর কনেকে মিষ্টি হাতে ছেলের দুলাভাইদের (যদি থাকে) সামনে যেতে হয়। তাদেরকে মিষ্টি খাইয়ে দিতে হয় এবং দুলাভাইরা শালার বউ দেখে বকশিশ প্রদান করে।

বলাই বাহুল্য, আমার বিয়ের দিনও সেরকম একটা গুঞ্জন উঠেছিলো। যদিও আমি আগেই বলে রেখেছিলাম—আমার স্ত্রী পর্দা করবেন। কোনো পুরুষ মানুষের সামনে যাবেন না, কিন্তু পরিবারের সদস্যারা ধরে নিয়েছিলো—অন্তত হিজাব পরে হলেও তো দুলাভাইদের সামনে মিষ্টির প্লেট হাতে আসতে পারে। খাইয়ে না দিক, অন্তত একটা সালাম দিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু বেঁকে বসলাম আমি এবং আমার নব বিবাহিতা স্ত্রী। সাফ জানানো হলো—কোনো নন-মাহরাম পুরুষের সামনে আমার স্ত্রী যাবেন না। সেটা দুলাভাই হোক আর আমার নিজের ভাই। এগুলো তথাকথিত সামাজিকতা। এসব সামাজিকতা মানতে আমরা বাধ্য নই।

বুঝতে পেরেছি, সেই রাতে আমার বোনেরা কষ্ট পেয়েছিলো। তারা ভেবেছিলো, তাদের আদরের ছোটো ভাই তাদের জামাইকে অপমান করেছে। কী এমন হতো তার বউকে মিষ্টির থালা হাতে এক মিনিটের জন্য পাঠালে?

কিন্তু সামাজিকতা নয়, আমাদের যে সুন্নাহটাই মানতে হবে!

আমার স্ত্রীর পর্দার ব্যাপারে কেবল ওই একবার-ই পরিবেশ ঘোলাটে হয়েছিলো। এরপর পর্দা করা নিয়ে আর কোনো সমস্যার সম্মুখীন আমার স্ত্রীকে আজ পর্যন্ত হতে হয়নি, আলহামদুলিল্লাহ; বরং আমার পরিবার আর আত্মীয়স্বজনদের সবাই এখন সমানভাবে সচেতন তার পর্দা করার বিষয়ে। কোনো আত্মীয়স্বজনের বাসায় বেড়াতে গেলে সেখানকার পুরুষেরাও আমার স্ত্রীর পর্দা করার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেন এবং সেভাবে সবকিছুর আয়োজন করেন।

কয়েকদিন আগে দারুণ একটা ব্যাপার চোখে পড়লো। আমার স্ত্রী রান্না করছিলেন। রান্নাঘরের দরোজায় খেলছিলো আমার তিন বছরের ছোটো ভাগিনা। বাইরে থেকে হঠাৎ আমার বড় ভাই ঘরের ভেতরে এলে ভাগিনা জোরে বলতে শুরু করলো, 'মামা, এখানে এসো না। মামি আছে এখানে।'

আমার স্ত্রী আছে বিধায় রান্নাঘরে যে আমার বড় ভাই আসতে পারবে না, সেটা আমার তিন বছরের ভাগিনাও বুঝতে শিখে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। সে দেখছে যে, তার ছোটো মামি যে রুমে থাকে, সে রুমে তার বাবা, তার ভাই আসতে পারে না। তার বড় মামাও যে আসতে পারবে না, সেটা তার ছোট্ট মস্তিষ্ক বুঝে ফেলেছে।

আমি ভাবি, স্রোতে গা না ভাসিয়ে আমরা আল্লাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম বলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজ তা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

দুই.

দ্বীন মানা এবং নিজেকে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে জড়তা সবচেয়ে বেশি কাজ করে, তা হলো—লোকে কী ভাববে সেই ভয়! দাড়ি রাখতে গেলে আমাদের আশেপাশের কথা ভাবতে হয়। এত কম বয়সে মুখে দাড়ি রাখলে এলাকার মুরুব্বিরা কীভাবে নেবে, বন্ধুরা কী ভাববে, ক্লাশের স্যারেরা কী মনে করবেন—এসব ভেবে অনেকে দাড়ি রাখার সাহস পায় না।

কেউ সুন্নাহ-সম্মত উপায়ে বিয়ে করবে, এক পয়সা যৌতুক নেবে না, মেয়ের বাপের বাড়ির কোনো পয়সা বিয়েতে খরচ হতে দেবে না, বিয়ের দিনই ধার্যকৃত মেয়ের সকল মোহরানা পরিশোধ করে দেবে, বিয়েকে যতটা সম্ভব সাদামাটা রাখবে, আড়ম্বর করে তুলবে না। কোনো গান-বাজনার আয়োজন রাখবে না, এমনভাবে সব আয়োজন করবে যাতে কোনো মহিলার পর্দার অসুবিধা না হয়, কোনো পুরুষের দৃষ্টির খিয়ানত না ঘটে। এভাবে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেও কত তরুণকে আজীবন চলে আসা সেই পুরোনো রীতিতে বিয়ে করতে হয়, যেখানে যৌতুকের রমরমা কারবার, যেখানে বিয়ে মানেই মেয়ের বাপের নিঃস্ব হয়ে পড়া, যেখানে বিয়ে মানেই ধুমধাম আয়োজন, গান-বাজনার ছড়াছড়ি আর পর্দার বালাই তো থাকেই না। শুধু সমাজ কী ভাববে, আত্মীয়স্বজনেরা কী মনে করবে, বন্ধুবান্ধবেরা কীভাবে নেবে ব্যাপারটা—এসব পিছুটানের কারণেই অনেককে সুন্নাহ-সম্মত বিয়ের বিষয়টা পাশ কেটে যেতে হয়।

কোনো মেয়ে যদি পর্দা করার কথা ভাবে, সাথে তাকে আরো ভাবতে হয় তার চারপাশের কথা। কোনো বান্ধবীই যেহেতু পর্দা করে না, সে একা কীভাবে মানিয়ে নেবে নিজেকে? চারপাশ থেকে ভেসে আসবে—'বোরকা-হিজাব বিয়ের পরেই না হয় পরো। এখন যদি এত ঢেকেঢুকে চলো, বিয়ে দিতে তো ভারি মুশকিল হয়ে যাবে। রাস্তাঘাটে-ক্যাম্পাসে মানুষের চোখে না পড়লে বিয়ের জন্য ভালো প্রস্তাব আসবে কোত্থেকে?

মোদ্দাকথা, দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি থেকে আমাদের সমাজগুলো যেহেতু যোজন যোজন দূরে, তাই মৌলিকভাবে দ্বীনের হুকুম-আহকাম মানতে গেলে, সে অনুসারে

জীবন পরিচালনা করতে গেলে আমাদের সমাজ সেগুলোকে 'নয়া কারবার' হিশেবে গণ্য করে। সেই হুকুম-আহকাম যারা পালন করে, অনেক সময় তাদের বাঁকা চোখে দেখা হয়। এমনভাবে তার সাথে আচরণ করা হয়, যেন সে সমাজ-বিচ্যুত কোনো জীব! যেন তার কারণে সমাজের মান-ইজ্জত চলে যাচ্ছে, যেন তার কারণেই পরিবারের অন্য সবার মাথা কাটা যাচ্ছে!

ঘটনার এই সিলসিলা আসলে নতুন নয়। ইসলামের আবির্ভাবের সময়কাল থেকেই এই ধরনের সামাজিক, ব্যক্তিক, পারিবারিক আর রাষ্ট্রীয় বাধা মুসলিমদের পার করে আসতে হয়েছে।

সম্ভবত এমন কোনো নবি-রাসুল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রেরণ করেননি, যাদের প্রচারিত দ্বীনকে, যাদের নিয়ে আসা রীতিনীতিকে শুরুতে মানুষেরা 'নয়া কারবার' জ্ঞান করেনি। প্রায় সব নবি-রাসুলকেই তাদের সমাজের বিপরীতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। অনেকসময় পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়েও তাদের আঁকড়ে ধরতে হয়েছে সত্যের বাণী।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বাবা ছিলো একজন মূর্তিপূজক। তার সমাজও ছিলো আগাগোড়া মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত, কিন্তু ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন তাওহিদের ঝান্ডা নিয়ে। তার নিয়ে আসা বিধানের সাথে তার সমাজের, তার রাষ্ট্রের, তার পরিবারের—কোনোকিছুর সাথেই মিল ছিলো না, তথাপি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সত্যকে বাদ দিয়ে অসত্যকে গ্রহণ করেননি। সত্য হিশেবে তার সামনে যা প্রতিভাত হয়েছে, তা-ই তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছেন। পাছে লোকে কী বলবে, সমাজ কীভাবে নেবে, পরিবার কীভাবে দেখবে, বন্ধু-বান্ধবেরা কী মনে করবে—এসবকে তিনি পাত্তা দেননি একটুও।

আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমার প্রিয় কুরাইশবাসী, আমি আপনাদের জন্য সত্যের এক পয়গাম নিয়ে এসেছি। আপনাদের সতর্ক করতে এসেছি লেলিহান আগুনের শিখা থেকে', তখন ব্যঙ্গভরে কুরাইশরা বলেছিলো, 'মুহাম্মাদ, তুমি কি তোমার এসব প্রলাপ শোনাবার জন্য আমাদের এখানে জড়ো করেছো?'[১]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৯৭১; *সহিহ মুসলিম* : ২০৮; *তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড : ১৯; পৃষ্ঠা : ৪০৮;

কুরাইশদের ঘৃণাভরা প্রত্যাখ্যানের পরও কিন্তু থেমে যাননি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। প্রতিকূল সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তা পালন করে গেছেন, যা মহান রব নাযিল করেছেন। তা বলে গেছেন, যা বলা তার দায়িত্ব ছিলো। পাছে কে কী বললো—সেসবে তার ছিলো না কোনো ভ্রুক্ষেপ।

তিন.

সমাজের, পরিবারের, বিভিন্ন মহলের নানান কথা, তিরস্কার আর উপেক্ষাগুলো আমাদের পরিবর্তনের পথে বড় বাধা বটে। নিজেকে পরিবর্তন করতে চাইলেও অনেকসময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিকটজন আর পরিচিত মহল সেই পরিবর্তনকে কীভাবে না কীভাবে নেবে, সেটা ভেবে ভেবে আমরা বদলাতে পারি না নিজেদের। আমরা ভাবি, 'এদের ছাড়া তো আমার চলবে না, তাই আপাতত এদের মতো হয়ে চলি বা এদের মন জুগিয়ে বাঁচি।'

কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরিবর্তনটা যদি আল্লাহর জন্যই হয়, তাহলে জেনে রাখুন—আপনার পাশে যখন আল্লাহ থাকেন, তখন দুনিয়ার আর কোনো সাহায্যকারীকেই আপনার দরকার নেই। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ দিতে গিয়ে একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জেনে রাখো, যদি সমগ্র উম্মাহ তোমার উপকার করতে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে কেবল ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু তোমার তাকদিরে আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আর যদি সমগ্র উম্মাহ তোমার ক্ষতি করতে জোটবদ্ধ হয়, তাহলে কেবল ততখানি ক্ষতিই করতে পারবে, যতখানি তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন আল্লাহ।'[১]

আপনি যদি মনে করেন, নিজেকে বদলে নিলে, মুখে দাড়ি রেখে নিলে, বোরকা-হিজাবে নিজেকে আবৃত করে নিলে, সুন্নাহর রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিলে চারপাশের মানুষেরা আপনাকে সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে, আপনার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেবে, আপনার পাশে থাকা বন্ধ করে দেবে এবং এতে আপনার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে, আপনার জীবন স্থবির হয়ে যাবে; তাহলে আপনি ভুল

তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ৩৪৭৩; *বাইহাকি* : ১৭৭২৫

[১] *জামি তিরমিযি* : ২৫১৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৭৬৩; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৬৩০৩; *রিয়াযুস সালিহিন* : ৬২

ভাবছেন। চারপাশের মানুষেরা মিলে নয়, গোটা দুনিয়া সংঘবদ্ধ হয়েও যদি আপনার উপকারের চেষ্টা করে, কিন্তু তা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার তাকদিরে না রাখেন, তাহলে কারো সাধ্য নেই আপনার উপকার করে। আবার গোটা দুনিয়া একত্র হয়েও যদি আপনার বিরুদ্ধে লাগে, আপনার ক্ষতি করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ যদি কোনো ক্ষতি আপনার তাকদিরে না রাখেন, কারো সাধ্য নেই যে, আপনার একবিন্দু ক্ষতি করে। এই যদি হয় অবস্থা—তাহলে বলুন, নিজেকে বদলানোর ব্যাপারে পাছে লোকে কী বলছে, তা ভেবে সময় নষ্ট করবার মতো সময় আপনার হাতে থাকা উচিত?

খুলে যাক জীবনের বন্ধ দুয়ার

এক.

একবার এক ভাই আমার অফিসে এসে বললেন, 'আরিফ ভাই, একটা কথা ভাবছি।'

আমি বেশ আগ্রহের সাথেই বললাম, 'কী কথা?'

'ভাই, ভাবছি বিয়ে করবো।'

বিয়ের কথাটা শুনে আমি খানিকটা চমকালাম। আমার সামনে বসা মানুষটা তিন সন্তানের জনক। এমনও নয় যে, তার বিয়ের ব্যাপারটা আমার কাছে অজানা কিছু। সুতরাং, তার মুখে নতুন করে বিয়ের কথা শোনাটা হালকা চমকে ওঠার মতোই ব্যাপার। আর আজকাল হয়েছে কী, মানুষজন দ্বিতীয়-তৃতীয় বিয়ে নিয়ে এত মজা-মশকরা করেন যে, বিয়ের মতো গুরুতর ব্যাপারও আজকাল হাসি-তামাশার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে! আমাদের এই অধঃপতনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার দায়টাও অবশ্য কোনো অংশে কম নয়।

যা-হোক, উৎসাহের সাথেই ভাইটাকে বললাম, 'মাশা আল্লাহ, বিয়ের চিন্তা তো বেশ ভালো, কিন্তু হঠাৎ করে দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তা এলো কেন মাথায়?'

আমি খেয়াল করলাম তার মুখ বেশ ফ্যাকাশে ও মলিন। চোখে-মুখে বিষণ্নতার ছাপ গাঢ় হয়ে ধরা পড়ছে। চেহারার এমন দুর্দশা নিয়ে আর যাই হোক, মজা করার

জন্য যে তিনি আমার কাছে বিয়ের ব্যাপারটা উত্থাপন করেননি—সে ব্যাপারে আমি ঘোরতর নিশ্চিত।

'আসলে ভাই, জীবনে কেমন যেন ছন্দহারা হয়ে পড়েছি। যেদিকেই যাচ্ছি কোনো গতি পাচ্ছি না। কত দিন ধরে চেস্টা চালাচ্ছি একটা ব্যবসা দাঁড় করানোর জন্য, কোনোভাবেই কূল-কিনারা হচ্ছে না। যেখানেই হাত দিচ্ছি মনে হচ্ছে, ক্ষতি ছাড়া আর কোনোকিছুই উঠে আসছে না। জীবন থেকে বারাকাহ একেবারে উঠে গেলো মনে হয়। তাই ভাবছি আরেকটা বিয়ে করবো। বিয়ে করলে আয়-রোজগারে বারাকাহ আসে, তা তো জানেন?'—একনিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন ওই ভাই।

বুঝতে পারলাম, জীবন থেকে হারানো বারাকাহ ফিরে পেতে তিনি পুনরায় বিয়ের কথা ভাবছেন। ছন্দহীন যে জীবনের জাঁতাকলে পিষ্ট তিনি, তা থেকে মুক্তি লাভ করতে এবং জীবন থেকে হারানো বারাকাহ পুনরুদ্ধারে নতুন করে বিয়ে করাকেই তার কাছে এই মুহূর্তে সঠিক কাজ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

এটা ঠিক যে—বিয়ে করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জীবনে বারাকাহ দেন, আয়-রোজগারে বারাকাহ দেন, তবে বিয়েই যে বারাকাহ লাভের একমাত্র পন্থা—তা কিন্তু নয়। বারাকাহ লাভের অনেকগুলো পথ ও পন্থা আছে।

তাকে অনেকটা মজা করেই বললাম, 'বিয়ে তো একটা করেই আছেন ভাই, তারপরও যখন বারাকাহ পাচ্ছেন না, তখন বারাকাহ লাভের নতুন দরোজার সন্ধান করার চাইতে বারাকাহ আসার যে দরোজাগুলো বন্ধ হয়ে আছে, তা উন্মুক্ত করবার চেষ্টা করাই ঢের উত্তম নয় কি?'

বলাই বাহুল্য, তিনি আমার গভীর দার্শনিকসুলভ কথাটা বুঝতে বেমালুম ব্যর্থ হলেন! কপালের কুঞ্চিত রেখাকে আরো দীর্ঘ করে তিনি বললেন, 'কী-সব জটিল-কঠিন কথা বলেন ভাইজান। সহজ করে না বললে বুঝি কীভাবে বলেন?'

আমি স্মিত হাসলাম। লিখতে দিলে খানিকটা সহজ করে হয়তো লিখতে পারি, কিন্তু বলতে দিলে যে আমি একেবারে তালগোল পাকিয়ে বসি—হাতেনাতে তার প্রমাণ পেয়ে একটু শরমিন্দা হলাম বটে।

'না, আসলে বলতে চাইলাম যে, বিয়ে করলে বারাকাহ পাওয়া যায় এটা ঠিক, তবে বারাকাহ লাভের জন্য নতুন করে বিয়ে করার আগে, জীবন থেকে বারাকাহ

চলে গেলো কেন, সেই কারণ উদঘাটন করাটাই বেশি জরুরি। হতে পারে এমন কোনো কাজ আপনি করে যাচ্ছেন, যা হয়তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পছন্দ করছেন না। এমন কোনো কাজ যা আল্লাহকে আপনার ব্যাপারে ক্রোধান্বিত করে তুলছে। ফলস্বরূপ, আপনার জীবন থেকে তিনি বারাকাহ উঠিয়ে নিলেন। হতে পারে না এমন?'

তিনি সোৎসাহে বললেন, 'ভালো কথা বলেছেন তো! এভাবে ভাবা হয়নি আগে। আমার তো নিজেকেই আগে প্রশ্ন করা দরকার যে, বারাকাহ আসার পথগুলো আমি আদৌ ঠিক রাখতে পেরেছি কি না।'

'একদম ঠিক। নিজেকে মনের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে একবার চিন্তা করুন তো—জীবনের কোনো এক পর্যায়ে আপনার এমন কোনো কাজ আছে বা হচ্ছে কি না, যার দরুন আপনি জীবনে ছন্দ হারাচ্ছেন? এমন কোনো ভুল যা আপনি প্রতিদিনই করছেন, কিন্তু তা যে ভুল, সে ব্যাপারে আপনি বেমালুম ও বেখবর। যদি সেরকম কোনোকিছুর দেখা মেলে, সবার আগে সেটা সংশোধন করে ফেলুন। বারাকাহ লাভের যে পথগুলো রুদ্ধ হয়ে আছে, সেগুলোকে প্রবল ধাক্কায় উন্মুক্ত করে দেন। এরপরও যদি জীবনে বারাকাহ না পান, তখন বারাকাহ লাভের নতুন কোনো দরোজার কথা ভাবতে পারেন।'

দুই.

আমার এক কলিগ একদিন বেশ মন খারাপ করে তার পরিবারের কথা বললেন। সংসারে ঝামেলা যাচ্ছে, স্ত্রীর সাথে নিত্য-নৈমিত্তিক ঝগড়া-ঝাটি হচ্ছে। সংসারের টানাপোড়েনের দরুন ঘরে ঢুকলে অস্থির অস্থির লাগছে তার। কাজে মন বসে না, ইবাদতে মনোযোগ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

কারো জীবনের করুণ এবং হাপিত্যেশের গল্প শুনলে বিমর্ষ হয়ে পড়ি। জীবনের জানা-পথে যখন অজানা শঙ্কা এসে ভর করে, তার ভার তখন হিমালয়ের ভারত্বকেও ছাড়িয়ে যায়। সব ঠিকঠাক চলার পরেও কেবল সংসারে যদি দহন লাগে, সেই আগুন-স্পর্শ তখন সব ভালো চলাকেই ভস্ম করে ছাড়ে।

এক বন্ধুর কাছে বেশ অনেকদিন হলো কিছু টাকা পাই। কয়েকদিন আগে তাকে বললাম, সম্ভব হলে টাকাগুলো দেওয়ার জন্য। সে বেশ আফসোস নিয়ে লজ্জিত

মুখেই বললো, 'এখন যদি আমাকে কেটে দুই ভাগও করিস, তারপরও একটা টাকা আমি তোকে দিতে পারবো না। বউ আর শিশুকে অনেকদিন হয় তার বাপের বাড়ি রেখে এসেছি। যে কাজেই হাত দিচ্ছি, মনে হচ্ছে সব ছাই হয়ে যাচ্ছে। জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে যাচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে, এর পরের ধাপে আমাকে আত্মহত্যাই করতে হবে।'

তিন.

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এই পর্যায়গুলো আসতে পারে—জীবনে বারাকাহ না পাওয়া, সংসার থেকে সুখ-শান্তি উবে যাওয়া, জীবনের কোথাও নিদারুণ ছন্দপতন ঘটা। সময়ে, আয়-রোজগারে, ব্যবসাপাতিতে, কাজে-কর্মে, এমনকি আমল-ইবাদত থেকে শুরু করে জ্ঞানার্জনেও আমরা বারাকাহ হারাতে পারি। মনে হতে পারে—প্রবল প্রচেষ্টার পরেও প্রাপ্তির খাতাটা কেমন যেন শূন্যতায় ঠাসা! কোথাও যেন স্বঃস্তি নেই, যেন কোথাও নেই একটু আনন্দ আর আয়েশের ঘনঘটা।

জীবনে যখনই এ ধরনের মুহূর্তের মুখোমুখি হবো, সবার আগে আমাদেরকে মনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। যে আয়নায় চেহারা দেখা যায়, তাতে মনের রোগ ধরা পড়ে না, কিন্তু মনের আয়নায় সুন্দর মুখাবয়বের দেখা না মিললেও, মনের রোগগুলো তাতে একে একে ভেসে উঠতে থাকে; অবশ্য যদি সে ইচ্ছে ও আন্তরিকতা নিয়ে আমরা মনের আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারি তবেই তো!

আকাশে মেঘ জমলে আদিগন্ত নীলাকাশ মেঘের আড়ালে লুপ্ত হয়ে যায়, প্রবল প্রতাপের সূর্য-রশ্মি মিলিয়ে যায় অন্ধকারের গহ্বরে। এমন মুহূর্তে ঝকঝকে নীলাকাশ দেখতে হলে শর্ত কী? শর্ত হলো—আকাশ থেকে মেঘ কেটে যাওয়া। মেঘ কেটে গেলেই আবার আমরা দূরদিগলয়লীন নীল আকাশ দেখতে পাই, সূর্য-কিরণে আবারও গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে প্রকৃতি।

জীবনে বারাকাহ লাভের এবং বারাকাহ হারানোর ব্যাপারগুলোও একইরকম। জীবন হলো সেই সীমানা-বিহীন আকাশের মতোই, আর তার নীল রঙ এবং অবারিত সূর্য-কিরণ হলো বারাকাহ-র প্রতিচ্ছবি। জীবনের আকাশে যখন মেঘের আস্তরণ পড়বে, যখন তাতে দলে দলে ঘনীভূত হবে কালো মেঘ, তখন বারাকাহ হিশেবে পাওয়া অবারিত নীল আর সূর্য-কিরণ জীবনাকাশ থেকে লুপ্ত হবে—এই তো স্বাভাবিক।

তবে সেই মেঘ কেন জমে, কোথায় তার উৎসস্থল, সেটা নির্ণয় করা গেলে, তা সংশোধন করা গেলে ঘনায়মান মেঘের অন্ধকার গহ্বর থেকে জীবনের নীল আর প্রভাতের সূর্য-কিরণ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

চার.

পুনরুদ্ধার? কিন্তু কীভাবে?

জীবনে যে পথে বারাকাহ আসে, কিংবা যে পথে রুদ্ধ হয়ে যায় বারাকাহ লাভের দুয়ার, সেই পথগুলোতে অনুসন্ধান চালিয়ে।

আপনার সেই গুনাহটার কথা ভাবুন তো, যা আপনি নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছেন। যা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আপনার রাজ্যের অনীহা! আছে এমন কোনো গুনাহ আপনার? সেটা হতে পারে দৃষ্টির হিফাযত না করা, পরনারী বা পরপুরুষের দিকে নিজেকে আকৃষ্ট করে রাখা, চোখের যিনায় নিজেকে মগ্ন করে রাখা, নেট দুনিয়ায় অশ্লীল-অশালীন ভিডিও দেখে বেড়ানো।

অথবা কখনো কি কারো আমানত নষ্ট করেছেন? কেউ বিশ্বাস করে আপনার কাছে কোনো আমানত গচ্ছিত রেখেছে, কিন্তু আপনি তা ভোগ করে বসে আছেন? সেই আমানত হতে পারে তার অর্থকড়ি, যা আপনি যথেচ্ছ খরচ করে ফেলেছেন; হতে পারে তার গোপন কোনো কথা, যা আপনি অন্যদের বলে বেড়িয়েছেন; হতে পারে অর্পিত কোনো দায়িত্ব, যা আপনি পালন করেননি। আছে এমন কিছু?

কিংবা কারো হক কি নষ্ট করেছেন কোনোদিন? কোনো ইয়াতিমের সম্পদ ভোগ করা কিংবা কারো ন্যায্য পাওনা না দেওয়া? ক্ষমতা দেখিয়ে কোনোদিন কি কারো জমি-জমা দখল করেছেন বা হাতিয়ে নিয়েছেন কোনো ব্যক্তির জমানো অর্থ-সম্পদ?

আল্লাহর সাথেই-বা আপনার সম্পর্কটা কেমন? তিনি যে কাজগুলো আপনার জন্য ফরয করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে আপনি কতখানি যত্নবান? আযান শুনে আপনি কি মসজিদে যাওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন নাকি বুঁদ হয়ে থাকেন নিজের কাজে? আপনার ওপর যাকাত ফরয হওয়ার পরেও কি কৃপণতা করে তা আদায় করেন না? আপনার কুরবানিগুলো কি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর জন্যই হয় নাকি সমাজে আপনি কত বড়লোক তা প্রমাণের উপলক্ষ হয়ে ওঠে? রামাদানের সিয়াম পালনে

আপনার আন্তরিকতা কেমন? নাকি তা কেবলই উপোস থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা হয়েই থাকে?

এসব হলো 'মনের আয়না'র কয়েকটা উদাহরণ। সত্যিকার অর্থে কোন গোপন গুনাহে আপনি নিমজ্জিত, তা আপনার রব আর আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। জীবনে হারানো বারাকাহ পুনরুদ্ধারে তাই মনের সেই আয়নার সামনে আজকেই দাঁড়িয়ে যান। যে নিরন্তর পাপ কাজে নিমজ্জিত আছেন, তা থেকে নিজেকে অতি-শীঘ্রই টেনে তুলুন। যেখানে যার সাথে যা অন্যায় করেছেন, সম্ভব হলে সেগুলো মিটিয়ে নিন। যার পাওনা অপরিশোধিত আছে, তা পরিশোধ করে দেন। যদি তা না-ও পারেন, অন্তত তার কাছে গিয়ে করজোড়ে 'দুঃখিত' বলে ক্ষমা চান। আল্লাহর যে হকগুলো আদায়ে আপনি উদাসীন হয়ে আছেন, সেগুলোতেও তৎপর হতে হবে আপনাকে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে—আজ থেকে আর কোনোদিন এক ওয়াক্তও সালাত কাযা করা যাবে না। মিথ্যা কথা বলা যাবে না। খারাপ কাজ করা, খারাপ কথা শোনা, খারাপ কিছু দেখা যাবে না। রামাদান মাসে নিজেকে নিবিড়ভাবে সঁপে দিতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। যাকাত আদায়ে আর কোনো কৃপণতা নয়। এবার থেকে কুরবানিগুলো হবে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর জন্যই।

মনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি খুঁজে বের করে আনতে পারেন জীবন থেকে বারাকাহ কমে যাওয়ার সত্যিকার কারণ, তবে সেটাই আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হয়ে দাঁড়াবে।

পাঁচ.

জীবনে বারাকাহ লাভের কিংবা হারানো বারাকাহ পুনরুদ্ধারের কার্যকরী একটা পন্থা হলো ইস্তিগফার।

জনপদে বহুদিন ধরে বৃষ্টি হয় না। মাঠ ফেঁটে চৌচির। পানির জলাশয়গুলো শুকিয়ে আস্তে আস্তে বিলীন হতে চলেছে। এভাবে চলতে থাকলে মানুষের জীবন মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। এমন করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করে এক লোক হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহর কাছে এসে বললো, 'ইয়া শাইখ, বহুদিন বৃষ্টির দেখা নেই। জীবনধারণ দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। আমাদের এই বিপদ থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দেন।'

তখন হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করো। বেশি বেশি আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ো।'

অন্যদিন আরেকজন এলো হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহর কাছে। এসে বললো, 'শাইখ, দারিদ্র্যের কশাঘাতে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছি। আয়-রোজগার নেই কোনো। সন্তান-সন্ততি নিয়ে উপোসে কাটছে দিন। এই সমস্যা থেকে বাঁচবার পথ বাতলে দেন, দয়া করে।'

হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'অধিক পরিমাণে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করো। বেশি বেশি আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ো।'

তৃতীয় একজন এসে বললো, 'শাইখ, বিয়ের এতগুলো বছর পার হলো, কিন্তু কোলজুড়ে কোনো সন্তানাদি এলো না এখনো। আপনি কি আমাদের সন্তানাদি লাভের কোনো আমল শিখিয়ে দিতে পারেন?'

হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহ তাকেও বললেন, 'অত্যধিক পরিমাণে 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ো।'

প্রত্যেককে একই উপদেশ আর পরামর্শ দিতে দেখে, তখন একজন জিগ্যেশ করে বসল, 'ইয়া শাইখ, কেউ কোনো সমস্যা নিয়ে এলেই আপনি তাকে একই সমাধান দিচ্ছেন। ইস্তিগফার করতে বলছেন। এমনটা কেন?'

লোকটার প্রশ্নের জবাবে তখন হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের ওই কথাগুলো পড়োনি?' এরপর তিনি সুরা নুহের আয়াতটা তিলাওয়াত করলেন—

'আর আমি তাদেরকে বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ইস্তিগফার করো; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। (তোমরা ইস্তিগফার করলে) তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করবেন। আর তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দিয়ে। তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত নদীমালা।'[১][২]

---

[১] সুরা নুহ, আয়াত : ১০-১২

[২] *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন* (*তাফসিরুল কুরতুবি*), ইমাম কুরতুবি, খণ্ড : ১৮; পৃষ্ঠা : ৩০২

নুহ আলাইহিস সালাম তার অবাধ্য জাতিকে বলছেন, যেন তারা আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে কী হবে? নুহ আলাইহিস সালাম বলে দিচ্ছেন—তারা যদি ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের জন্য মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করবেন, তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি দিয়ে ভরিয়ে তুলবেন এবং সাথে আছে জান্নাতের চির সবুজ উদ্যান আর প্রবাহিত নদীমালার নিশ্চয়তা। এটা নুহ আলাইহিস সালাম কর্তৃক দেওয়া আল্লাহর একটা ওয়াদা। সবকিছুর জন্য শর্ত কী? ইস্তিগফার তথা আল্লাহর কাছে অবারিত ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

ক্ষমাপ্রার্থনা করলে কুরআনুল কারিমে দুনিয়ায় তিনটা জিনিস দেওয়ার কথা আছে—**এক.** মুষলধারে বৃষ্টি। **দুই.** সম্পদ। **তিন.** সন্তানাদি।

তবে অবারিত ক্ষমাপ্রার্থনার ফলাফল কি কেবল এই তিনটা বিষয়েই সীমাবদ্ধ? এর বাইরে আল্লাহ কি আর কিছুই দেবেন না বান্দাদের? দেবেন তো অবশ্যই। এই আয়াতে যে তিনটা বিষয়ের কথা এসেছে, ওই তিনটা জিনিসের প্রকট ঘাটতি ছিলো নুহ আলাইহিস সালামের জাতির মাঝে। প্রচণ্ড খরায় তাদের জীবন দুর্বিষহ ছিলো, দরিদ্রতায় তারা নাস্তানাবুদ হচ্ছিলো তখন। আর তাদের অধিকাংশই ছিলো নিঃসন্তান। কোনো সন্তানাদি হচ্ছিলো না। এজন্যই এই আয়াতে তাদের সমস্যাগুলোকে ধরে কথা বলা হয়েছে মূলত। কিন্তু আয়াতটার গূঢ় অর্থ হচ্ছে এই—বান্দার যদি কোনোকিছুর দরকার হয়, যদি তার জীবনে কোনোকিছুর ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যদি তার কোনোকিছু পেতে ইচ্ছে করে, তবে সে যেন আল্লাহর কাছে অবারিতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। তবেই আল্লাহ তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দেবেন।

ইস্তিগফার নিয়ে চমৎকার একটা ঘটনা পাওয়া যায় ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর জীবনীতে। একবার ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ শামের একটা শহর হয়ে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ইশার সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি কাছের এক মসজিদে ঢুকলেন সালাত আদায়ের জন্য।

যেহেতু রাত হয়ে গেছে এবং তাকে যেতেও হবে অনেকদূর, তাই ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ রাতটা ওই মসজিদে কাটানোর ব্যাপারে মনস্থির করলেন। যাতে ফজর সালাত পড়ে ভোরে ভোরেই তিনি পুনরায় যাত্রা শুরু করতে পারেন।

তল্পিতল্পা নিয়ে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ মসজিদে ঢুকলেন এবং যথারীতি ইশার সালাত আদায় করলেন। কিন্তু বিপত্তিটা বাঁধলো তার পরে। ইমাম আহমাদকে সালাত শেষ করার পরেও মসজিদে বসে থাকতে দেখে মসজিদের দ্বাররক্ষী বললো, 'মসজিদ বন্ধ করা হবে। আপনার সালাত কি শেষ হয়েছে?'

দ্বাররক্ষীর প্রশ্নের জবাবে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'জি, আমার সালাত শেষ হয়েছে; কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, আজ রাতটা আমি এই মসজিদেই কাটাবো। আসলে আমি একজন মুসাফির। আমার গন্তব্য এখান থেকে বহুদূরে। রাতের অন্ধকার আর সফরের ক্লান্তির কথা ভেবে আমি রাতের বিশ্রামটা এখানে করতে চাই।'

চারদিকে তখন যদিও ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহর অনেক সুনাম আর খ্যাতি, তবু শামের ওই অঞ্চলের মানুষ যেহেতু ইতোপূর্বে ইমাম আহমাদকে স্ব-শরীরে কখনো দেখেনি, তাই ব্যক্তি হিশেবে তাকে কেউ চেনে না। মসজিদের ওই দ্বাররক্ষীও ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহকে চিনতে পারেনি।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ মসজিদে থাকতে চাচ্ছেন শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো দ্বাররক্ষী। সে বললো, 'না না। মসজিদে থাকা যাবে না। আমাকে এক্ষুনি মসজিদে তালা দিতে হবে। দয়া করে আপনি থাকবার জন্য অন্য ব্যবস্থা দেখুন।'

নিজের মুসাফির পরিচয় এবং সফরের ক্লান্তির কথা শুনিয়েও দ্বাররক্ষীর মন গলাতে ব্যর্থ হলেন ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ। শেষ পর্যন্ত সফরের তল্পিতল্পা নিয়ে তাকে মসজিদের বাইরে বের হয়ে আসতে হলো।

মসজিদের বাইরেই ছিলো একটা রুটির দোকান। রুটিওয়ালা মসজিদের দ্বাররক্ষী ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের মধ্যকার কথাবার্তা কিছুটা আঁচ করতে পেরে ইমাম আহমাদকে বললেন, 'জনাব, যদি কিছু মনে না করেন, আমার রুটির দোকানে আপনি রাতটা পার করতে পারেন। আপনি মুসাফির মানুষ। সফরের ক্লান্তি নিয়ে এই দীর্ঘ রাতে দূরের পানে যাত্রা করা আপনার উচিত হবে না। আমার এখানে থাকতে আশা করছি আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।'

রুটিওয়ালার আতিথ্য গ্রহণ করলেন ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তার তল্পিতল্পা নিয়ে রাতের বিশ্রামের জন্য রুটির দোকানটায় ঢুকে পড়লেন।

রুটির দোকানে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থানের পর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বেশ অভিনব একটা ব্যাপার খেয়াল করলেন। তিনি দেখলেন, যে রুটির দোকানদার তাকে এই বিজন রাতে তার দোকানে থাকবার ঠাঁই দিয়েছেন, সেই রুটিওয়ালার মুখে গুনগুন শব্দে সর্বদা ইস্তিগফার উচ্চারিত হচ্ছে। তিনি ঠোঁট নেড়ে নেড়ে এক-ধ্যানে আওড়াচ্ছেন—'আসতাগফিরুল্লাহ... আসতাগফিরুল্লাহ... আসতাগফিরুল্লাহ।'

ব্যাপারটা বেশ ভালো লাগে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর। এমন চমৎকার আমলের ব্যাপারে কৌতূহল আটকে রাখতে না পেরে তিনি রুটিওয়ালাকে বললেন, 'আচ্ছা ভাই, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জানতে পারি?'

রুটিওয়ালা বিনীত গলায় বললেন, 'অবশ্যই! অবশ্যই!'

'এখানে আসার পর থেকে দেখছি আপনার মুখে সর্বদা ইস্তিগফার লেগে আছে। নিবিষ্ট মনে আপনি সারাটা সময় ইস্তিগফারে মজে থাকছেন। নিঃসন্দেহে এটা অতি উত্তম একটা আমল। আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে—এই আমলের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার জীবনে কোনো রহমত নাযিল করেছেন কি না?'

রুটিওয়ালা স্মিত হেসে বললেন, 'জি। এই আমলটার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে তাঁর অপার অনুগ্রহে সিক্ত করেছেন।'

'কীরকম?'—ইমাম আহমাদের জিজ্ঞাসা।

এবার রুটিওয়ালা বললেন, 'আজ পর্যন্ত আমার এমন কোনো দুআ নেই, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করেননি।'

রুটিওয়ালার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে যান ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ! আল্লাহর যমিনে এমন বান্দাও আছে, যার কোনো দুআ ব্যর্থ হয় না? সে যা চায়, আল্লাহ তা দিয়ে দেন? সুবহানাল্লাহ!

বিস্ময়ের রেশ গলায় ধরে রেখেই তিনি রুটিওয়ালাকে বললেন, 'তার মানে, আপনার সব দুআই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়?'

'জি, কেবল একটা দুআ আমার বাকি আছে, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখনো কবুল করেননি।'

‘কোন দুআ?’—জানতে চাইলেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল।

‘আল্লাহর এক মুখলিস বান্দা, ইমাম আহমাদকে দেখার আমার বড় শখ! আল্লাহর কাছে করজোড়ে ফরিয়াদ করে যাচ্ছি, যাতে জীবনে অন্তত একবার তাকে আমি চোখের দেখা দেখতে পারি।’

রুটিওয়ালার কথা শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ। বান্দার দুআ দয়াময় আল্লাহ কতভাবে যে কবুল করেন, তা ভেবে অশ্রুজলে সিক্ত হতে লাগলো তার দু-চোখ। তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে রুটিওয়ালা বললেন, ‘আপনার চোখে পানি কেন? আমি কি কোনোভাবে আপনাকে কষ্ট দিয়েছি?’

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তার কান্না বিজড়িত গলায় বললেন, ‘আপনার কবুল না হওয়া দুআটাও আজ কবুল হলো, ভাই। আপনার সম্মুখে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই আহমাদ ইবনু হাম্বল। নিশ্চয় আপনার দুআর কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার বান্দা আহমাদকে আপনার দোরগোড়ায় টেনে এনেছেন।’[১]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এবং রুটিওয়ালার গল্পের সবচেয়ে মুখ্য বিষয়টা হলো—অবিরত ইস্তিগফার! রুটিওয়ালা সর্বদা, তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে বলতেন—আসতাগফিরুল্লাহ! আসতাগফিরুল্লাহ! এই আমলটা তার জীবনের একটা নিত্য-নৈমিত্তিক রুটিন হয়ে দাঁড়ালো। যখনই সময় পান, তখনই ইস্তিগফারে মশগুল থাকার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জীবনের সমস্ত দুআ কবুল করতেন। তার ইস্তিগফার অবশ্যই লোক দেখানো ছিলো না এবং তাতে ছিলো না কোনো খেয়ালিপনাও। হৃদয়ের গভীর থেকে সত্যিকারভাবে তিনি আল্লাহর কাছে এই ইস্তিগফারের মাধ্যমে তাওবা করতেন বলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুরস্কার হিশেবে তার দুআগুলো কবুল করে নিতেন। এমনকি ইমাম আহমাদকে দেখার যে বাসনা তার ছিলো, সেটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পূরণ করে দিলেন একদিন। তার সেই বাসনা পূরণ করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ইমাম আহমাদের কাছে টেনে নেননি, বরং ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহকেই টেনে এনেছিলেন তার কাছে।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ১১; পৃষ্ঠা : ৩২১-৩২২; *মানাকিবুল ইমাম আহমাদ*, পৃষ্ঠা : ৫১২

ইস্তিগফারের এই হলো শক্তি!

আপনি কি সংসার জীবনে ভীষণ অসুখী? স্ত্রীর সাথে, বাবা-মা, ভাই-বোনের সাথে নিত্য-নিয়মিত মনোমালিন্য হচ্ছে? মনে হচ্ছে সংসার জীবন থেকে বারাকাহ হারিয়েছেন? তাহলে আজ থেকে অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার পাঠ শুরু করুন।

আপনার কি চাকরি হচ্ছে না? বেকারত্বের অভিশাপ মাথায় নিয়ে ঘুরছেন? অর্থকষ্টে আপনার জীবনটাই নাজেহাল? জীবন-সমুদ্রে খুঁজে পাচ্ছেন না পথের দিশা? আপনার জন্য কুরআনের সমাধান—অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার।

আপনার ভালো ক্যারিয়ার চাই, ভালো জীবনসঙ্গী চাই, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল চাই—ইস্তিগফার! ইস্তিগফার! ইস্তিগফার!

আপনি যা হন্যে হয়ে খুঁজছেন, তার সামনে একটা দেওয়াল তৈরি হয়ে আছে। সেই দেওয়াল ভেদ করে কাঙ্ক্ষিত বস্তু আপনার কাছে আসতে পারছে না। তাহলে আপনার কাজটা কী? আপনার কাজ হলো বাধার সেই দেওয়ালটা ভেঙে দেওয়া, যাতে আপনি পৌঁছাতে পারেন আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। সেই দেওয়াল ভাঙার কাজে আপনার হাতে সবচাইতে যে মজবুত শাবলটি আছে তার নাম হলো ইস্তিগফার! ইস্তিগফারের এত ক্ষমতা যে জীবনে যদি একবার তার ফল পান, তাহলে বিস্ময়াবিভূত হয়ে যাবেন।

ইস্তিগফার বদলে দিতে পারে আপনার জীবন। আপনার জীবনে যা এতদিন কেবল স্বপ্ন ছিলো, আপনার অবারিত ইস্তিগফার সেগুলোকে রূপ দিতে পারে বাস্তবতায়। কল্পনাতেও যা আপনার কাছে ছিলো অসম্ভব, ইস্তিগফার আপনাকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে সেই সম্ভাবনার দুয়ারে।

মদিনায় একবার ভীষণরকম খরা দেখা দিলে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকজনকে নিয়ে বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেন। সেদিন কেবল ইস্তিগফার পাঠ করেই উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেমে গেলে অন্যরা তাকে প্রশ্ন করলো, 'ইয়া আমিরুল মুমিনিন, আপনি তো কেবল ইস্তিগফার পাঠ করেই থেমে গেলেন। অন্য কোনো দুআ তো আল্লাহর কাছে করলেন না।'

তাদের জবাবে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ইস্তিগফার দুআ কবুলের এমন

এক জায়গায় আঘাত হানে, যেখানে কোনো দুআ ব্যর্থ হয় না।'[১]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথাগুলো আপনার জীবনের জন্যও ভীষণরকম সত্যি। দুআ কবুলের সেই দরোজাটা আপনার জন্যও খোলা আছে, যেভাবে খোলা ছিলো উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য, মদিনাবাসীদের জন্য। সেই দরোজাটা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু চিনেছেন বলেই নিশ্চিন্তে বলতে পেরেছেন—'ইস্তিগফার দুআ কবুলের এমন এক জায়গায় আঘাত হানে, যেখানে কোনো দুআ ব্যর্থ হয় না।'

ইস্তিগফারের শক্তি তারা চিনেছেন, আমরা চিনবো কবে?

ছয়.

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দুটো ওয়াদা আছে। দুটো অবস্থায় তিনি আমাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না বলে জানিয়েছেন। একটা হলো যতক্ষণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে জীবিত আছেন, আর অন্যটা হচ্ছে—যতক্ষণ আমরা আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবো।

> *যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে আছেন (হে মুহাম্মাদ), ততক্ষণ আল্লাহ তাদের ওপর কোনো আযাব নাযিল করবেন না, এবং যতক্ষণ তারা ইস্তিগফার করতে থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহ তাদের আযাব দেবেন না।*[২]

দুটো সুযোগের একটা আমরা হারিয়েছি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে। যেহেতু তিনি আমাদের মাঝে নেই, সুতরাং প্রথম শর্তটাও আর বলবৎ থাকবে না, কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগটা আমাদের জন্য মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত খোলা। আল্লাহ বলছেন যে, আমরা যদি তাঁর কাছে অবারিত ইস্তিগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্যে থাকি, তাহলে আমাদের জীবনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো আযাব নেমে আসবে না।

---

[১] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ১৮; পৃষ্ঠা : ৩০২; *জামিউল আহাদিস* : ২৯৮৮৪; *আল-লুবাব ফি উলুমিল কিতাব*, খণ্ড : ১৯; পৃষ্ঠা : ৩৮৫

[২] সুরা আনফাল, আয়াত : ৩৩

আল্লাহর আযাব বড় কঠিন জিনিস! আল্লাহর ক্রোধে আপনার জীবন লন্ডভন্ড হয়ে যেতে পারে মুহূর্তেই। যে পাপের দরিয়ায় আপনি হাবুডুবু খাচ্ছেন, তার বিনিময়ে আল্লাহ যদি আপনাকে শাস্তি দিতে চান, তাহলে চোখের পলকে তিনি আপনার জীবনকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। আপনার জীবনে থাকা সুখ ছিনিয়ে নিতে পারেন, আপনার সম্পদ কেড়ে নিতে পারেন, ধূলিসাৎ করে দিতে পারেন আপনার মান-মর্যাদা। আপনার জীবনটাকে বিষিয়ে তুলতে আল্লাহর একটু অসন্তুষ্টিই যথেষ্ট।

তবে আপনি যদি ফিরে আসেন, যদি যাবতীয় ভুলের জন্য করজোড়ে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করেন, যদি অনুতপ্ত হোন, অনুশোচনায় যদি আপনি নত হতে পারেন, তিনি বলছেন—তাঁর আযাব তিনি আপনার ওপর আরোপিত করবেন না।

জীবনের বন্ধ দুয়ারগুলো খোলার জন্য আপনার হাতে একটা চাবি আছে। সেই চাবির নাম ইস্তিগফার। চাবিটা ব্যবহার করে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য আজ থেকেই তৎপর হয়ে পড়ুন। 'আস্তাগফিরুল্লাহ' শব্দটাকে বানিয়ে নিন জীবনের নিত্য সঙ্গী।

খেলাঘর পাতা আছে এই এখানে

এক.

আমেরিকার টাইম স্কয়ারের নাম আমরা প্রায় সবাই শুনে থাকবো। পৃথিবীর সবচাইতে ব্যস্ত এলাকার তালিকায় সম্ভবত টাইম স্কয়ার তার ঐতিহ্য আর আভিজাত্য নিয়ে সবার শীর্ষে অবস্থান করে আছে। রিপোর্ট অনুসারে—প্রতিবছর ৫০ মিলিয়ন মানুষ টাইম স্কয়ার পরিদর্শনে যায়!

তবে আমার ধারণা, ভার্চুয়াল পৃথিবীকেও যদি আমরা আমাদের 'পৃথিবী ধারণা'র আওতাভুক্ত করি, টাইম স্কয়ারের এই বি-শা-ল রেকর্ড নিমিষেই হাওয়া হয়ে যাবে! টাইম স্কয়ারের কিনারে বছরে ৫০ মিলিয়ন মানুষের পদচিহ্ন পড়ে কেবল, আর গ্লোবাল জরিপের মতে—সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর সংখ্যা একদিনেই বাড়ে ১.৪ মিলিয়ন করে! প্রতি সেকেন্ডে নতুন করে ১৬ জন ব্যবহারকারী প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে! সোশ্যাল মিডিয়ার এই রেকর্ডের সামনে টাইম স্কয়ারের রেকর্ড তো একমুহূর্তও দাঁড়াতে পারবে না।

দুই.

প্রযুক্তি বদলে দিয়েছে দুনিয়ার মোড়। এখন আমরা ঘরে বসেই আমেরিকার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করি, নাসার রকেট ছোঁড়ার দৃশ্য অবলোকন করি আর বন্ধুত্ব করি সুদূর সাইবেরিয়ার কোনো এক অপরিচিত মানুষের সাথে। প্রিয়জনের কাছে আমাদের

যে চিঠি পৌঁছাতে আগে লেগে যেতো মাসের পর মাস, এখন আমাদের সেই বার্তা পৌঁছে যায় একটা ক্লিকেই। সময় লাগে কয়েক ন্যানো সেকেন্ড। এক অর্থে জীবন এখানে বড্ড সহজ!

কিন্তু জীবন কি সত্যিই সহজ হলো?

মুঠোফোনে আমেরিকার নির্বাচন আমরা তদারকি করছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে মানুষটা জীবনসংগ্রামে পরাজিত হতে চললো, তার জীবনটাকে কাছ থেকে দেখবার ফুরসত আমাদের হাতে কই?

নাসার রকেট ছোঁড়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে হাত তালি দিয়ে আমরা বলছি, 'মানব-সভ্যতা আরো একধাপ এগিয়ে গেলো!'

মানবসভ্যতা এগুলো ঠিকই, কিন্তু দারিদ্রের ভারে নুইয়ে পড়া আমাদের সমাজটা, যে সমাজ না আগালে আমরা আগাতে পারি না, তা নিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তা কোথায়?

প্রযুক্তি দুনিয়াকে পুরে দিয়েছে আমাদের হাতের মুঠোয়। তবে একইসাথে, প্রযুক্তি আমাদের বন্দি করেছে মুঠোফোনের শেকলে। এখন আমাদের যাবতীয় আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, চিত্ত-বিনোদনের উৎস হয়ে উঠেছে স্মার্টফোন। ছবিতে, স্টোরিতে, স্ট্যাটাস-টুইটে দুনিয়াকে প্রতিনিয়ত অবহিত করছি আমাদের দৈনন্দিন হালচাল। প্রাইভেসির দুনিয়ায় এখন আমাদের সমস্তকিছুই যেন ওপেন-সিক্রেট!

তিন.

আমেরিকার বিখ্যাত পত্রিকা সিএনএন 'Being Thirteen' শিরোনামে একটা ক্যাম্পেইন চালিয়েছিলো। তেরো বছর বয়সীদের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের প্রবণতা কেমন, তা খতিয়ে দেখাই ছিলো ক্যাম্পেইনটার মূল উদ্দেশ্য। বলাই বাহুল্য—জরিপে উঠে আসা ফলাফল ছিলো রীতিমতো চমকপ্রদ ও ভয়ংকর! সেই ক্যাম্পেইনে তেরো বছরের এক কিশোরীকে জিগ্যেশ করা হয়, যদি তার হাতে থাকা স্মার্টফোনটা নিয়ে নেওয়া হয়, তার তখন কেমন অনুভূত হবে?'

জবাবে ওই কিশোরী বললো, 'প্রয়োজনে আমি টানা একসপ্তাহ খাবার খাবো না, কিন্তু স্মার্টফোন হাতছাড়া করতে আমি মোটেও রাজি নই।'

অন্য আরেকজন বললো, 'আমার হাতে যখন ফোন থাকে না, তখন আমার কাছে সবকিছু খালি খালি লাগে। কোথায় যেন বিরাট এক শূন্যতা কাজ করে তখন।'

স্মার্টফোন কিশোর-মনের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলছে, তা চিন্তা করলে রীতিমতো শিউরে উঠতে হয়। একজন কিশোরী টানা একসপ্তাহ কিছু না খেয়ে থাকবে, তবু স্মার্টফোন হাতছাড়া করতে সে একদম-ই রাজি নয়। এই প্রবণতাকে যদি আপনি 'নেশা' না বলেন, তাহলে নেশা বলতে ঠিক কী বোঝায় আমার জানা নেই।

আমার ধারণা, কেবল কিশোর শ্রেণি নয়, স্মার্টফোনের এই নেশা এখন মধ্যবয়স্ক, বয়স্কসহ আমাদের প্রায় সবার-ই। এই যে স্মার্টফোন-বিহীন দুনিয়াটাকে খালি খালি লাগে, আমাদের এই প্রবণতার পেছনে মূল কারণটা আসলে কী?

এক কথায় বললে—সোশ্যাল প্রোফাইল!

অনলাইন দুনিয়ায় অজান্তেই আমরা নিজেদের জন্য তৈরি করি একটা সোশ্যাল প্রোফাইল। সেই প্রোফাইল আমাদের টেনে ধরে রাখে ভার্চুয়াল জগতে। ধীরে ধীরে সেই প্রোফাইল ভারী হয় এবং আমরাও তাতে পুরোদস্তুর মজে যাই।

এই সোশ্যাল প্রোফাইল কীভাবে তৈরি হয়, তা জানার জন্য আমরা একজন মানুষের ভার্চুয়াল অ্যাক্টিভিটি কল্পনা করতে পারি। ভার্চুয়াল জগতে, তা হতে পারে ফেইসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, স্নাপচ্যাট, টিকটক বা লাইকি—তিনি যেদিন প্রথম অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন, সেদিনের তুলনায় তার আজকের অবস্থান পুরোপুরি ভিন্ন। সময়ের প্রেক্ষিতে তিনি এখানে ফলো করছেন অনেক প্রোফাইলকে এবং অনেক প্রোফাইল ফলো করছে তাকে। তার একটা পরিচয়ও এখানে দাঁড়িয়ে গেছে। এখানে তিনি হতে পারেন একজন ভালো লেখক, ভালো কবি, গায়ক অথবা ভালো বই পড়ুয়া, ভালো ভ্রমণ-পিয়াসু, ভালো রন্ধনশিল্পী, ভালো ফটোগ্রাফার, ভালো গ্রাফিক্স ডিজাইনার ইত্যাদি। এমনকি—অন্যের লেখাতে জুতসই, শিক্ষণীয় মন্তব্য করার কারণেও আস্তে আস্তে একটা সোশ্যাল পরিচিতির তকমা তিনি পেয়ে যান। তার মন্তব্য দেখলেই আমরা বুঝতে পারি যে—তার ভাবনা, চিন্তা এবং বুঝবার ক্ষমতা বেশ প্রখর।

আমি বলছি না যে, এই গুণগুলো খারাপ কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় এসবের বিকাশ যথেষ্ট সমস্যার; তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধারাবাহিক পরিচিতি আস্তে আস্তে

তার ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং একসময় এই পরিচিতিকে টেনে নিয়ে যেতে তাকে রাত-দিন এখানে বুঁদ হয়ে থাকতে হয়।

ধরা যাক, তিনি ফেইসবুকে একটা নাতিদীর্ঘ লেখা লিখলেন এবং তাতে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে মন্তব্য পেলেন। সাথে পেলেন অনেকগুলো লাইক। এ ধরনের আরো কন্টেন্ট তৈরিতে এই অর্জন তাকে অবশ্যই প্রলুব্ধ করবে এবং তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করবেন যে—তার কথা এবং চিন্তা মূল্য পেতে শুরু করেছে। যেহেতু তিনি অন্যদের নজর কাড়তে পারছেন, তাই এই বিশেষ নজরটাকে আরো বাড়াতে বা অন্তত ধরে রাখতে তিনি সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষের নজর কাড়তে বা আলোচনায় থাকতে তার এই যে পরবর্তী প্রবণতা, বিজ্ঞান জানাচ্ছে, এটা হয় মস্তিষ্ক থেকে এক ধরনের হরমোন নিঃসরণের কারণে। পাঁচটা লাইককে দশটা করবার জন্য, দুটো মন্তব্যকে চারটে করার জন্য, ব্যাপক প্রশংসিত হবার জন্য তখন তার ভেতরে একটা প্রবণতা কাজ করে। এই প্রবণতাকে অনেকসময় সরাসরি বোঝা যায় না। মনে করা হয়—আমি তো নতুন কিছু শিখছি, নতুন কিছু শেখাচ্ছি, নতুন কিছু জানছি।' নতুন কিছু শেখা, শেখানো আর জানার ভেল্কিতে প্রলুব্ধ হয়ে তাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটাতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। স্ক্রল করতে হয় মাইলের পর মাইল, কিন্তু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে—সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করে পুরোদিনে একজন ব্যক্তি যা-কিছু শেখে, তা খুবই সামান্য এবং ওই সামান্য জ্ঞানটার প্রভাবও তার জীবনে খুবই ক্ষণস্থায়ী।

এটা কেন হয় সেটাও আমি ব্যাখ্যা করছি।

ধরা যাক, একজন ব্যক্তি ফেইসবুকে দশজন লোককে ফলো করেন। যে দশজনকে তিনি ফলো করেন, সেই দশজন যে একই সময়ে এবং একই বিষয়ে লিখবে—তা কিন্তু বলা যায় না। এমনটা সম্ভবত কদাচিৎও ঘটে না। কারণ ব্যক্তি বিশেষের আগ্রহ অবশ্যই আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। দেখা যায়, ওই দশজনের কেউ কুরআন-হাদিসের কথা লেখে, কেউ লেখে রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে। কারো লেখাজোকা হয় খেলাধুলাকেন্দ্রিক। কেউ চর্চা করে দর্শন আর কেউ হয়তো-বা আগ্রহ পায় বিজ্ঞানে বা সাহিত্যে। ওই লোক যখন ফেইসবুক স্ক্রল করে, তখন তার নিউজফিডে এই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের, ভিন্ন ভিন্ন ভাবনার লেখাজোকা এসে হাজির হয়। কুরআন-হাদিসের লেখাটা পড়ার পরে তার সামনে আসে দর্শনের আলাপ। দর্শনের আলাপ

শেষ হলে আসে রাজনীতির মারপ্যাঁচ। রাজনীতি পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর সামনে এসে হাজির হয় বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা। বিজ্ঞান বিদেয় নিলে আসে সাহিত্য আর সাহিত্যের পাঠ চুকা মাত্রই সেখানে খেলাধুলা ঢুকে পড়ে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো বিষয় যখন সামনে চলে আসে, তখন কোনো আলোচনার সারবস্তুই যে আসলে মাথায় ঢুকবে না—সেটাই স্বাভাবিক। একসাথে এতগুলো বিষয় পড়তে গিয়ে কোনো বিষয়ই ভালোভাবে পড়া হয় না। পড়লেও তা হয় নেহাতই চোখ বোলানো। এটা তো দশজন ব্যক্তিকে ফলো করলে যা অবস্থা হবে, তার হিশেব; বস্তুত সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা শয়ে শয়ে মানুষকে ফলো করি। আমাদের নিউজফিড নানান তথ্য, নানান বিষয় আর হরেক রকমের আলোচনায় যে ভর্তি থাকে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এতসব মানুষের এত এত লেখাজোকা, এত এত আলোচনা পড়তে গিয়ে আমরা নিজেদের অজান্তেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি এবং কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে তখন মস্তিষ্কে আলাদা জায়গা দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। সকালবেলা যে ভালো ব্লগটা পড়া হয় বা যে ভিডিও দেখে কোনো একটা কিছু শেখবার তাড়না কাজ করে মনে, টানা নিউজফিড স্ক্রল করার পর সেই ভালো ব্লগটার বিষয়বস্তুই মস্তিষ্ক থেকে হারিয়ে যায় অথবা নষ্ট হয়ে যায় ভিডিও দেখে পাওয়া স্পৃহাটুকুও।

মাত্রাতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার দিনশেষে আমাদের যা দুহাত ভরে দেয় তা হলো—একরাশ ক্লান্তি। মাইলের পর মাইল হাঁটলে আমরা যেমন শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, মাইলের পর মাইল নিউজফিড স্ক্রল করার পর আমাদের মস্তিষ্কও সেরকম ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর এই ক্লান্তি ধীরে ধীরে রূপ নেয় একটা মানসিক সমস্যায়।

আপনি হয়তো ভাবছেন—মাত্রাতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার থেকে কীভাবে মানসিক সমস্যা তৈরি হয়, তাই তো? এটা নিয়েও বিস্তর গবেষণা হয়েছে।

ওপরে আমরা 'সোশ্যাল প্রোফাইল' তৈরি এবং তা কীভাবে একজন মানুষকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বুঁদ করে রাখে, তা সম্পর্কে বলেছি। এই সোশ্যাল প্রোফাইলকে টেনে নিয়ে যেতে, সেটাকে দিনের পর দিন আরো ভারী, আরো পোক্ত করে তুলতে এক অনিঃশেষ তাড়না কাজ করে মনে; কিন্তু কোনোভাবে যদি সেই সোশ্যাল প্রোফাইল তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটে বা ঠিক যে লক্ষ্যমাত্রায় নিজেকে কল্পনা করা হয়, তা যদি অর্জন না করা যায়, তখন একটা মানসিক চাপ অনুভূত হয়। নিজেকে

মনে হয় পরাজিত। মানুষ তখন নিজেকেই সন্দেহ করতে শুরু করে। ভাবে তার সৃজনশীলতার বুঝি অবনতি হচ্ছে। তাকে সম্ভবত মানুষজন আর পছন্দ করছে না। তার কন্টেন্ট দিয়ে সে বুঝি আর লোকজনকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। এ ধরনের এক হতাশাবোধ তাকে তখন তাড়িয়ে বেড়ায় এবং সেটা শেষ পর্যন্ত রূপ নেয় এক ভয়ংকর মানসিক বৈকল্যে। মানসিক অবস্থার এই পর্যায়ে চারপাশের সবাইকে এবং সবকিছুকে তার বিরক্ত লাগে।

খেয়াল করলে দেখবেন—সোশ্যাল মিডিয়ায় মাত্রাতিরিক্ত আসক্ত কাউকে যখন খেতে ডাকা হয়, অধিকাংশ সময়েই হয় সে নিরুত্তর থাকে অথবা বেশ বিরক্তিভরে সে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। শুধু খাওয়ার বেলাতেই নয়, সোশ্যাল নেটওয়ার্কের বাইরের কোনো কাজে সে আর উৎসাহ পায় না। তার মন চায়—কত দ্রুত কাজ শেষ করে স্মার্টফোন হাতে নেওয়া যাবে আর ডুব দেওয়া যাবে নীল-শাদার জগতে।

সোশ্যাল মিডিয়া আরো একভাবে হতাশা আর মানসিক অস্থিরতা তৈরি করে মানুষের মনে। গবেষকরা সেটাকে বলছেন FOMO (Fear Of Missing Out). অর্থাৎ, সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত একজন ব্যবহারকারীর মনে সর্বদা এই ভয় কাজ করে যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটু অনুপস্থিত থাকলে দুনিয়ার কী না কী সে বুঝি মিস করে ফেলে!

দুনিয়ার কোথায় কী ঘটলো, কার কী হলো, কে কী করলো—এসবকিছুর সাথেই সে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে চায়। কোনো সংবাদ, কোনো ঘটনা, কোনো ইস্যু সে মিস করে যেতে চায় না। এই 'না চাওয়া' প্রবণতাই তাকে টেনে ধরে রাখে নীল-শাদার দুনিয়ায়। যদি কোনোভাবে সে সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতে না পারে কিংবা কোনো কারণে যদি তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ডাউন হয়ে যায়, এক ভীষণ মানসিক অস্থিরতা তখন তাকে পেয়ে বসে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতে না পারার ফলে তার মনে হয়, সে বুঝি দুনিয়া থেকেই ছিটকে পড়েছে। ঘটনার স্রোত থেকে ছিটকে পড়ার এই ভয়টাকেই গবেষকরা Fear Of Missing Out বলে অভিহিত করছেন।

চার.

আমার একবার জানতে ইচ্ছে হলো—এই যে সোশ্যাল মিডিয়াকে ঘিরে আমাদের এই নেশা, এই উন্মত্ত উন্মাদনা, দিন-রাত এক করে এখানে বুঁদ হয়ে থাকা, আমাদের অবস্থাই যদি এমন হয়, এসব মিডিয়া যাদের হাতে গড়া, তাদের অবস্থা

না জানি কী হবে! এমন কৌতূহল থেকেই আমি টেক-জায়ান্টদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে এসবের ভূমিকা নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলাম। ফলাফল হিশেবে যা পেলাম, তাতে আমি একেবারে থ!

প্রযুক্তি-দুনিয়ায় যাকে প্রথম সারির একজন ধরা হয়, সেই অ্যাপল ব্রান্ডের সিইও স্টিভ জবসের বরাতে জানা যায়, তার শিশুরা আইপ্যাড ব্যবহারের ক্ষেত্রে কখনোই স্বাধীন ছিলো না। অর্থাৎ, ইচ্ছে হলেই শিশুরা আইপ্যাড নিয়ে বসে যেতে পারতো না বা সারাদিনমান আইপ্যাডে বুঁদ হয়ে থাকতে পারতো না। প্রতিদিন কত সময় তারা আইপ্যাড ব্যবহার করতে পারবে, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিলো। এমনকি, রাতে খাওয়ার টেবিলে কোনো প্রকার ডিভাইস যাতে পরিবারের কারো হাতে না থাকে, সেদিকে থাকতো স্টিভ জবসের সজাগ দৃষ্টি। ওই সময়টায় এই টেক-বস শিশু এবং পরিবারের সবার সাথে মুখোমুখি কথা বলতে পছন্দ করতেন। আলাপ করতেন বিভিন্ন বই নিয়ে, বিজ্ঞান নিয়ে, ইতিহাস নিয়ে।

গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই-ও জানাচ্ছেন একই কথা। তার ঘরে শিশুদের জন্য ডিভাইস ও টেলিভিশন উন্মুক্ত নয়। কোনো রাখঢাক না রেখেই এই টেক-জায়ান্ট জানাচ্ছেন—এই কাজ তিনি তার শিশুদের ভালোর জন্যই করে থাকেন।

অ্যাপলের স্টিভ জবস বা গুগলের সুন্দর পিচাই কেবল নয়, মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের ব্যাপারেও একই কথা। তার শিশুদের জন্যও স্ক্রিন-টাইম ছিলো যথেষ্টই সীমিত। ইউটিউবের সিইও এবং রেড্ডিটের প্রতিষ্ঠাতারাও তাদের শিশুদের স্ক্রিন-টাইম নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক। স্ন্যাপ-চ্যাটের প্রতিষ্ঠাতা ইভান স্পাইগেল তো তার শৈশব-কৈশোরে মোবাইল ফোন-ই হাতে পাননি এবং তার আজকের সফলতার পেছনে ছোটোবেলার ডিভাইস-ফ্রি লাইফের যথেষ্ট ভূমিকা আছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি নির্ধারণ করেছেন—তার শিশু সপ্তাহে সব মিলিয়ে কেবল দেড় ঘণ্টা স্মার্ট-ডিভাইস ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

আমি আশ্চর্য বনে যাই—যেসব মানুষ তাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দিয়ে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষকে স্ক্রিনে বুঁদ করে রাখছে, তারা কেন নিজেদের এবং তাদের শিশুদের স্ক্রিন-টাইম নিয়ে এতখানি সতর্ক? এর পেছনের রহস্যটা কী? স্ক্রিনের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে যারা ভাবছি যে, অনেক কিছুই আমরা শিখে ফেলছি, আমাদের মতো করে কেন ভাবতে পারেন না এসব স্ক্রিন কারিগরেরা?

কেন স্টিভ জবস তার শিশুকে আইপ্যাডের সামনে অবাধে ছেড়ে দিতে রাজি হন না? কেন ইউটিউবের সিইও তার শিশুদের ইউটিউবের সামনে বুঁদ হয়ে থাকতে বলেন না? কেন গুগলের সিইও তার শিশুদের ডুবে যেতে দেন না গুগলের সীমানাহীন তথ্য ভান্ডারে?

সচেতন পাঠক, এর একটাই কারণ—এখানে আপনি যতখানি না শেখার জন্য সময় ব্যয় করেন, তারচে বেশি সময় ব্যয় করেন আসক্তির কারণে। এসব সোশ্যাল মিডিয়ার এলগরিদম এমনভাবেই সাজানো, যাতে আপনি অনেক বেশি সময় এখানে কাটাতে বাধ্য হন। আপনি বাঁধা আছেন এক অদৃশ্য শেকলে। শেকলে বন্দিবস্থাকে দুনিয়ার কেউ ভালোবাসে না, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া যে শেকল আপনার পায়ে পরায়, তা অন্যসব শেকলের চাইতে আলাদা। এই শেকলকে আপনি নিজের অজান্তেই ভালোবেসে ফেলেন। তাই তো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকতে না পারলে আপনি অস্থির হয়ে যান। আপনি ভাবেন—আপনার দুনিয়া বুঝি থমকে গেলো!

পাঁচ.

এটা সত্য যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি থাকলেও আমরা যে আদৌ আসক্ত, তা বুঝতে বা শনাক্ত করতে আমরা অধিকাংশই ব্যর্থ হই। এই আসক্তিটা আমাদের জীবনে এতখানি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়—সেটাকে কখনো সন্দেহের চোখে দেখার কিংবা সেটা নিয়ে একটু উদ্বিগ্ন হওয়ার চিন্তা আমাদের মাথায় কখনোই আসে না। সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তিটা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের রুটিন আর স্বাভাবিক অনেক রুটিন আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন থেকে।

আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি যে আসক্ত তা বুঝবেন কীভাবে, তাই তো? প্রশ্নটা আপনার একার নয়, দুনিয়ার অনেক-মানুষের। অনেক সাইকোলোজিস্ট, থেরাপিস্ট এবং ডিজিটাল-ডিটক্স নিয়ে কাজ করছে এমন অনেক গবেষক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির অনেকগুলো লক্ষণ বিদ্যমান, কিন্তু সেসবের মধ্যে ভয়ানক পর্যায়ের কিছু লক্ষণ আছে, যা দেখে আপনি আঁচ করতে পারবেন যে, আপনার সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির পর্যায় কতখানি।

সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর স্মার্টফোনটার কথাই যদি সর্বাগ্রে আপনার মনে আসে এবং বিছানায় থাকাবস্থাতেই যদি আপনি ফেইসবুক, ইউটিউব, টুইটার বা

ইনস্টাগ্রাম স্ক্রল করবার তাড়না অনুভব করেন, তাহলে ধরে নিতে পারেন যে, আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ভালো রকমের আসক্ত।

ধরুন, আপনি কোনো কাজ করছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফোন চেক করবার, নোটিফিকেশন চেক করবার তাড়না অনুভব করেন কি? ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে কাজ করার সময় আপনি কি আলাদা ট্যাবে ফেইসবুক খুলে রাখেন, যাতে খানিক পর পর আপনি সেখানে ঢুঁ মারতে পারেন? যদি আপনার মাঝে এই অভ্যাসটা থাকে, তাহলে তা সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির অন্যতম লক্ষণ।

ধরুন, এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন যে, আপনি কোনোভাবে ফেইসবুকে ঢুকতে পারছেন না। হয়তো আপনার ফোনে ডাটা নেই অথবা ফেইসবুকের নিজস্ব কারিগরি সমস্যার কারণে ফেইসবুকে ঢুকতে আপনার সমস্যা হচ্ছে কিংবা এমনও হতে পারে—কোনো কারণে ফেইসবুক আপনার অ্যাকাউন্টটাকে সাসপেন্ড করে দিয়েছে। ভাবুন তো, ওই নির্দিষ্ট সকালটা আপনার কেমন কাটবে? নিশ্চয় একরাশ বিরক্তি আর অস্থিরতায়। সেদিনের স্বাভাবিক সবকিছুকে আপনার বিরক্তিকর মনে হবে। কখন আপনি পুনরায় ফেইসবুকে ফেরত যেতে পারবেন আর কীভাবে সাসপেন্ড হওয়া অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে আনতে পারবেন—এমন চিন্তায় বিক্ষিপ্ত থাকবে আপনার মন। খিটখিটে হয়ে থাকবে মেজাজ-মর্জি। এই ঘটনা যদি আপনার সাথে ঘটে থাকে বা ঘটবার আশংকা থাকে, ধরে নিতে পারেন যে, আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরালোভাবে আসক্তদের একজন।

কোথাও বেড়াতে গেলে বা পরিবার আর বন্ধুদের সাথে সুন্দর সময় কাটানোর অনেক অনিন্দ্য সুন্দর মুহূর্তকে নিশ্চয় আপনি ক্যামেরাবন্দি করেন, তাই না? এসব মুহূর্তকে ক্যামেরা-বন্দি করার সময় আপনার মনে কি বারংবার সোশ্যাল মিডিয়ার কথা ভেসে ওঠে? এই ছবিগুলোকে কত বাহারি ক্যাপশানে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করবেন, তাতে কাকে কাকে ট্যাগ করবেন, সেসব দেখে অন্যদের কী প্রতিক্রিয়া হবে—এসব চিন্তা কি আপনার ভাবনা-জগতে এসে দোলা দেয়? উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায়, আপনি একজন সোশ্যাল মিডিয়া আসক্ত ব্যক্তি।

ফেইসবুক-টুইটার-ইনস্টাগ্রামে দেওয়া পোস্টগুলো ঘন ঘন তদারকি করার প্রবণতা কি আপনার মাঝে বিদ্যমান? অর্থাৎ, আপনার লেখা বা ছবিগুলোতে কতগুলো লাইক-কমেন্ট পড়লো, কে কী মন্তব্য করলো, তা দেখার জন্য সারাক্ষণ কি আপনার

মন আকুপাকু করে? যদি তা সত্য হয়, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির ছোবল থেকে নিরাপদ নন আপনিও।

মাঝে মাঝে আপনার মনে হয়, যেন আপনি নোটিফিকেশনের শব্দ শুনতে পেলেন মাত্র, কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে—আপনার সাথে বা আপনার আশেপাশে কোনো স্মার্টফোন-ই নেই। কেন এমন হয় জানেন? কারণ নোটিফিকেশনের শব্দে আপনার এমন অভ্যস্ততা চলে আসে যে, আপনার অবচেতন মন সর্বদা সেই শব্দকে আশা করে থাকে। এমনটা যদি আপনার সাথে হয়ে থাকে, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির ব্যাপারে আপনাকে জরুরিভাবে ভাবতে হবে।

ফেইসবুকে কী লিখবেন, ইনস্টাগ্রামে কোন ছবিটা ছাড়বেন, টুইটারে কোন বিষয়ে পোস্ট করবেন, তা নিয়ে যদি আপনি আগাম ভাবনা-চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন এবং এর পেছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন, তাহলে ধরে নিতে পারেন যে, সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির কোনো একটা পর্যায়ে আপনি ইতোমধ্যেই হাঁটতে শুরু করেছেন।

তাছাড়া বন্ধুদের সাথে কোথাও ঘুরতে যাওয়া বা আড্ডা দেওয়ার চাইতে যদি আপনি সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিংকে বেশি পছন্দ করেন, পরিবারের কোনো কাজ সুচারুরূপে করার চেয়ে ফেইসবুকে পোস্ট পড়াটা যদি আপনার কাছে অধিক গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়া আপনার জীবনে নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিশ্চিত।

আপনার এসাইনমেন্টটা যদি সঠিক সময়ে শেষ না করতে পারেন, যদি সঠিক সময়ে ক্লাশে উপস্থিত না থাকতে পারেন, যদি কাজে যেতে আপনার প্রায় প্রত্যেকদিন দেরি হয়ে যায়, যদি আপনার ক্লাশের বা কাজের মান দিনের পর দিন কেবল খারাপ-ই হতে থাকে, যদি আপনি নতুন কিছু শেখবার জন্য সময় না করতে পারেন, যদি আপনি পরিবারে সময় দিতে হিমশিম খান—আপনার উচিত হবে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার সময় ব্যয়ের দিকটাকে খতিয়ে দেখা। আস্তে আস্তে জীবনের গতি থেকে ছিটকে পড়ার আসল কারণ আপনি হয়তো এখানেই পেয়ে যাবেন।

ছয়.

ইনসমোনিয়ার রোগীদের কথাবার্তা শুনলে আপনার খুবই কষ্ট হবে। রাতে একটু আরাম করে ঘুমোতে না পারার যে কী যন্ত্রণা—এটা কেবল তারাই জানে, যাদের নির্ঘুম রাত কাটে! যারা হাজার চেষ্টা করেও চোখের তারায় নামাতে পারে না

একবিন্দু ঘুমের রেশ। রাতে একটু ঘুমোনোর জন্য তারা কত কত ডাক্তারের চেম্বারে, কত প্রকারের ওষুধ আর কত ধরনের চেষ্টা-তদবির যে করেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

প্রযুক্তি-বিস্ফোরণের এই যুগে এখন আমরা প্রায় সকলেই ইনসমোনিয়ার রোগী। ইনসমোনিয়ার রোগীদের সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য হলো এই—তারা ঘুমোনোর চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারে না, আর আমরা ঘুমোনোর চিন্তা বাদ দিয়ে রাতভর সোশ্যাল মিডিয়ায় বুঁদ হয়ে থাকি।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের জন্য আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে স্মার্টফোন আছে। বলাই বাহুল্য—এই স্মার্টফোনের স্ক্রিন থেকে বিচ্ছুরিত হয় একধরনের নীল আলো এবং এই নীল আলোই এখন আমাদের জন্য এক নীরব ঘাতকে পরিণত হয়েছে।

ব্যাপারটা বোঝার জন্য আপনাকে ঘুমের চক্রটা বুঝতে হবে। ঘুম আমাদের শরীরের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় এবং মানবসভ্যতা টিকে থাকার অন্যতম অনুষঙ্গ। আমাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপে যদি ঘুমের বন্দোবস্ত না থাকতো, তাহলে মানবসভ্যতা কোনোদিনও টিকে থাকতে পারতো না। স্নায়ুতন্ত্র আছে এমন কোনো প্রাণীই ঘুমহীন বেঁচে থাকতে পারে না। ঘুম একপ্রকার অক্সিজেন গ্রহণের মতোই জরুরি।

আমাদের মস্তিষ্কে ঘড়ির মতো একটা অনন্য অসাধারণ প্রযুক্তি দিয়ে রেখেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়—'সার্কেডিয়ান রিদম।' প্রতিদিনকার চব্বিশ ঘণ্টা সময় অনুসারে মস্তিষ্ক থেকে এই ঘড়ি শরীরের বিভিন্ন অংশে নানান সংকেত পাঠায় এবং শরীর সে মোতাবেক কাজ সম্পাদন করে। আমাদের ঘুমের জন্যও এই ঘড়িটা সংকেত তৈরি করে। মস্তিষ্ক থেকে মেলাটোনিন নামের একপ্রকার হরমোন নিঃসরণ হলেই আমাদের চোখে ঘুমের আবেশ এসে ভর করতে থাকে।

তবে মস্তিষ্ক কখন মেলাটোনিন হরমোন নিঃসরণ করবে তা নির্ভর করে সার্কেডিয়ান রিদম তথা আমাদের মস্তিষ্কে থাকা সেই ঘড়ির সংকেতের ওপরে। সেই ঘড়ির সংকেত পেলেই কেবল মস্তিষ্ক মেলাটোনিন নিঃসরণের কাজ আরম্ভ করে দেয়; কিন্তু সার্কেডিয়ান রিদম বা সেই ঘড়িটা কখন বুঝবে যে এখন মেলাটোনিন নিঃসরণের সময়? ঘড়িটা তা বুঝতে পারে আলোর উপস্থিতির ওপর

ভিত্তি করে। অর্থাৎ, সার্কেডিয়ান রিদম যখন দেখে যে, আপনার চারপাশে আলোর উপস্থিতি ক্রমেই কমে আসছে, ফিকে হয়ে আসছে আলোর বিচ্ছুরণ, তখন সে বুঝতে পারে যে—রাত নামছে। রাত যেহেতু নামছে, সারাদিন কর্মব্যস্ততায় থাকা শরীরের অঙ্গগুলোর এখন একটু বিশ্রাম দরকার। আলোর অনুপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে সার্কেডিয়ান রিদম মস্তিষ্কে সংকেত প্রেরণ করে—এখন রাত হয়েছে এবং ঘুমের জন্য মেলাটোনিন তৈরি করা দরকার। এই সংকেত পেয়ে মস্তিষ্ক মেলাটোনিন হরমোন নিঃসরণ শুরু করে এবং তা আস্তে আস্তে আমাদের চোখে এনে দেয় ঘুমের আবেশ। একসময় আমরা বিছানায় গা এলিয়ে দিই এবং আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি গভীর নিদ্রায়।

কিন্তু অতীব দুঃখের কথা হলো এই—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের শরীরে যে প্রাকৃতিক পদ্ধতি দিয়ে রেখেছেন, আধুনিক প্রযুক্তির কারণে তা নানানভাবে ব্যাহত হচ্ছে আজকাল। ঘুমের জন্য আমাদের শরীরে থাকা এই প্রাকৃতিক পদ্ধতি আজ স্মার্টফোনের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত-প্রায়।

স্মার্টফোন ব্যবহারের মাত্রা এবং তাতে নিবিড়ভাবে বুঁদ হয়ে থাকার পরিমাণ রাত হলেই বাড়ে। রাতে যেহেতু আমাদের হাতে কোনো কাজ থাকে না, তাই রাতের সময়টাতে আমরা ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ও ইউটিউবে বিচরণ করি বেশি। বিছানায় শুয়ে একেবারে চোখের অতি-নিকটে স্মার্টফোন ধরে রাখাটা এখন আমাদের নিত্যকার অভ্যাস। এতে করে কী হয় জানেন? স্মার্টফোন থেকে বিচ্ছুরিত হওয়া নীল আলোর কারণে আমাদের মস্তিষ্কের সেই ঘড়ি তথা সার্কেডিয়ান রিদম বিভ্রান্ত হয়। এই নীল আলোর কারণে সে বুঝতে পারে না যে—এখন কি রাত না দিন। তার হিশেব মতে তখন রাত-ই হওয়ার কথা, কিন্তু বিচ্ছুরিত নীল আলো তাকে মস্তিষ্কে মেলাটোনিন নিঃসরণের সংকেত প্রদানে বাঁধা দেয়। সে ধরে নেয় এখনো রাত নামেনি, দিন-ই আছে। সুতরাং, মস্তিষ্কে মেলাটোনিন নিঃসরণের সংকেত পাঠানোর বদলে সে শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধির সংকেত দেয়, কোষে শক্তি বাড়ানোর সংকেতসহ সে এমন সংকেত মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে থাকে, যা সে মূলত দিনের বেলা দিয়ে থাকে। ফলে, সার্কেডিয়ান রিদমের এমন সংকেত পেয়ে আমাদের মস্তিষ্ক দিনের মতোই সক্রিয় হতে শুরু করে দেয়। দিনের বেলায় যেহেতু আমরা শারীরিক আর মানসিকভাবে কাজে লিপ্ত থাকি, তাই দিনে মস্তিষ্কের এমন সংকেত খুব স্বাভাবিক ও উপকারী, কিন্তু রাতে যেহেতু আমাদের কোনো কাজ করতে হয় না সাধারণত, তাই রাতে মস্তিষ্কের এমন সংকেত আমাদের

জন্য সবিশেষ উপকারী নয়; বরং রাতে আমাদের জন্য যা দরকারি—একটা নিবিড় ঘুম—সেটাকেই এই নীল আলো ব্যাহত করে রাখে। মস্তিষ্ক যখন মেলাটোনিন নিঃসরণের সংকেত পায় না, তখন আমাদের চোখেও আর ঘুম নামে না।

সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করতে করতে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন রাত প্রায় শেষ হয় হয় অবস্থা। মোবাইল ছেড়ে তখন আমরা ঘুমানোর চেষ্টা করি আর সার্কেডিয়ান রিদমকেও সুযোগ করে দিই মেলাটোনিন নিঃসরণের সংকেত তৈরির। তবে এই অভ্যাস আস্তে আস্তে আমাদের শরীরের ও জীবনের ওপর ফেলতে শুরু করে বিরূপ প্রভাব।

আপনি হয়তো বলতে পারেন, রাতে কম ঘুমালেও কী হবে, দিনের বেলা পর্যাপ্ত ঘুমিয়ে কেউ তা পুষিয়ে দিলেই হয়, কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ সত্য নয়। রাতটা মূলত ঘুমের জন্যই নির্দিষ্ট করা। দিনের বেলা প্রকৃতির বিস্ফোরিত আলো, পাখ-পাখালির গুঞ্জন, চারপাশে মানুষের হই-হুল্লোড়, গাড়ির হর্ন ইত্যাদি আপনাকে ঠিক সেভাবে ঘুমোতে দেবে না, যেভাবে ঘুমোনোর সুযোগ আপনি রাতের বেলা পেয়ে থাকেন। রাতের বেলা প্রকৃতিজুড়ে এক স্নিগ্ধ আবেশ বিরাজ করে, যা ঘুমের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। রাতে যেহেতু চারপাশের আলো অনেকখানি নিভে আসে, মানুষেরাও ঘুমিয়ে পড়ে এবং পশু-পাখি আর পাখ-পাখালিও ঘুমিয়ে থাকে, তখন ঘুমের জন্য তৈরি হয় এক অসাধারণ পরিবেশ। এমন শান্ত পরিবেশে আপনার যে ঘুম হবে, তার সাথে দিনের কোলাহল আর ঝঞ্ঝাটময় পরিবেশে ঘুমের কোনো তুলনাই হয় না।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাপারটা সত্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে বলেছেন তিনি নিদ্রাকে আমাদের বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছেন, রাতকে করেছেন আবরণ আর দিনকে প্রস্তুত করেছেন জীবিকা তালাশের জন্য।[১]

স্মার্টফোনের বদৌলতে আমাদের ঘুমের চক্রে এই যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বা হচ্ছে, তা কীভাবে আমাদের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে জানেন? হার্ভার্ডের এক গবেষণা থেকে জানা যায়, স্মার্টফোন থেকে বিচ্ছুরিত আলোর কারণে যারা রাতে পর্যাপ্ত ঘুমায় না, ধীরে ধীরে তারা ডায়াবেটিস, অবসাদ, হৃদরোগসহ নানান রোগের দিকে এগিয়ে যায়।

---

[১] সুরা নাবা, আয়াত : ৯-১১

তাছাড়া অপর্যাপ্ত ঘুম আমাদের মানসিক সমস্যারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন একজন লোকের কথা ভাবা যাক, যাকে প্রতিদিন সকাল সাতটায় অফিসে হাজির থাকতে হয়। সাতটায় অফিস করার জন্য অন্ততপক্ষে তাকে সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে জাগতে হবে। অফিসে যাওয়ার জন্য গোসল, খাওয়া-দাওয়া, প্রস্তুতি সারার জন্য এই সময়টা তার অবশ্যই দরকার। এখন সারারাত ফেইসবুক স্ক্রল করে কিংবা ইউটিউব ব্রাউজিং করে যদি সে ঘুমোতেই যায় রাত দুইটায়, চোখে ঘুম আসতে যদি তার আধা ঘণ্টাও সময় লাগে, সব মিলিয়ে তার ঘুম হয় কেবল তিন ঘণ্টা। মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে পরের দিন যখন সে অফিসে যাবে, তখন তার দিনটা কাটবে খুবই নাজুকভাবে। চোখে ঘুম ঘুম ভাব থাকবে, কাজে মন বসবে না, মনোযোগ বিচ্ছিন্ন থাকবে, মেজাজ খিটখিটে থাকবে ইত্যাদি। ঘন ঘন চা-কফি খেয়ে যতই সে শরীরকে চাঙা করার চেষ্টা করুক, অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে কর্মক্ষেত্রে ভুগতে তাকে হবেই।

সাত.

সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি আমাদের জীবনে বয়ে আনতে পারে সমূহ বিপদ এবং এই বিপদের খেসারত হতে পারে ভীষণ ভয়াবহ। এই নেশা আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে আমাদের জীবনটাকে বিপর্যস্ত আর বিধ্বস্ত করে দেওয়ার আগে আমাদের উচিত হবে এই ডিজিটাল ড্রাগের কবল থেকে যত দ্রুত পারা যায় বের হয়ে আসা। ধীরে ধীরে নেশার যে চক্র আমরা গড়ে তুলেছি, সেটাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে না পারলে আমাদের গুনতে হবে কঠিন মাশুল।

ভাবছেন, কীভাবে ভাঙবেন এই নেশার শেকল, তাই না?

এই মিছিলে আপনি একা নন, ডিজিটাল এই ড্রাগের নেশা থেকে বাঁচতে এখন মরিয়া দুনিয়ার হাজার-কোটি মানুষ। এই নেশা থেকে মুক্তির জন্য বিশেষজ্ঞরা বাতলাচ্ছেন এমন কিছু উপায় আমি আপনাকে শোনাতে পারি।

সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির কবল থেকে বাঁচতে সবার আগে আপনাকে একটু নিজেকে নিয়ে বসতে হবে। কোনো এক শান্ত বিকেলে পুকুর-ঘাটে বসে কিংবা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এক কাপ কফি খেতে খেতে চিন্তা করুন তো—এই যে মাইলের পর মাইল ফেইসবুক স্ক্রলিং, ইউটিউব ব্রাউজিং, এসব আপনার জীবনে ঠিক কতটুকু দরকারি? কী হবে যদি আপনি রোজ পাঁচ ঘণ্টা ফেইসবুক ব্যবহার না করেন? যদি প্রতিদিন

দুই-দেড়শো ইউটিউব ভিডিও আপনি না দেখেন, আপনার জীবনের কোথাও কি কোনো ব্যাঘাত ঘটবে?

প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টা ফেইসবুক চালানোর ফলে আপনার স্বাভাবিক জীবনের যে ছন্দপতন, জীবনের সেই ছন্দের চাইতে ফেইসবুক আর ইউটিউব বেশি গুরুত্বপূর্ণ? মাত্রাতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির কারণে আপনি আপনার পরিবারে ভালোমতন সময় দিতে পারছেন না, আপনার বাবা-মা'র দিকে খেয়াল দিতে পারছেন না, আপনার শিশুদের নিয়ে খেলাধুলোর সুযোগ পাচ্ছেন না—এসবকিছুর চেয়ে আপনার সোশ্যাল-জীবনটা কখনো কি বেশি প্রাধান্য পাওয়ার দাবি রাখে?

আমি জানি, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে বসলে আমাদের প্রত্যেকের মন একটাই উত্তর দেবে—'সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির চাইতে আমার পরিবার, আমার কাজ, আমার জীবন অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

এই গুরুত্বটা যদি আপনি উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে নেশার এই চক্র ভেঙে দেওয়া আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে। আপনার মন যদি এই নেশা থেকে বেরোনোর ব্যাপারে সায় দেয়, তাহলে এই অধ্যায়ের পরের অংশটুকু আপনার জন্য।

আট.

সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি থেকে বের হওয়ার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী যে পন্থা তা হলো—এটা ছাড়াও যে জীবন চলে, এখানে না আসলেও যে আপনি বাঁচবেন, এখানে ঢুঁ না মারলেও যে আপনার ভালো একটা দিন কাটবে, তা বিশ্বাস করতে পারা। এই বিশ্বাস অর্জনের জন্য আপনাকে একটা কাজ করতে হবে—সপ্তাহে অন্তত একটা দিন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিটের জন্যও না। আপনাকে স্থির করতে হবে যে—সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট দিন আপনি কোনোভাবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আসবেন না।

কাজটা একটু কঠিন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করুন—এই কাজটা করতে পারলে ধীরে ধীরে আপনার আসক্তির লাগাম আপনি টেনে ধরতে পারবেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন 'Mental Health Day', 'Unplugging Day' পালন হচ্ছে। এ সমস্ত দিনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে—ওই দিন তারা সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল ডিভাইসের বাইরে

থাকবে। অর্থাৎ, কোনো স্মার্টফোন, কম্পিউটারের সংস্পর্শে আসবে না। দুনিয়াজুড়ে স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি নামে যে মহামারি তৈরি হয়েছে, তা থেকে মুক্তি পেতেই উন্নত দেশগুলো এখন এসব পন্থা কাজে লাগাতে মরিয়া।

সোশ্যাল মিডিয়ার লাগাম টেনে ধরতে আপনি নিজেও পালন করতে পারেন একটা Unplugigng Day. সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে নেন, যেদিন আপনি আপনার সকল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টকে বয়কট করবেন। এটা হতে পারে শুক্রবার, সোমবার, বৃহস্পতিবার অথবা আপনার সুবিধেমতো যেকোনো দিন। যদি অনলাইনে ওই দিন আপনার গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ থেকে থাকে—কোনো অনলাইন মিটিং, কোনো গুরুত্বপূর্ণ চ্যাট—আপনি তা আগের দিন সেরে নিতে পারেন বা পরের দিনের জন্য জমা করে রাখতে পারেন।

আপনার Unplugging Day তে আপনি ভালো একটা বই পড়ে শেষ করতে পারেন, বন্ধুদের সাথে কিংবা পরিবার নিয়ে যেতে পারেন পাহাড়ের কোলঘেঁষা মনোরম কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যের কাছাকাছি অথবা সমুদ্রের সংস্পর্শে। আত্মীয়স্বজনদের বাসাতেও বেড়াতে যেতে পারেন। শখের ছাদ বাগান পরিচর্চা করতে পারেন, উঠোনে লাগাতে পারেন নতুন প্রিয় কোনো ফুল বা ফলের গাছ। সন্তানদের সাথে খেলাধুলো করা, এলাকার ছোটো আর বড়রা মিলে টিম করে ক্রিকেট বা ফুটবল খেলাসহ ভালো সময় কাটবে এমন যেকোনোকিছুতে নিজেকে যুক্ত করে নিতে পারেন।

এই অভ্যাসটা চর্চা করতে পারলে আপনার জীবনে এর বেশ ভালো রকমের প্রভাব দেখতে পাবেন। আপনি দেখবেন—নিজের কাজগুলো করার জন্য বেশ ভালো রকমের সময় পাচ্ছেন। আগে কাজ করতে গিয়ে যেখানে শেষ মুহূর্তে দৌড়াদৌড়িতে পড়তেন, এখন আর তা নেই। আপনি আরো বুঝবেন—একটা দিন আপনি ফেইসবুকে না আসাতে ফেইসবুকের তাতে কিচ্ছু যায় আসেনি। এমনকি ফেইসবুক দুনিয়ার কেউ আপনাকে মিস পর্যন্ত করেনি। একটা দিন আপনি ফেইসবুকে আসেননি বলে থেমে যায়নি পৃথিবীর অগ্রযাত্রা, স্থবির হয়ে যায়নি দুনিয়ার রাজনীতি, ভেঙে পড়েনি অর্থনীতি কিংবা কোথাও লেগে যায়নি কোনো বিশ্বযুদ্ধ। আপনি না থাকার পরেও দুনিয়া তার আপন গতিতেই চলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার অনুপস্থিতি হয়তো দুনিয়ার কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটায় না, কিন্তু আপনার জীবনে এই অনুপস্থিতির অবদান কিন্তু অসামান্য!

মাত্রাতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের লাগাম টেনে ধরে যখন সেই সময়টুকুন আপনি পরিবারে দেন, যখন স্ত্রীর সাথে, শিশুদের সাথে, বাবা-মার সাথে কাটান সেই সময়গুলো, যখন ওই সময়গুলো বাঁচিয়ে আপনি সপ্তাহে ভালো দুটো বই পড়েন, একটা সুরা মুখস্থ করেন, সপ্তাহে দশ কিলোমিটার হাঁটেন, দশটা হাদিস পড়ে আমল করার চেষ্টা করেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে বুঁদ হয়ে থাকা সময়কে বাঁচিয়ে যখন আপনি প্রতি সপ্তাহে একজন আত্মীয়কে দেখতে যান, দুজন ভালো বন্ধুর সাথে আড্ডা দেন, যখন ঘরের কাজগুলোতে স্ত্রী অথবা মাকে সাহায্য করেন, নিজের শখের কাজগুলোতে সময় দেন—আপনি কি মনে করেন, এগুলোর কোনো প্রভাব আপনার জীবনে পড়বে না? আমি শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি—ফেইসবুকে আপনি না আসলে বা কম আসলে যদিও তাতে মার্ক জুকারবার্গ কিংবা দুনিয়ার কিচ্ছু যাবে আসবে না, কিন্তু সেই সময়গুলোকে ভালো কোনো কাজে ব্যয় করতে পারলে বদলে যাবে আপনার গোটা জীবন।

সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির অন্যতম একটা কারণ হলো কানেক্টিভিটি। না, নতুন কোনো বন্ধুর সাথে যুক্ত হওয়াকে আমি খারাপ বলতে চাইছি না, কিন্তু নতুন বন্ধু তখনই উপকারী হয়ে ওঠে, যদি তার কাছ থেকে আপনি উপকারী কিছু জানতে বা শিখতে পারেন। সোশ্যাল মিডিয়ার একটা কমন ট্রেন্ড হচ্ছে—এখানে মানুষ কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা না বুঝে যার-তার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে ভার্চুয়ালে পার করা সময়গুলো আদৌ তার নিজের উপকারে আসছে কি না, সেটা সে আর বুঝে উঠতে পারে না।

যত বেশি মানুষের সাথে আপনি কানেক্টেড থাকবেন, তত বেশি সময় ভার্চুয়ালে পার করার সম্ভাবনা আপনার ক্ষেত্রে বেড়ে যাবে। আপনার ইনবক্সে তখন অনেক হাই-হ্যালো থাকবে, অনেক কুশলাদি থাকবে, অনেক প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, অনেক তথ্য আসবে। সেগুলোর উত্তর দিতে আপনি ভালোই বোধ করবেন। নতুন কারো সাথে কানেক্টেড হওয়াটাকে আপনার কাছে একটা অর্জন বলেই মনে হবে, কিন্তু আমি আবারও বলি, এই কানেকশান তখনই অর্জন হয়ে উঠবে, যদি সেটা আপনাকে প্রোডাক্টিভ কোনো কাজে যুক্ত করার দিকে ধাবিত করে।

এই কানেক্টিভিটির আরেকটা মন্দ দিক হলো—এটা আমাদেরকে আমাদের বাস্তব জীবনের আড্ডা আর কানেকশানগুলো থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় মজবুত একটা কানেক্টিভিটি গড়তে গিয়ে আমরা আমাদের বাস্তবিক

জীবনের সম্পর্কগুলো সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ি অনেকসময়। সোশ্যাল মিডিয়াতে কমিউনিটি বিল্ডআপ করতে গিয়ে আমরা আমাদের স্ত্রীদের রান্নার প্রশংসা করতে ভুলে যাই, আমাদের সংসারগুলোকে তারা যেভাবে পরম আদর-যত্নে আগলে রাখে, সেটাকে মূল্যায়ন করার সুযোগ আমরা পাই না। স্ত্রীরাও ফুরসত পায় না স্বামীদের সঠিকভাবে মূল্যায়নের। তাদের শ্রম, চেষ্টা আর ত্যাগগুলোকে যথার্থ মর্যাদা তখন দেওয়া হয়ে ওঠে না অনেকসময়।

সোশ্যাল মিডিয়ার কানেক্টিভিটি আমাদেরকে আমাদের জীবনের সত্যিকার কানেক্টিভিটি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। বাবা-মার সাথে বসে গল্প-গুজব করার, হাসি-আনন্দ উপভোগ করার, শিশুদের সাথে মনখুলে খেলবার, ভাই-বোনদের সাথে প্রাণোচ্ছল হয়ে মিশবার সুযোগগুলো কত দ্রুতই না হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন থেকে! আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়া কানেক্টিভিটিকে, কিন্তু বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলোকে করছি অবহেলা। জীবনের প্রতিটা লগ্নেই—সুখের কিংবা দুঃখের—বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলোই আমাদের পাশে থাকে এবং থাকবে। এই সম্পর্কগুলোকে অবহেলা করা মানে রূপো খুঁজতে গিয়ে হীরাকে পায়ে ঠেলা।

সোশ্যাল মিডিয়ার এই কানেক্টিভিটির লাগাম টেনে ধরার জন্য আমাদেরকে খুবই সাবধান এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের ভার্চুয়াল বন্ধুতালিকায় কাকে রাখবো, কাকে ফলো করবো, কোন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবো—এসব ব্যাপারে আমাদের হতে হবে ভীষণ খুঁতখুঁতে। এসব নেটওয়ার্কিং যেন আমাদের দূরে সরিয়ে না দেয় বাস্তব জীবনের সুন্দর পরিসর থেকে।

সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির একটা অন্যতম বড় কারণ আমাদের সোশ্যাল প্রোফাইল। ব্যাপারটা আগেই আমি বিস্তারিত লিখেছি। এই সোশ্যাল প্রোফাইল তৈরির জন্য আমাদের অনেক বেশি কন্টেন্ট তৈরি করতে হয়। অনেক বেশি পোস্ট, অনেক বেশি ছবি, অনেক বেশি ভিডিও পাবলিশ করতে হয়। অনেক বেশি কন্টেন্ট-মুখর হতে গিয়ে আমাদের অধিক সময় এখানে ব্যয় করতে হয় সাধারণত। ফলে, এটার জন্য আমাদের ভাবতেও হয় প্রচুর। সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যধিক অ্যাক্টিভিজমের যদি লাগাম টেনে ধরা যায়, তাহলে সাশ্রয় করা যাবে আমাদের অনেক সময়ের। যত কম কন্টেন্ট, তত কম সময় সোশ্যাল মিডিয়ায়।

অনেককে দেখবেন, যারা একদিনে ফেইসবুকে পাঁচ থেকে দশটা পর্যন্ত পোস্ট দেয় নিয়ম করে। সমপরিমাণ ছবি আর ভিডিও আপলোডও করে। তারা যখন দেখে যে,

তাদের লেখাগুলো অধিক মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে, ছবি আর ভিডিওগুলো অনেক মানুষ দেখছে, তখন তারা সারাক্ষণ ভাবতে থাকে পরের লেখাটা কোন বিষয়ে লেখা যায়, পরের ছবিটা কীসের ছবি দেওয়া যায়, পরের ভিডিওটা কোন বিষয়ের ওপর তৈরি করা যায়। এসব ভাবনা-চিন্তা সারাটা সময় তার মস্তিষ্কে কিলবিল করতে থাকে, যা তাকে বারংবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিরে আসতে প্রলুব্ধ করে। ফলে যখনই সে সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরে আসে, তার মনে হতে থাকে যে, সে বুঝি নিজের জগতের বাইরে চলে এসেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি কমাতে আমরা আমাদের অ্যাক্টিভিটিজের আধিক্য কমিয়ে আনতে পারি।

'Mr. X commented on your post', 'Mr. Y accepted your friend request', 'You have a new message from Mr. Z', 'Mr. L sent you a friend request'—এই জাতীয় নোটিফিকেশনগুলো আমাদের সকলের খুব প্রিয়, তাই না? ফেইসবুক ব্যবহার করছে কিন্তু এসব নোটিফিকেশনে অভ্যস্ত নয়—এমন লোক খুঁজে পাওয়া বেশ দুরূহ বটে!

আপনি জেনে বিস্মিত হবেন—ফেইসবুকে আপনার অধিক সময় ব্যয়ের অন্যতম একটা নেপথ্য কারণ এসব নোটিফিকেশন। সর্বপ্রথম এসবই আপনাকে প্রলুব্ধ করে যে—'এসো, এখানে তোমার জন্য কী আয়োজন অপেক্ষা করছে দেখে যাও।' আপনার পোস্টে কেউ লাইক করেছে, ছবিতে কেউ কমেন্ট করেছে, আপনাকে কেউ একজন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে, কেউ আপনার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট গ্রহণ করেছে—এসবে আপনি দারুণভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। এগুলো চেক না করে আপনি তখন থাকতে পারেন না। নোটিফিকেশনের ওপর ক্লিক করে আপনি মুহূর্তে চলে আসেন নীল শাদার সোশ্যাল মিডিয়ায় আর ডুবে যেতে থাকেন আপনার জন্য সাজানো আয়োজনে। আপনি এসেছেন কেবল একটা নোটিফিকেশন চেক করতে, কিন্তু এসে দেখলেন আপনার কোনো এক বন্ধু মালদ্বীপ ভ্রমণের ছবি পোস্ট করেছে। সেই নয়নাভিরাম ছবিগুলো দেখার জন্য আপনার মন তখন আকুপাকু করবেই। আপনি দেখতে শুরু করলেন সেগুলো এবং পড়তে লাগলেন পোস্টের নিচে থাকা মন্তব্যগুলোও। সেখানে একটা মন্তব্যে আপনার চোখ আটকালো। কেউ একজন তার নেপাল ভ্রমণ সংক্রান্ত পোস্টের লিংক দিয়ে লিখলো, 'নেপালও সুন্দর। দেখে আসতে পারেন এভারেস্টের এই দেশটাও।'

সেই লিংকে ক্লিক করে মুহূর্তে আপনি চলে গেলেন অন্য এক প্রোফাইলে। একে একে দেখতে লাগলেন নেপালের বিভিন্ন মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য। সেসব দেখা শেষে নতুন পোস্ট দেখবার আশায় যখন আপনি রিফ্রেশবারে ক্লিক করলেন, আপনার সামনে উপস্থিত হলো কারো দুঃসংবাদ সম্বলিত কোনো লেখা। মনটা একটু খারাপই হবে তখন। সেটাকে পাশ কাটিয়ে স্ক্রল করে আর কিছুদূর গেলে দেখতে পাবেন আপনার কোনো এক ভার্চুয়াল বন্ধু বিয়ে করে ফেলেছে। ব্যাপারটা একদিকে আপনাকে আনন্দ দেবে, অন্যদিকে যদি আপনি অবিবাহিত হন, তখন একটু কষ্ট লাগাটা স্বাভাবিক বটে। আপনি কখন বিয়ে করতে পারবেন, কখন আপনার পরিবার এই ব্যাপারে তৎপর হবে—এসব চিন্তার ঘোর খানিকটা আপনাকে আচ্ছন্ন করতে পারে। একটা আনন্দমাখা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরেকটু সামনে গেলে দেশের রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো অবক্ষয়ের ঘটনা আপনার সামনে এসে পড়বে। আপনি যারপরনাই ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠবেন।

এ সবকিছুর শুরুটা কোথায় বলতে পারেন? ওই যে, আপনার ফোনে টুং করে আসা সেই নোটিফিকেশন। আপনি কিন্তু সেটা দেখার জন্যই মূলত ফেইসবুকে এসেছিলেন, কিন্তু মাঝখান দিয়ে কীভাবে কীভাবে যে ঘণ্টা দুই-তিন পার হয়ে গেলো, আপনি টের-ই পেলেন না! হ্যাঁ, সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর এলগরিদম ঠিক এভাবেই সাজানো। আপনি নানানভাবে এখানে আটকে যাবেন। আপনার ব্রেইনকে আপনার চাইতে তারা ভালো পড়তে পারে।

এই লাগামহীন স্ক্রলিং আরেকটা ক্ষতি করে। শুরুতে ভ্রমণ-সংক্রান্ত পোস্ট পড়ে আপনি আনন্দ পান। ঘুরতে যাওয়ার একটা বাসনা তৈরি হয় আপনার মনে। ঠিক এরপরেই হঠাৎ একটা দুর্ঘটনার সংবাদ এসে আপনার ভাবনায় জায়গা করে নেয় এবং আপনার মনকে ভরিয়ে তুলে বিষাদে। এরপর আরেকটা আনন্দ সংবাদ এবং তারপরে আরেকটা দুঃসংবাদ—এসব ঘটনা ঘন ঘন মুড সুইং করে দেয় আপনার, কিন্তু এত ঘন ঘন মুড সুইংয়ের জন্য আপনার মস্তিষ্ক কি প্রস্তুত? মেডিকেল সাইন্স জানাচ্ছে—মুডের বার কয়েক রদ-বদল মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে, কিন্তু যদি সেটা লাগামহীনভাবে, প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে আমাদের সাথে, আস্তে আস্তে তা গুরুতর স্বাস্থ্য-সমস্যা তৈরি করে আমাদের শরীরে। হতাশা, মানসিক সমস্যা, অলসতা-সহ নানানভাবে তা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে আমাদের জীবনকে।

আপনি অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার এলগরিদম পরিবর্তন করতে পারবেন না। সেই

এখতিয়ার আপনার নেই। আপনি মানুষকে বলতে পারেন না, যেন তারা দুঃখ বাড়ায় এমন পোস্ট দেওয়া বন্ধ করে বা এমন পোস্ট বেশি দেয়, যেগুলো আনন্দ দেয়। আপনি যা করতে পারেন, তা হলো সেলফ-কন্ট্রোল। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাত্রা সীমিত ও পরিমিত পর্যায়ে আনতে পারলে এমন দ্রুত মুড সুইংয়ের হাত থেকে বাঁচা সহজেই সম্ভব।

যেহেতু ফোনের স্ক্রিনে ভেসে থাকা নোটিফিকেশন আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতে প্রলুব্ধ করে সর্বদা, আপনি ইচ্ছে করলে আপনার স্মার্টফোনের সেটিংস অপশানে গিয়ে নোটিফিকেশন অফ করে রাখতে পারেন। যে যে অ্যাপসের নোটিফিকেশনের কারণে আপনাকে বারংবার ভার্চুয়ালে ঢুঁ মারতে হয়, সেই অ্যাপগুলোর নোটিফিকেশন বন্ধ করে রাখলে সেগুলো থেকে আর কোনো নোটিফিকেশন আপনার কাছে আসবে না, আর আপনিও তাড়না অনুভব করবেন না যখন-তখন ফোন হাতে নেওয়ার, ফেইসবুক-ইউটিউব-টুইটারে আসার। ফোনের সেটিংস থেকে নোটিফিকেশন অপশানে গেলে কোন কোন অ্যাপ থেকে নোটিফিকেশন বন্ধ করতে চান, সে অপশান আপনি অনায়াসে পেয়ে যাবেন। সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি কমাতে এটা এক কার্যকরী কৌশল।

চাইলে আরেকভাবে আপনি আপনার সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের লাগাম টেনে ধরতে পারবেন। আপনার ফোনের সেটিংসয়ে 'Digital Wellbeing' নামে একটা অপশান আছে। ফোনের স্ক্রিনে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনি যে মাত্রাতিরিক্ত সময় ব্যয় করবেন তা ফোন কোম্পানিও বুঝতে পারে। তাই তারা গ্রাহকদের মানসিক স্বাস্থকে গুরুত্ব দিতে এ-ধরনের একটা অপশান ফোনগুলোতে রাখছে আজকাল। এই 'Digital Wellbeing' অপশানে গিয়ে আপনি আপনার ফোনে থাকা কোন অ্যাপস একদিনে কতক্ষণ ব্যবহার করবেন, তার একটা সীমা ঠিক করে নিতে পারেন। ধরা যাক, আপনি স্থির করলেন যে—পুরোদিনে আপনি একঘণ্টা ফেইসবুক অ্যাপ ব্যবহার করবেন। আপনি যদি ওই অপশানে ফেইসবুক অ্যাপের জন্য একঘণ্টা টাইম নির্ধারণ করে দেন, তাহলে ফেইসবুক অ্যাপ ব্যবহারের মাত্রা একঘণ্টা পার হওয়ামাত্র ওই অ্যাপ একপ্রকার অকেজো হয়ে পড়বে। ওইদিনে আপনি কোনোভাবেই তখন আর ফেইসবুকে ঢুকতে পারবেন না। ঠিক পরেরদিন পুনরায় আপনি আবার একঘণ্টা ফেইসবুক ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। যে-সকল অ্যাপসের কারণে আপনার প্রচুর সময় নষ্ট হয়, সেগুলোকে আপনি এভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে পারেন।

সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির একটা দৃশ্যমান প্রমাণ হলো—সকালবেলা বিছানায় থাকা অবস্থাতেই ফোন হাতে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকে পড়া। রাতে যখন ঘুমোতে আসে তখন প্রায় দুটো। সকালে যখন জাগে তখন দিনের নয়টা বাজে। এই সময়টুকুর মাঝে ফেইসবুকে কি-না-কী ঘটে গেলো, কে কী লিখে ফেললো, কে কী শেয়ার করে ফেললো—তা একবার দেখে না নিলে চলবে কেন? এমন চিন্তা থেকেই ঘুম-ভাঙা চোখে স্মার্টফোন হাতে নিয়ে ঢুকে পড়া হয় সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে। এরপর স্ক্রলিং আর স্ক্রলিং। কোনো কূল-কিনারা নেই।

আপনার যদি এমন অভ্যাস থাকে, তাহলে সেটা ভাঙতে হবে। সকালবেলার স্নিগ্ধ আবহাওয়াটা, শান্ত পরিবেশটা সোশ্যাল মিডিয়ার জ্যামে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর শুরুতেই কখনো ফোন হাতে নেওয়া যাবে না। এটা ঠিক সময় দেখার জন্য, ক্যালেন্ডার চেক করার জন্য আজকাল ফোন হাতে না নিয়ে উপায় নেই কোনো; তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে—সময় দেখতে এসে সময় অপচয়ের জন্য আমরা যেন সোশ্যাল মিডিয়ায় বুঁদ হয়ে না যাই।

কেবল সকালবেলা ঘুম-ভাঙা চোখে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার বর্জন করলে হবে না, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় স্মার্টফোন যেন আপনার আশেপাশে না থাকে, সেই বন্দোবস্তও আপনাকে করতে হবে। সেই দিনগুলোর কথা ভাবুন তো, যে দিনগুলোতে রাতে বিছানায় শুয়ে শুধু একটু ফেইসবুকে চোখ বোলানোর জন্য এসেছিলেন, কিন্তু যখন ফেইসবুক থেকে বের হলেন, তখন প্রায় শেষ রাত চলে। আপনি বুঝতেও পারেননি, কীভাবে এত সময় পার হলো! এটা একদিন-দুদিন বা অকস্মাৎ ঘটে এমন কোনো দৃশ্য নয়। এটা আমাদের প্রায় সবার নিত্যদিনকার রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাছাড়া গবেষকরা বলছেন, রাতে ভালো একটা ঘুমের জন্য আমাদের উচিত হবে অন্ততপক্ষে ঘুমানোর এক থেকে দেড় ঘণ্টা আগে যাবতীয় স্ক্রিনের আলো থেকে দূরে থাকা। স্ক্রিন থেকে নির্গত নীল আলো যেহেতু আমাদের মস্তিষ্কে মেলাটোনিন নিঃসরণে বাধা দেয়, তাই ভালো একটা ঘুম পেতে হলে দরকার রাত্রিবেলা যতটা সম্ভব স্ক্রিনের নীল আলো থেকে দূরে থাকা। আপনার যদি রাতে অনলাইনে জরুরি কোনো কাজ থাকে, তা যত দ্রুত সম্ভব সেরে নিয়ে নিজেকে ঘুমের জন্য আগেভাগেই প্রস্তুত করতে পারেন।

আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে—সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সময় আপনি অকাতরে ব্যয় করেন, তাতে আপনার কোনো না কোনো কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই। হয় আপনি পর্যাপ্ত পড়াশোনা করছেন না, নতুবা আপনি চাকরিতে ভালো পারফরমেন্স করতে পারছেন না, অথবা পরিবারে দিতে পারছেন না পর্যাপ্ত সময়। তাছাড়াও, খেয়াল করলে দেখবেন—সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি আপনাকে আপনার শখগুলো থেকেও অনেকটাই দূরে সরিয়ে এনেছে। এই আসক্তি কাটানোর জন্য আপনাকে আপনার শখগুলোর কাছেও ফিরে যেতে হবে। বাগান করা, ঘুরতে যাওয়া, সামাজিক কাজকর্মে যুক্ত হওয়াসহ নানাবিধ কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলে সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির লাগাম টেনে ধরা অনেকটাই সম্ভব।

নয়.

আমার এক ফেবু-বন্ধু গতবছর আমাকে ম্যাসেজ করে। তিনি মেডিকেলের ছাত্র। ম্যাসেজে তিনি লিখলেন, 'আসসালামু আলাইকুম ভাই। কয়েকটা কথা শেয়ার করতে চাই আপনার সাথে। আসলে আমি বেশ অগোছালো জীবনযাপন করছি। সময়মতো সালাত, ঘুম, নিজের পড়া, টিউশান বা দৈনন্দিন কাজ—কোনোটাই ঠিকঠাকভাবে করতে পারছি না। এসবের পেছনে মূল যে কারণ, তা হলো মোবাইল-আসক্তি। আরো স্পষ্ট করে বললে—ফেইসবুকের নেশা। ফেইসবুকের নেশার কারণে আমার সালাতেও ব্যাঘাত ঘটে। অযথা মাইলের পর মাইল স্ক্রল করি। এই নেশা থেকে বেরোবার কোনো উপায় থাকলে যদি বলতেন।'

তার সাথে কথা বলে জানলাম—ফেইসবুকে তিনি কোনো আজেবাজে গ্রুপ-পেইজ-প্রোফাইলের সাথে যুক্ত নন। তিনি যা ফলো করেন, যাদের সাথে যুক্ত আছেন সবই এবং সবাই ইসলামিক। তিনি ইসলামিক বইয়ের গ্রুপে যুক্ত, ইসলাম নিয়ে লেখে এমন মানুষদের ফলো করেন, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—ফলো লিস্টে ইসলামি পরিবেশ বজায় রেখেও কেন তার জীবন এরকম অগোছালো হয়ে উঠলো? কেন তার নাওয়া-খাওয়া, ঘুম, পড়াশোনা আর কাজের এমন বেহাল দশা? এমনকি—সালাত আদায়েও কেন তাকে পড়তে হচ্ছে সমস্যায়?

এই প্রশ্নটার জবাব খোঁজা জরুরি।

আমরা অনেকেই মনে করি—ফেইসবুকে নাহয় সাত-আট ঘণ্টা পার করছি, কিন্তু তা তো অহেতুক কাটছে না, আজেবাজে লেখা পড়ছি না, জিনিস দেখছি না।

ইসলামিক লেখা পড়ছি, ইসলামিক ভিডিও দেখছি। সময়গুলো তো ভালো কাজেই কাটছে। সুতরাং, দিনের লম্বা সময় ফেইসবুকে এভাবে কাটালে তা তো খুব একটা মন্দ নয়।

এমন ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে হয়—ভাবনাটা আংশিক ভালো, পুরোটা নয়। আপনি হয়তো সারাদিন অনেক ইসলামিক লেখা পড়ছেন, অনেক ইসলামি ক্লিপস দেখছেন, কিন্তু তা যদি আপনার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ না করতে পারেন, তাহলে এতগুলো সময় এখানে দেওয়ার ফল কী? ফেইসবুকে বিভোর হয়ে ইসলামিক পোস্ট, ভিডিও দেখার কারণে যদি আপনার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যদি আপনি ঠিকমতো আপনার স্বামী-পরিবার-শিশুদের দেখভাল না করতে পারেন, যদি আপনি স্ত্রী-পরিবারকে সময় না দিতে পারেন, যদি আপনার পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যদি ভর্তি না হতে পারেন স্বপ্নের বিদ্যাপীঠে, যদি কর্মক্ষেত্রে আপনার পারফরম্যান্স কমে যায়, আপনার চাকরি হুমকির মুখে পড়ে, এমনকি যদি ঠিকঠাক সময়ে সালাত আদায় করতেই আপনি হিমশিম খান—এসবের বিনিময়েও কি কেবল ফেইসবুকে ইসলামিক পোস্ট পড়া, ভিডিও দেখাকে গুরুত্ব দেবেন? ইসলাম মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা আনে, কিন্তু আপনি যেভাবে ইসলামকে শিখতে চাচ্ছেন তা কি আদৌ আপনার জীবনে শৃঙ্খলা এনে দিচ্ছে?

এর ফলাফল কী জানেন? একটা সময়ে আপনি আপনার ভুলটা বুঝতে পারবেন। না, ইসলামিক কন্টেন্টের সাথে সংযুক্ত থেকে ভুল করেছেন তা বলছি না, ভুলভাবে এখানে সময় ব্যয়ের ব্যাপারটা একদিন আপনার সামনে স্পষ্ট হবে, তবে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার পরে। একদিন যখন সম্পর্কগুলো ভেঙে খান খান হয়ে যাবে, কর্মক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা খুঁইয়ে যেদিন আপনি হতাশায় ডুবে যেতে থাকবেন, স্বপ্নের বিদ্যাপীঠে পড়তে না পেরে যেদিন আপনার বুকটা ভীষণ ভারী হয়ে উঠবে, যেদিন যোগ্যতার জন্য ভালো জায়গায় আপনার একটা চাকরি হবে না, একটা ক্যারিয়ার হবে না, সেদিন আপনি বুঝবেন—এসব অনিয়ন্ত্রিত, অপরিকল্পিত ফেইসবুকিং আপনাকে হতাশা ছাড়া জীবনে আর কিচ্ছু দেয়নি।

ফেইসবুকে নানান ইসলামিক লেখকদের লেখাজোকা পড়ে, ভালো বক্তাদের লেকচার-ভিডিও দেখে আপনার মনেও হয়তো তাদের মতো হওয়ার সাধ জাগে। তাদের মতো করে লিখবার, বলবার ইচ্ছে হয়তো আপনারও আছে। আপনিও চান তাদের মতো করে দ্বীন প্রচার করতে, দ্বীনের বার্তাসমূহ ছড়িয়ে দিতে। আপনার

ইচ্ছেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু ইচ্ছেপূরণের জন্য যে রাস্তায় আপনি হাঁটছেন, তা আদৌ ঠিক না ভুল—তা কখনো জানতে চেয়েছেন? আপনি যাদের মতো হওয়ার জন্য দিন-রাত ফেইসবুকে পড়ে থাকছেন, তাদের কজন আপনার মতো করে ফেইসবুকে পড়ে থেকে নিজেকে গড়তে পেরেছে? যে লেখকের লেখা পড়ে আপনি অভিভূত হোন, তিনি কি আপনার মতো সারাদিনমান ফেইসবুকে পড়ে থেকে এত সুন্দর করে লিখতে শিখেছেন? নাকি, এর পেছনে তাকে ব্যয় করতে হয়েছে অনেক সময়, দিতে হয়েছে অনেক শ্রম? যার লেখায় বাহারি তথ্য আর নতুন ভাবনার দিগন্ত দেখে আপনি বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়েন, তিনি যদি দিন-রাত এক করে ফেইসবুকে কাটাতেন, পারতেন এতসব তথ্য আর ভাবনার নতুন নতুন দুয়ার আপনার সামনে উন্মোচন করতে? নাকি, এসবের জন্য তাকে অনেক পড়তে হয়, অনেক জানতে হয়? সম্ভব কি ফেইসবুকে বুঁদ হয়ে থেকে এতবেশি পড়া আর জানা? যে বক্তার বলার ধরন, জ্ঞানের সীমা-পরিসীমা আপনাকে মুগ্ধ করে রাখে, যার মতো হওয়ার চিন্তা আপনাকে স্বপ্নেও তাড়িয়ে বেড়ায়, ফেইসবুকে বুঁদ হয়ে থাকলে তিনি কি পারতেন তার সেসব যোগ্যতা অর্জন করতে?

আপনি স্বীকার করবেন যে—ভার্চুয়ালে যাদের আপনি অনন্য, অসাধারণ হিশেবে চেনেন এবং যাদের মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তারা সবাই একটা পদ্ধতির ভেতর দিয়ে, একটা ধারা বজায় রেখে এসব যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাদের মতো হতে হলে আপনাকেও এগুতে হবে একটা পদ্ধতির ভেতর দিয়ে। এই পদ্ধতির ভেতর দিয়ে এগুতে হলে সবার আগে যা দরকার, তা হলো ফেইসবুকের নেশা ত্যাগ করা। ফেইসবুকে যে অপরিসীম সময় আপনি ব্যয় করছেন তার লাগাম টেনে ধরা।

তার মানে, আপনি কি ফেইসবুকে কারো লেখাই পড়বেন না? কারো কোনো ভিডিও-ই দেখবেন না? সবাইকে আনফ্রেন্ড আর আনফলো করে দেবেন?

দুঃখিত, আমাকে ভুল বুঝবেন না দয়া করে। আমি কিন্তু মোটেও তা বলতে চাইনি। আপনি অবশ্যই ফেইসবুকে আসবেন, ভালো লেখা পড়বেন, ভালো ভিডিওগুলো দেখবেন। তথ্য-বিপ্লবের দুনিয়ায় এটাও জ্ঞান বিকাশের একটা মাধ্যম, তবে ফেইসবুককে আপনি আপনার একজন ভালো বন্ধু হিশেবে নিতে পারেন।

ধরুন, আপনার বাড়ির পাশে আপনার খুব ভালো একটা বন্ধু আছে, যার সাথে আড্ডা দিলে আপনি অনেক কিছু জানতে পারেন, কিন্তু তাই বলে কি সেই বন্ধুর সাথে প্রতিদিন আপনি ছয়-সাত ঘণ্টা করে আড্ডা দেবেন? এটা আপনার ওই

বন্ধু বা আপনি—দুজনের কারো জন্যই কি ভালো? আপনারা কি সর্বদা পারবেন এত লম্বা সময় আড্ডা দিতে? যদি দেন, এটা আপনাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজগুলোতে ব্যাঘাত ঘটাবে না? যদি আপনারা প্রতিদিন আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করে নিয়ে আড্ডা দেন, সেটা কিন্তু বেশ সহজ হয়ে যায় উভয়ের জন্য। দিনের চব্বিশ ঘণ্টা সময় থেকে এক-আধ ঘণ্টা সময় বের করা ততটা কঠিন নয়, যতটা কঠিন ছয়-সাত ঘণ্টা সময় বের করা। আর এতে জীবনের স্বাভাবিক কাজগুলোতেও কোনো বিরূপ প্রভাব পড়ে না। জীবনের গতিও মন্থর হলো না, ভালো বন্ধুর সংস্পর্শও থাকলো।

ফেইসবুককে আপনি আপনার পাশের বাড়ির সেই ভালো বন্ধুটার মতোই নিতে পারেন। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনি এখানে আসবেন। যাদের লেখাজোকা-আর্টিকেল-ভিডিও দেখা জরুরি মনে হবে সেগুলো পড়ে-দেখে নিয়ে দ্রুত ত্যাগ করবেন এখান থেকে। কোনো ভালো লেখা, ভালো আর্টিকেল, ভালো ভিডিও দেরিতে পড়লে বা দেখলে কোনো সমস্যা নেই। শুরুতে দেখলেও তা যেমন ভালো থাকে, দু-দিন পরে দেখলেও সেটা ভালো-ই থাকবে, পঁচে যাবে না।

দশ.

ধরা যাক, আপনি দিনে চার ঘণ্টা ফেইসবুক ব্যবহার করেন সব মিলিয়ে। যদি তা-ই হয়, তাহলে একবছরে আপনার ফেইসবুক ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৬০ ঘণ্টা। বাংলাদেশে একজন মানুষের গড় আয়ু ৬০ বছরের কাছাকাছি। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, আপনি ৬০ বছর বাঁচবেন, তাহলে ৬০ বছরে আপনি মোট ৮৭,৬০০ ঘণ্টা ফেইসবুকে কাটান!

তবে জন্মের পর থেকেই তো কেউ ফেইসবুক চালায় না। যদি ধরা হয় যে, পনেরো বছর বয়সে আপনার হাতে স্মার্টফোন এলো এবং পঞ্চাশ বছর বয়স অবধি আপনি ফেইসবুকে সক্রিয় থাকলেন, তাহলে বাকি থাকে পঁয়ত্রিশ বছর। বছরে যদি আপনি ১৪৬০ ঘণ্টা ফেইসবুক চালান, পঁয়ত্রিশ বছরে এই ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫১,১০০ ঘণ্টা!

৮৭৬০ ঘণ্টায় যদি ১ বছর হয়, ৫১,১০০ ঘণ্টা মানে প্রায় ৬ বছরের কাছাকাছি। অর্থাৎ, ৩৫ বছরের স্মার্টফোন ব্যবহারের সময়কালে জীবন থেকে ছয়টা বছর

আপনি হারিয়ে ফেলবেন শুধু ফেইসবুক স্ক্রল করতে করতে! ভাবা যায় কী এক ভয়াবহ ব্যাপার এটা?

এটা কেবল যারা দিনে চার ঘণ্টা ফেইসবুক ব্যবহার করে তাদের হিশেব, ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন বহু মানুষকে চিনি, যারা প্রতিদিন গড়ে ১০-১২ ঘণ্টা ফেইসবুক ব্যবহার করে। আমি এমন লোকও পেয়েছি, যারা দিনে ১৫-১৮ ঘণ্টা ফেইসবুকে কাটায় এবং তা কোনো কারণ ছাড়াই। এদের ক্ষেত্রে হিশেবটা তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

এগারো.

অস্বীকার করবো না যে, প্রযুক্তি আমাদের জীবনটাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে, কিন্তু প্রযুক্তির অপব্যবহার, সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কি আমাদের জীবন থেকে প্রকৃত আনন্দটুকু কেড়ে নিচ্ছে না? শেষ কবে আমরা নিজেদের জন্য একটু সময় বের করেছি মনে পড়ে? শিশিরভেজা ঘাসে একটু হাঁটবার জন্য, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে পাখ-পাখালির গান শোনবার জন্য, নদীর কলতান আর সমুদ্রের গর্জনে নিজেকে একাকার করবার জন্য শেষ কবে আমরা সময় করতে পেরেছি?

শারীরিক ক্ষতি তো আছেই, আত্মিক দিক থেকেও সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি কি আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে না? সালাতে দাঁড়ালেই আমাদের কি অনলাইন জগতের নানান কথাবার্তা, নানান ঘটনা মনে পড়ে না? অনলাইনে কী লিখছি, কী পড়ছি, কী দেখছি—তা নিয়ে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকতে গিয়ে, আমাদের ঈমান-আমলের যে বেহাল দশা হয়ে আছে, তা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে কখনো? টেক-জায়ান্টেরা তাদের ব্যবসার নিমিত্তে এখানে পেতে রেখেছে একটা মোহনীয় খেলাঘর, আর সেই খেলাঘরে আমরা দিব্যি খরচা করে যাচ্ছি আমাদের জীবন।

জীবনটা বড় ক্ষুদ্র! ক্ষুদ্র এই জীবনের বড় একটা অংশ যদি অযথা, অহেতুক কোনো আসক্তির পেছনে খরচ হয়ে যায়, কতটাই বা তবে বিকশিত হতে পারে মানবজীবন?

হৃদয়ের জানালাটা খুলে দাও না

এক.

দূর সম্পর্কের এক দরিদ্র আত্মীয়কে আর্থিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। দারিদ্র্যের ভারে নুইয়ে পড়া জীবনের অচলাবস্থায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তার সাহায্যের অন্যতম ভরসাস্থল।

কিন্তু যেবার আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে মদিনার মুনাফিকেরা কুৎসা রটালো, চারিত্রিক কালিমার যে অপবাদ তারা লেপ্টে দিতে চেয়েছিলো উম্মুল মুমিনিনের গায়ে, সেই ঘটনায় যুক্ত হয়ে পড়েছিলো আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেই আত্মীয়ও।

ভাবুন তো, কারো দুঃখের দিনে আপনি আপনার সর্বোচ্চটা দিয়ে তার পাশে দাঁড়ান, কিন্তু দিনশেষে যদি জানতে পারেন, সেই লোকটা আপনার মান-ইজ্জতকে দুই পয়সারও দাম দেয় না, সুযোগ পেলে আপনার পিঠে ছুরিও চালিয়ে দিতে পারে, আপনার অবস্থা তখন কেমন হবে? আপনি নিশ্চয় এতে অনেক দুঃখ পাবেন। ভাববেন, খাল কেটে আপনি হয়তো কুমির আমদানি করেছেন এত দিন অথবা দুধ-কলা দিয়ে পুষে এসেছেন বিষধর কালসাপ। যার জন্য আপনি গলা-পানিতে নামতে রাজি, সে যদি ওই পানিতেই আপনাকে ডুবিয়ে মারতে চায়, আপনার মনের অবস্থা তখন কেমন হবে?

আপনি বলবেন, না! তোমার সাথে আর না। আমি হাড়ে হাড়ে চিনতে পেরেছি তোমাকে। আমার নুন খেয়ে আমারই বদনাম করে বেড়াও, আর ভেবেছো কিনা তোমাকে আমি এভাবেই সাহায্য করে যাবো? এত সস্তা দুনিয়া?

তাকে এত দিন যা সাহায্য-সহযোগিতা আপনি করতেন, সব বন্ধ করে দেবেন মুহূর্তেই। আর যাই হোক, একজন বিশ্বাসঘাতকের সাথে আর কোনো সম্পর্ক আপনি রাখতে পারেন না।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘটনায় দূর সম্পর্কের সেই আত্মীয়ের ব্যাপারেও মুহূর্তের জন্য এভাবে ভেবেছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন, 'নিয়মিতভাবে তোমাকে যে সাহায্য-সহযোগিতা আমি করতাম, সেটা আজ থেকে বন্ধ করলাম। আমার কন্যার ব্যাপারে যে লোক এতটা অপবাদ দিতে পারে, তার জন্য আমার কোনো দয়া থাকতে পারে না।'

একজন মানুষ হিশেবে, একজন বাবা হিশেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই চিন্তাটা খুবই স্বাভাবিক। আপনি বা আমি হলেও এর ব্যতিক্রম চিন্তা কখনোই করতে পারতাম না, কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই চিন্তাটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পছন্দ করলেন না। কেউ একজন আপনার সাথে অন্যায় করেছে বলে তার সাথে যাবতীয় সম্পর্ক আপনি ছিন্ন করে আসবেন, দুঃসময়ে তাকে দিয়ে আসা সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে দেবেন—এমনটা করবার ব্যাপারে ইসলাম আপনাকে উৎসাহিত করে না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এমন সিদ্ধান্তের বিপরীতে তাকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন—

'তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন শপথ করে না বসে যে, তারা আত্মীয়স্বজন, মিসকিন এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের সাহায্য করবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয় ও তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।।'[১]

আল্লাহ বলছেন—আমাদের মধ্যে যাদের মর্যাদা ও প্রাচুর্য আছে, আমরা যেন কখনোই আমাদের আত্মীয়স্বজন, দরিদ্র এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারী, আমাদের সাহায্য

---

[১] সূরা নূর, আয়াত : ২২

যাদের অতীব দরকার, তাদের যেন আমরা উপেক্ষা না করি। হতে পারে আমাদের কোনো বিপদের সময়ে তারা আমাদের পাশে ছিলো না। হতে পারে তাদের জন্যই আমাদের পার করতে হয়েছে কোনো ভয়ংকর দুঃসময়। হতে পারে আমাদের সাথে তারা ভারি অন্যায়-অবিচার করেছে কোনো একদিন। কোনো একটা সময়ে তাদের কাছে হাত পাতলেও তারা হয়তো আমাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

আল্লাহ বলছেন—তাদের সেই অন্যায়ের, তাদের সেই অবিচারের, সেই আত্মকেন্দ্রিকতা এবং হিংসুটে মনোভাবের হিশেব যেন আমরা না করি। সেগুলোকে হৃদয়ে টুকে রেখে তাদের দুঃসময়ে যেন আমরা প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে না উঠি। তাদের ভুল, তাদের অবিবেচকতা, তাদের অন্যায় যেন আমাদের এমন কোনো কাজের দিকে ধাবিত না করে, যেখানে তাদের আর আমাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং ভুলকে ভুলে গিয়ে, আমাদের দয়া, উদারতা আর প্রশস্ত হৃদয় যেন আমরা নিবেদন করতে পারি তাদের দিকে।

এতে কী হবে জানেন?

ওই একই আয়াতে আল্লাহ বলছেন—'তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন?'

যে আপনার ক্ষতি চায়, যে আপনার সাথে শত্রুতা করে, যে আপনার ভালো সহ্য করতে পারে না, তার উপকার করা মানে যে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া, তার কাছে হেরে যাওয়া, তা কিন্তু নয়। এতে বরং আপনার লাভের পরিমাণটাই বেশি। একটা শাশ্বত মানবজীবনের উদাহরণ আপনি তার সামনে এবং সমাজের সামনে স্থাপন করতে পারবেন। সত্যিকারের বীরপুরুষ তো তারাই, যারা ক্ষমতা হাতে পেলে বিনয়ী হয়। প্রতিশোধের সমস্ত সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যারা ক্ষমার চাদরে মুড়িয়ে নেয় জীবন—তারাই শক্তিমান। কদর্যতার বিপরীতে, হিংসা আর দ্বেষের দুনিয়ায় আপনার এহেন মহানুভবতা সমাজের অনেকের জন্য হয়ে উঠবে অনুপ্রেরণার!

তবে সবচেয়ে বড় লাভ এটা নয়। সবচাইতে বড় লাভ হলো—আপনার এই কাজের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে ক্ষমা করে দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। একজনের ভুলকে বড় করে না দেখে তার দুয়ারে দয়ার ঝুঁড়ি নিয়ে যখন আপনি উপস্থিত হবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও তার দয়ার ভান্ডার আপনার জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন। আসমানে তিনি আপনার মর্যাদাকে এত উন্নীত করবেন যে,

আপনার ইচ্ছে হবে, ইশ! এরকমভাবে ক্ষমা করে দেওয়ার আরো অহরহ সুযোগ যদি দুনিয়ায় আমি পেতাম!

যে ক্ষমা করে তার কোনো ক্ষতি নেই; বরং তার জন্য আছে মহা-পুরস্কার।

আয়াতটা নাযিল হওয়ার পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের ভুলটা উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি বললেন, 'অবশ্যই আমি চাই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কখনোই আমার ওই আত্মীয়কে দিয়ে আসা সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করবো না।'[১]

আত্মীয়ের এমন কাজে সত্যই ব্যথিত হয়েছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, কিন্তু আল্লাহর ক্ষমালাভের মতো মহা-পুরস্কারের ঘোষণা যখন এলো, সেই ব্যথা আর স্থায়ী হলো না অন্তরে। তিনি ক্ষমা করে দিলেন তার সেই আত্মীয়কে। হৃদয়ে জমা করে রাখলেন না কোনো দুঃখবোধ।

দুই.

অন্তরে দুঃখ পুষে রেখে প্রতিশোধ যদি নেওয়াই যেতো, এই কাজে ইউসুফ আলাইহিস সালামের চাইতে বেশি অগ্রাধিকার আর কে পেতেন দুনিয়ায়?

সেই ছোটোবেলায় খেলার নাম করে ভাইয়েরা তাকে কূপে ফেলে দিয়েছিলো। এরপর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে কত দুঃসময়ের ভেতর দিয়েই না যেতে হয়েছিলো তাকে! কিন্তু একদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন তাকে রাজত্ব দান করলেন, দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করলেন ক্ষমতা দিয়ে, যখন ভাইদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সমস্ত সুযোগ ইউসুফ আলাইহিস সালামের পায়ে লুটোপুটি খেতে লাগলো, তখন ভাইদের উদ্দেশ্য করে তিনি কী বললেন জানেন?

> আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ যেন তোমাদের ক্ষমা করেন। তিনি তো পরম করুণাময়।[২]

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪১৪১; *সহিহ মুসলিম* : ২৭৭০; *তাফসিরুল বাগাভি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২১; *কুরতুবি*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২০৭; *তাবারি*, খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ১২৩; *তাফসির ইবনু আবি হাতিম*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৫৪৩; *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৭১

[২] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৯২

ব্যথার সাগরে হাবুডুবু খেয়েছিলেন তিনি। আপন ভাইদের ষড়যন্ত্রে বঞ্চিত হয়েছেন বাবার আদর-স্নেহ, মায়ের ভালোবাসা থেকে। পথে পথে ঘুরতে হয়েছে তাকে। বিক্রি হয়েছিলেন দাস হিশেবে, তার চরিত্রকে তোলা হয়েছিলো কাঠগড়ায়, তাকে বন্দি করা হয়েছিলো কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে। জীবনের এত চড়াই-উতরাই শেষে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে রাজত্ব দান করলেন, ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দিলেন, প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে তখন তিনি ভাইদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েননি। তাদের কাছে পেয়ে তিনি বললেন, 'আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

ভাবুন তো, কত মহৎ প্রাণের অধিকারী হওয়া গেলে এভাবে ক্ষমা করা যায়!

তিন.

একদিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন কোনটা?'

নবিজি বললেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন ছিলো সেটা, যেদিন তায়িফবাসী আমার প্রতি নির্দয় হয়েছিলো।'[১]

মক্কাবাসীর অনবরত অনাচার-অত্যাচার আর প্রিয়তম চাচা আবু তালিব এবং প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান নবিজি তায়িফে গিয়েছিলেন এক বুক আশা নিয়ে। তিনি ভেবেছিলেন, আর যা-ই হোক, তায়িফবাসী মক্কাবাসীর মতো নির্দয় হবে না অন্তত। হয়তো আল্লাহর দ্বীনকে তারা পরম মমতায় গ্রহণ করবে, কিন্তু তায়িফবাসী তা করেনি। উল্টো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা এত ঘৃণ্য আর জঘন্য পর্যায়ের অপমান করলো যে, তাকে রক্তাক্ত করে, পাথরের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে বিতাড়িত করলো তায়িফ থেকে। সেই দিনটা ছিলো নবিজির জীবনের সবচেয়ে বিষাদময় দিন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন অপমান দেখে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাহাড়ের ফেরেশতাকে আদেশ দিয়ে পাঠালেন। সেই ফেরেশতা

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৩১; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৯৫; *দালাইলুন নুবুওয়াহ* : ২১৩; *রিয়াযুস সালিহিন* : ৬৪২

এসে নবিজিকে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসুলাল্লাহ। আমি পাহাড়ে নিযুক্ত আল্লাহর ফেরেশতা। তায়িফবাসী আপনার সাথে যা করলো, তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখেছেন এবং তিনি আমাকে আপনার কাছে আসবার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি যদি চান, এই ঘৃণ্য কাজের বদলা হিশেবে দুই পাহাড়ের চাপে আমি তাদের পিষ্ট করে ফেলবো এখনই।'

এত অত্যাচার, এত নির্যাতন, এত অপমান! তবু পাহাড়ের ফেরেশতার এই কথার জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন কী বললেন জানেন? তিনি বললেন, 'না না, আমি তা চাই না। আমি আশা করি একদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জনপদে এমন মানুষদের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করবে।'[১]

প্রতিশোধের কী দুর্দান্ত সুযোগ সামনে এলো, কিন্তু আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে ঝুঁকলেন না মোটেও। তায়িফবাসীদের পাহাড়ের চাপে পিষ্ট করার বদলে তিনি তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন ক্ষমার দুয়ার।

চার.

একজীবনে কী পাচ্ছেন আর কী পাচ্ছেন না, কার কাছে পাচ্ছেন আর কার কাছে পাচ্ছেন না—এসব ভেবে যদি জীবন সাজাতে যান, তাহলে মানুষের ভুলগুলো বড় করে দেখা ছাড়া উপায় থাকবে না। মানুষের ভুলগুলো, ত্রুটিগুলো যদি মনে রাখতে শুরু করেন, যদি আজ থেকে সেসব নোট করা শুরু করেন, সেই নোট খাতা একদিন এনসাইক্লোপিডিয়ার সমান হয়ে দাঁড়াবে! চারপাশে আপনি তখন শত্রু ছাড়া আর কিচ্ছু দেখতে পাবেন না, কিন্তু এমন সংকীর্ণ হৃদয় নিয়ে বাঁচবার জন্য ইসলাম আপনাকে শেখায় না। ইসলাম আপনাকে উদার, মহৎ আর প্রশস্ত হৃদয় বানাতে শেখায়।

কে কী দিলো, কে কী করলো—তার ওপর নির্ভর করে আপনি মানুষকে বিচার করবেন না। আপনি মানুষের কাজে লাগবেন, তাদের পাশে দাঁড়াবেন, তাদের বন্ধু হবেন বিনা শর্তে, বিনা অভিপ্রায়ে।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৩১; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৯৫; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬৫৬১; *মুসনাদুল বাযযার* : ১০৩

উহু, ঠিক তা নয়। অভিপ্রায় তো একটা আপনার থাকাই লাগবে। কেন আপনি মানুষের ভালো চাইবেন, কেন শত্রুর বিপদেও পাশে দাঁড়াবেন, কেন উপকারের বাসনা নিয়ে ছুটে যাবেন মানুষের দ্বারে, তার কারণ আপনার রব আপনাকে জানাচ্ছেন—

মানুষের কল্যাণ করো, যেভাবে আল্লাহ তোমার কল্যাণ করেন।[১]

কে আপনার অকল্যাণ সাধন করলো, কে আপনার দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ালো না, কে আপনার পেছনে শত্রুতা করেছিলো—এসবকিছুর জন্য আপনার জীবন কিন্তু থেমে থাকেনি। সেই অকল্যাণ থেকে, সেই দুঃসময় থেকে, সেই শত্রুতা থেকে কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে ঠিকই উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন। তাই, কারো উপকার করার জন্য 'সে আপনার জন্য কী করেছে'—তা কখনো বিবেচনায় রাখবেন না। সকল প্রতিকূলতার বিপরীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে দয়া আর সাহায্য আপনি পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন—মানুষের ঘৃণা, অসহযোগিতা আর অসহিষ্ণুতার তুলনায় সেসব নিয়ামত অনেক অনেক বিশাল!

মানুষ যে দুঃখগুলো আপনাকে দেয়, সেগুলো মনে রাখুন, তবে দুঃসময়ে সেগুলো টেনে তাদের ঘায়েল করবার জন্য নয়। মুনাজাতে আল্লাহর কাছে বলবার জন্য যে—

'ইয়া আল্লাহ, আমার দুঃসময়ে আমি তাকে পাশে পাইনি, কিন্তু আপনি ঠিক-ই আমার পাশে ছিলেন। এখন তার দুঃসময়ে আপনি আমাকে তার মতো বানাবেন না। আমার অন্তরকে তার মতো সংকীর্ণ করে দেবেন না। তার বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাওফিক আপনি আমাকে দান করুন, ইয়া রব।'

আপনার হৃদয়ের জানালাটা সবার জন্য খুলে দেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর দয়ার ভান্ডার আপনার জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন।

[১] সুরা কাসাস, আয়াত : ৭৭

জীবনের কম্পাস

এক.

আমাদের আগাগোড়া জীবনটাকে যদি পরখ করি, তাহলে অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাবো, আমাদের জীবনে যা কিছু লাভ-ক্ষতি, যা কিছু প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, প্রায় সবকিছুর মূলে প্রথম এবং প্রধান নিয়ামক হিশেবে যা ছিলো তা হচ্ছে—সময়।

যে ছাত্রটা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে, তার অকৃতকার্যের কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাবো—সে পরীক্ষার আগের সময়গুলোকে ভালোভাবে কাজে লাগায়নি। নিয়মিত এবং নিয়ম-মাফিক পড়াশোনা করেনি।

যে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছে, তার কেইস স্ট্যাডি যদি আমরা সামনে রাখি, তাহলে আমরা দেখবো—তার ক্ষতির পেছনে যতগুলো কারণ বেরিয়ে আসছে, সবখানে কোনো না কোনোভাবে সময় জড়িত। হয়তো সে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, যার কারণে মার্কেটে সে টিকতে পারলো না অথবা এমনও হতে পারে—সঠিক সময়ে পণ্যের জোগান দিতে তার প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তার এই জায়গাটা তার-ই মতো অন্য কোনো ব্যবসায়ী দখল করতে সমর্থ হয়েছে কেবল সঠিক সময়ে পণ্যের জোগান দিতে পারার ফলে।

যে লোকটা ট্রেন মিস করেছে, আমরা যদি তার ট্রেন মিসের কারণ জানতে চাই, সেও আমাদের সময়ের কথা জানাবে। সঠিক সময়ে ব্যাগপত্র গুছিয়ে স্টেশানে

আসতে না পারায় গন্তব্যের ট্রেন তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

মোদ্দাকথা, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, জীবনের প্রতিটা অর্জন আর ব্যর্থতাকে যদি আমরা নিক্তিতে ফেলে পরিমাপ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো—আমাদের জীবনের সবটা জুড়ে যা সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ হয়ে আছে, তা হলো সময়। সময় মানুষকে গড়ে এবং সময়-ই মানুষকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। ঠিক এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুরা আসরে সময়ের শপথের পর পরই, আমরা যে আদতে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত আছি, তা আমাদের স্পষ্ট করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সময় হচ্ছে এমন এক অস্পর্শ্য বস্তু, যা স্পর্শ করা যায় এমন সবকিছুকে হয় পূর্ণ করে তোলে, নতুবা তাতে মেখে দেয় অপূর্ণতার গ্লানি।

সময় এমন এক নিরেট 'বাস্তববাদী বন্ধু, যে মুহূর্তের অবহেলায় পরিণত হতে পারে সবচেয়ে জঘন্য শত্রুতে। একজন মানুষ একজীবনে সবচেয়ে বেশি যে জিনিস অপচয় করে, তা হলো সময়। আর সময় এমন এক সম্পদ, যা একবার হারালে, ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই শূন্য। সময় অপচয় করে একজীবনে একজন মানুষ সবচেয়ে বড় যে নিয়ামত হারাতে পারে, তা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্য। কারণ সময়ের ব্যাপারে সচেতন না হলে তার দুনিয়া যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার আখিরাতও। এইজন্যই ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'সময়ের অপচয় মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ, কেননা মৃত্যু মানুষকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে, আর সময় অপচয় মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তার রব থেকে।'

জীবনে সফল হতে হলে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর চাইতে দ্বিতীয় কোনো ভালো বিকল্প আমাদের সামনে নেই। মৃত্যুর আগে আমাদের আল্লাহর প্রিয় হয়ে উঠতে হবে। তার মানে, মৃত্যু চলে আসার আগের সময়টাকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে। অনেক বেশি আমল করতে হবে। এজন্য সময়কে কাজে লাগাতে হবে। বাড়তি আমলের জন্য বাড়তি সময় বের করতে হবে। ধীরে ধীরে, খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায় করতে হবে। মানে সময় নিয়ে, ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করতে হবে। তাড়াহুড়ো করা যাবে না। ইসলামি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তার জন্য ইসলামি বইপত্র পড়তে হবে। কুরআন-হাদিস-তাফসির-সিরাহ পড়তে হবে। এরজন্য তো সময় দরকার। সময় বের করতে হবে। অকাজের সময়কে কাজে পরিণত করতে পারতে হবে।

অর্থাৎ, আমরা যা-ই করি না কেন, সময় কিন্তু কোনোভাবেই আমাদের পিছু ছাড়ছে না। আমাদের বাঁচতে হয় সময়ের মাঝে, সময়ের মধ্যে, সময়কে নিয়ে। তাই বলা হয়—'Time is very mystical character. If you use it properly, it'll be your best companion. If you misuse it, it'll be your worst enemy'.

দুই.

তাহলে সময়কে আমরা কাজে লাগাবো কীভাবে? আমরা যারা ইসলাম প্র্যাক্টিস করি, সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে, আমাদের জন্য সবচাইতে ভালো উপায় হচ্ছে 'সালাতকেন্দ্রিক' জীবনযাপন। সালাতকে জীবনের কম্পাস বানিয়ে, সেই অনুযায়ী আমাদের জীবনকে আবর্তিত করা গেলে সময়কে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে আমাদের জন্য ফরয করেছেন, তা আমরা সবাই জানি। এই পাঁচ ওয়াক্তের সালাতকে পাশ কাটানোর কোনো সুযোগ আমাদের সামনে নেই। আগেও বলেছি, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হলো আমাদের জন্য অক্সিজেন গ্রহণের মতো। অক্সিজেন গ্রহণ না করলে যেমন আমাদের দেহের মৃত্যু ঘটবে, ঠিক সেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ছেড়ে দিলে মৃত্যু ঘটবে আমাদের আত্মার। তাই অক্সিজেন গ্রহণ করার মতন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ও আমাদের জন্য জরুরি। অবশ্য কর্তব্য।

এখন সালাতের বাইরে আমাদের যাবতীয় যা কাজ, সেই কাজগুলোকে আমরা সালাতের সময়ানুযায়ী ভাগ করে নিতে পারি। আমি যদি ঠিক করি, এই মাসে আমি সুরা বাকারার অনুবাদ আর তাফসির পড়ে শেষ করবো-ই করবো, তাহলে ফজরের পরের যে সময়টুকুতে সাধারণত আমার ঘুমোতে মন চায় কিংবা আমি ঘুমোই, ওই সময়টাকে আমি চাইলেই সহজে কাজে লাগাতে পারি। এখন থেকে ফজরের পর আমার আর ঘুমোনো চলবে না। ঘুমোনোর সময়টাকে যেহেতু আমি আমার পড়াশোনার জন্য বরাদ্দ করেছি, তাই এই সময়টাতে আমার চোখজুড়ে যত ঘুমই নামুক, নরম বিছানা যতই লোভাতুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকুক, আমি জানি যেকোনো উপায়েই হোক, আমাকে এই ডাক, এই আহ্বান উপেক্ষা করতে হবে। চোখ থেকে ঘুম তাড়াতে যা যা করতে হয় করবো। হাঁটাহাঁটি করা, চা-কফি পান করা, ব্যায়াম বা শরীরচর্চা—যেকোনো উপায়েই আমাকে জেগে থাকতে হবে

আমার লক্ষ্য পূরণের জন্য। শুধু যে গড়গড় করে পড়ে চলে গেলে হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। সুরা বাকারা থেকে নতুন এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলো, যেগুলোকে আমার জীবনোপকরণের, জীবন-গঠনের জন্য দরকারি মনে হবে, সেগুলোকে রঙিন পেন্সিল বা মার্কার দিয়ে দাগিয়ে, নোট করে করে আমি এগোতে পারি। সচেতন পাঠক-মাত্রই বুঝে ফেলবেন এই পদ্ধতির কার্যকারিতা।

এভাবে সুরা বাকারা শেষ হলে অন্য যেকোনো সুরা, যা আমার জন্য বোঝা জরুরি এবং তা অনেক সহজও, এমন অন্য একটা সুরা নিয়ে বসে পড়তে পারি অথবা এমনও হতে পারে—এই মাসে সুরা বাকারা শেষ করলাম তো পরের মাসে সিরাহ তথা নবিজির জীবনী নিয়ে বসে গেলাম। লক্ষ্য হবে একমাসের মধ্যে অন্তত নবিজির হিজরত পর্যন্ত পড়ে ফেলা। পরের মাসে হয়তো-বা বসতে পারি *রিয়াযুস সালিহিন* নিয়ে। মোদ্দাকথা, আমার সুবিধে অনুযায়ী আমি নির্ধারণ করে নিতে পারি, কোন মাসে কী পড়ব; তবে যা-ই পড়ি আর যেটাই পড়ি, পড়ার সিলসিলা আমাকে জারি রাখতেই হবে, এই দৃঢ় অঙ্গীকার আমার মধ্যে থাকা চাই।

ফজরের পরের যে সময়টা এত দিন আমার অলস কাটতো, কোনো কাজ না পেয়ে এত দিন যে সময়গুলোতে আমি নাক ডেকে ঘুমোতাম, সেই সময়গুলো এখন থেকে প্রোডাক্টিভ কাজে লাগছে।

অফিস অথবা স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ে কিংবা পড়ায়, তাদের হাতে ফজরের পরের এই সময়টুকু ছাড়া অতিরিক্ত সময় সাধারণত থাকে না। যেহেতু অফিস গমন কিংবা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে আর কোনো সময় হাতে অবশিষ্ট থাকছে না, আপনাকে দেখতে হবে যুহরের পরের সময়টুকু আপনার কীভাবে কাটে। আমার মতে—যুহরের সালাত, খাওয়া এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য আমাদের দেশে ভালো রকমের একটা বিরতি নির্ধারণ করা থাকে। সালাত আদায় এবং খাওয়া-দাওয়ার বাইরে যেটুকু সময় হাতে থেকে যায়, সেই সময়টুকু আপনি চাইলে দুইভাবে কাজে লাগাতে পারেন। যদি ঘুমোনোর অভ্যাস থাকে এবং পর্যাপ্ত বন্দোবস্তও থাকে, তাহলে আমার পরামর্শ হবে এই সময়টায় আপনি হালকা ঘুমিয়ে নিন। গভীর কোনো ঘুম নয় কিন্তু। মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে রাখুন। বিশ মিনিট বা আধ ঘন্টার। যদি ঘুম নাও আসে, তথাপি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন। আপনার মস্তিষ্ককে একটু স্থির হতে দিন।

কারো কারো জন্য এটা বেশ কঠিন কাজ। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের রাতেই যেখানে স্বাভাবিক ঘুম হয় না, সেখানে দিনে চোখ ভেঙে ঘুম নামানো যে বেশ শ্রমসাধ্য এবং সাধনালব্ধ ব্যাপার-ই হবে, তা তো অবশ্যই। যদি আপনি দুপুরের এই হালকা ঘুমে অভ্যস্ত না হোন, তাহলে আপনার জন্য আমার দ্বিতীয় বিকল্প পরামর্শ হচ্ছে—এই সময়টায় আপনি ভালো কোনো বই, সেটা হতে পারে ইসলামের ইতিহাসের কোনো বই কিংবা আমলের অথবা ইসলামিক কোনো ফিকশন নিয়ম করে পড়তে পারেন। এই সময়টুকুতে প্রতিদিন দশ বা পনেরো পৃষ্ঠা কিংবা নিদেনপক্ষে পাঁচ পৃষ্ঠা পড়ার একটা দৈনিক অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে করে যদি দৈনিক দশ পৃষ্ঠা পড়া যায়, তাহলে মাস শেষে আপনার তিনশো পৃষ্ঠার যেকোনো ঢাউস সাইজের বই পড়া হয়ে যাবে অনায়াসে। আগে যে সময়টা আপনি হয়তো-বা বেহুদা গল্প-গুজব কিংবা ফেইসবুকে কাটাতেন, এখন সে সময়টাকে কাজে লাগিয়ে মাসে অন্তত একটা ভালো বই আপনি পড়ে শেষ করতে পারছেন।

আসরের পরের সময়টুকু সাধারণত আমাদের নিয়মতান্ত্রিক অলসতায় কাটে। সারাদিনের ক্লান্তি, দৌড়ঝাঁপ শেষের এই সময়টা যেন গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠার আগেই ফুরিয়ে যায়। আমাদের শরীর ও মনকে চাঙা রাখতে এই সময়ে আমরা ভিন্ন কিছু করতে পারি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা কিংবা কফি হাতে, আদিগন্ত নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা তলিয়ে যেতে পারি ভাবনার অতলে। আকাশের রংধনু, পাখিদের ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে আমরা উপভোগ করতে পারি অবসরের অবশিষ্ট সময়টুকু। সবুজের সান্নিধ্যে যাওয়ার সাধ্য যাদের আছে, বাগানে পায়চারি করা, কিংবা শান বাঁধানো পুকুর-ঘাটে বসে নিজের আদি এবং আসল গন্তব্যের কথা স্মরণ করে কাটাতে পারি পড়ন্ত বিকেলের এই স্বল্প সময়।

সময়টা পরিবারের সাথেও কাটানো যায়। কাজের চাপে কত দিন মনখুলে কথা বলা হয় না মায়ের সাথে। বাবার সাথে শেষ কবে গল্প-আড্ডায় মেতে উঠেছি মনে করা কঠিন। স্ত্রী-সন্তানদের সাথেও গড়পড়তা কথাবার্তা ব্যতীত আলাপ হয় না। তাই অবসরের এই সবটা সময়, আমরা ইচ্ছে করলে আমাদের পরিবারের জন্য বরাদ্দ করতে পারি।

এর বাইরেও যে-সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে সময় স্বল্পতার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, এই সময়টাতে আমরা তাদের সাথেও সংযুক্ত হতে পারি নতুনভাবে। টেলি-কমিউনিকেশনের এই যুগে, এই কাজ করতে আমাদের নিশ্চয়

খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। এতে করে আমাদের প্রায়-বিলুপ্ত আত্মীয়তার বন্ধনগুলো সুদৃঢ়, মজবুত হয়ে ওঠবে। টার্গেট করা যায়—আগামি ত্রিশ দিনে এই সময়টাতে আপনি অন্তত ত্রিশজন আত্মীয়ের সাথে কথা বলবেন।

অথবা এর কোনোটাই যদি সম্ভব না হয়, আপনি নতুন আরেকটা টার্গেট নিজের জন্য তৈরি করে নিতে পারেন। আপনি যদি স্থির করেন, প্রতিদিন আসরের পরের এবং মাগরিবের আগের সময়টুকুতে অন্তত একটা করে দুআ শিখবেন, তাহলে মাস শেষে দেখা যাবে আপনি গুনে গুনে ত্রিশটা এমন দুআ শিখে ফেলেছেন, যা আপনি আগে জানতেন না। দুআ আমাদের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আর সেই দুআ যদি হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শিখিয়ে দেওয়া, নবি-রাসুলগণের মুখনিঃসৃত, তাহলে তো সোনায় সোহাগা! প্রতিদিনকার হেলায় নষ্ট করা সময় থেকে কিছু সময় বাঁচিয়ে যদি আমরা আখিরাতের কাজে লাগাতে পারি, তার চাইতে বড় অর্জন আর কিছু হতে পারে কি?

মাগরিবের পরের সময়টুকুর কথা যদি বলি, আমাদের সাধারণ বাঙালি পরিবারগুলোতে এই সময়টা বিভিন্ন টিভি সিরিয়াল, টিভি-শো দেখতে দেখতেই পার হয়ে যায়; তবে একজন সচেতন মুসলিম নিজেকে এসব থেকে সতর্কতার সাথে বাঁচিয়ে রাখে। তাই এই সময়টাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হলে আমরা আমাদের কাজগুলোকে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাগ করে নিতে পারি। যাদের পড়াশোনা আছে, এই সময়টায় পড়াশোনায় মন দেওয়া যায়। লেখালেখি যাদের কাজ, তারা এই সময়টায় লেখালেখিতে ডুব দিতে পারেন। সময়টা বই পড়ে, বাসার কাজকর্ম করেও কাটানো যায়।

ইশার সালাতের পরের সময়টা আমরা সাধারণত ফেইসবুকে কাটাই। ফেইসবুক এমন এক আজব জিনিস, যেখানে আমরা পাঁচ মিনিট থাকার সংকল্প নিয়ে ঢুকি, পাঁচ ঘণ্টা চলে যাওয়ার পরে আমাদের বোধোদয় ঘটে। এই বাজে অভ্যাস থেকে আমাদের দ্রুতই বেরিয়ে আসতে হবে। ফেইসবুক যেহেতু জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে এবং একে বাদ দিয়ে চলাটা একপ্রকার অসম্ভব, তাই এর ব্যবহার সীমিতকরণ করা খুব জরুরি; নয়তো আমাদের প্রোডাক্টিভিটিকে অঙ্কুরে বিনাশ হতে দেখা ছাড়া আমাদের হাতে করার আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

ইশার সালাতের পরে হাতে ভারী কোনো কাজ না রাখাই উত্তম। ভারী কাজ করতে গিয়ে যদি ঘুমোতে দেরি হয়ে যায়; তাহলে ফজরের সালাতের জন্য জাগাটা কষ্টকর

হয়ে ওঠে। ফজরের সালাতের গুরুত্ব একজন মুমিনের জীবনে সর্বাধিক।

অধিকতর হালকা কাজগুলো এই সময়ে করার জন্য আমরা রাখতে পারি, যেমন : পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা কোনো বই পড়া, শিশুদের দ্বীনি ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা, পরিবারের সকলের সাথে দ্বীন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা ইত্যাদি।

সারকথা হলো—আমাদের যার যা কাজ, সেই কাজ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকেন্দ্রিক একটা নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া। সালাতকে কেন্দ্রে রেখে জীবনটাকে সাজাতে পারলে আমাদের ভেতরে একটা তাড়না কাজ করবে। নিজেকে সমৃদ্ধ করার তাড়না। সালাতগুলো আমাদের একটা রিমাইন্ডার দেবে। আমাদের মনে হবে—'যুহরের পরে তো আমার দশ পৃষ্ঠা বই পড়তে হবে', 'আসরের পর তো আমার অমুক দুআটা শিখতে হবে', 'মাগরিবের পর তো অমুককে ফোন করতে হবে।'

সালাতকে জীবনের কম্পাস বানিয়ে নিয়ে, জীবনটাকে একটা নির্দিষ্ট ফ্রেমে নিয়ে আসুন। জীবন বড়োই সংক্ষিপ্ত এক সফরের নাম। জীবনের এই অপর্যাপ্ত সময়গুলো যেন অকাজে নষ্ট না হয়।

ভালোবাসা ভালোবাসি

এক.

মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় একজন সাহাবি। নবিজি তাকে এত পছন্দ করতেন যে, কোথাও যাওয়ার সময় মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে নিজের বাহনে চেপে বসতেন।

একদিন মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাত ধরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মুআয, আল্লাহর শপথ আমি তোমাকে ভালোবাসি।'[১]

নবিজি ভালোবাসেন মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাছাই করেছেন মানবতার দূত হিশেবে, গোটা সৃষ্টি-জগতের জন্য যাকে রহমত হিশেবে পাঠানো হয়েছে, সপ্ত আসমানের ওপারে ডেকে নিয়ে যার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন স্বয়ং বিশ্ব জাহানের অধিপতি—সেই মহা-মানব যখন কারো হাত ধরে বলেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি', একবার ভাবুন তো একজীবনে সেই প্রাপ্তিটা তখন কত বিশাল হয়ে দাঁড়ায়?

মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্মানিত সেই মহা-সৌভাগ্যবানদের একজন!

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৫২২; *মুসনাদু আহমাদ* : ২২১২৬; *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ৬৯০

তবে ভালোবাসার কথা জানিয়েই কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দায়িত্ব শেষ করেননি। ভালোবাসার কথা জানানোর পর মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি এমন কিছু শিখিয়ে দেন, যা তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছেও করে তুলবে মহা-সম্মানিত।

মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মুআয, আল্লাহর শপথ আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে বলছি, প্রতি সালাতের শেষে — اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ—'আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি 'আলা যিকরিকা, ওয়া-শুকরিকা, ওয়া হুসনি ইবাদাতিক' বলতে যেন কখনোই না ভুলো।'[১]

ধরুন, কেউ এসে আপনাকে বললো, 'ভাই, আল্লাহর কসম করে বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার একটা কথা শোনো, প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আধা-ঘণ্টা হেঁটে আসার কথা যেন কখনোই ভুলো না।'

এই কথা যদি কেউ এসে আপনাকে বলে, তার ভালোবাসার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ আপনার থাকে না। সে আপনাকে এমনকিছু বাতলে দিচ্ছে, যা সত্যিই আপনার জন্য উপকার বয়ে আনবে। প্রত্যহ ভোরবেলা স্নিগ্ধ বাতাসে আধ-ঘণ্টা হাঁটার অভ্যাস করতে পারাটা হতে পারে আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটা অর্জন। আপনার শরীর, দেহ আর মনের জন্য তা নিঃসন্দেহে অতীব উপকারী। আপনি জানেন এই দাবিতে তার কোনো স্বার্থ নেই, তার কোনো অভিপ্রায় নেই।

ভালোবাসার কথা জানিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তেমনই একটা উপদেশ দিয়েছেন। নিঃস্বার্থ। মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুও জানেন—তার দুনিয়া ও আখিরাতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য কতই না উপকারী সেই উপদেশ!

মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শিখিয়ে দেওয়া নবিজির সেই দুআর বাংলা ভাবার্থটা এমন—'ইয়া আল্লাহ, আপনাকে স্মরণ করার ব্যাপারে, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে, অতি-উত্তমভাবে আপনার ইবাদত করার ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৫২২; *মুসনাদু আহমাদ* : ২২১২৬; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ৭৫১; *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ৬৯০—হাদিসের সনদ সহিহ

দুআটা খুবই ছোটো, কিন্তু ছোট্ট এই দুআর ভেতরে যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে লেগে থাকার সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান। দুআটায় তিনটা জিনিসের জন্য সাহায্য চাওয়া হচ্ছে—

» আল্লাহকে স্মরণের ব্যাপারে।

» আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে।

» অতি-উত্তমভাবে আল্লাহর ইবাদত করার ব্যাপারে।

আল্লাহর স্মরণ তথা যিকিরকে বলা হয় আত্মার খোরাক। মোহ, লোভ, হিংসা, ঘৃণা, পাপ আর পঙ্কিলতার ছোঁয়ায় আমাদের আত্মা প্রতিনিয়ত দূষিত হতে থাকে। সেই দূষিত আত্মাকে কেবল যিকির-ই পারে সতেজ আর সজীব করে তুলতে। আল্লাহর স্মরণ মুছে দেয় অন্তরের দূষণ আর তাতে এনে দেয় অনাবিল প্রশান্তি। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন,

নিশ্চয় আল্লাহর স্মরণেই অন্তরগুলো প্রশান্ত হয়।[১]

তরতর করে এগোতে থাকা সভ্যতায় আমাদের চিন্তাগুলো সর্বদা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। আমাদের চারপাশে তথ্য আর তত্ত্ব, জ্ঞান আর গরিমার বিপুল সমাহার। উপচে পড়া তথ্য আর তত্ত্বের দুনিয়ায় আমরা মাঝেমধ্যেই হাঁপিয়ে উঠি। জীবনের সঠিক গন্তব্য আর লক্ষ্য থেকেও হই বিচ্যুত। এমন বিভ্রান্তি আর বিরক্তির মুহূর্তগুলোতে যদি আমরা গভীরভাবে নিমগ্ন হতে পারি আল্লাহর স্মরণে, তাহলে রাহমানুর রাহিম ঠিক ঠিক আমাদের বিচ্ছিন্ন অন্তরটাকে তার সঠিক রাস্তা চিনিয়ে দেন।

আল্লাহর স্মরণের পর দুআটায় যে জিনিসটা চাওয়া হয়েছে তা হলো—আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য।

মানুষ খুব বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। সে সবসময় কী পায়নি আর কী পাচ্ছে না, তা নিয়েই হাপিত্যেশ করে, কিন্তু যা কিছু সে পেয়েছে বা পাচ্ছে, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোর সৌজন্যবোধ খুব কমই তার মাঝে উপস্থিত।

[১] সূরা রাদ, আয়াত : ২৮

গ্রহ থেকে গ্রহে মানুষ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে পানি। তার আশা—যেখানে পানি থাকবে, সেখানেই পাওয়া যাবে প্রাণ ধারণের সম্ভাবনা। মঙ্গল, নেপচুন, প্লুটো আর ইউরেনাসসহ মহাশূন্যের অন্যসব জায়গায় যে পানি সোনার হরিণের মতোই দুর্লভ, সেই পানিকে পৃথিবী নামক গ্রহটায় আমাদের জন্য কত সহজলভ্য করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা; কিন্তু আমরা কি এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি? কখনো দুআয় দুহাত তুলে আল্লাহকে বলেছি, 'ইয়া আল্লাহ, গোটা মহাবিশ্বে যা অপ্রতুল, তা কত অনায়াসে আপনি আমাকে দান করছেন নিত্যদিন। যে নিয়ামত না হলে আমার বাঁচা অসম্ভব হতো, না-চাইতেই তা কত অবলীলায় আমি পেয়ে যাচ্ছি। এই যে নিয়ামত আপনি আমাকে দান করছেন, এর জন্য আপনার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া।'

শুধু তো পানি নয়, প্রকৃতির আলো-হাওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত উপকরণ মহান রব আমাদের জন্য সুচারুরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তা সহজলভ্য করেছেন আমাদের জীবনধারণের জন্য। প্রতিদিন যে পরিমাণ অক্সিজেন বাতাস থেকে আমরা গ্রহণ করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি তার দাম নেওয়া শুরু করতেন, পৃথিবীর তাবৎ ধনকুবেররাই রাতারাতি ফকির হয়ে যাবে। আমার-আপনার মতো হাভাতে লোকেদের কথা তো বাদ-ই দিলাম। প্রকৃতিজুড়ে এত এত নিয়ামত আমাদের জন্য বরাদ্দ, কিন্তু কোথাও তার জন্য আমাদের দিতে হয় না একটা পয়সা; তবু কখনো দুহাত তুলে একবার সেই মহান রবকে একটাবার 'ধন্যবাদ' জানানো হয়নি।

প্রাণ-প্রকৃতির নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া নাহয় নাই-বা করলাম, সু-স্বাস্থের জন্য, সংসারের সচ্ছলতার জন্য, শান্তির জন্য, আয়-রোজগারে বারাকাহর জন্য, উত্তম স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানাদির জন্য, ভালো চাকরির জন্য এবং সর্বোপরি আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হতে পারার জন্যও কি কখনো শুকরিয়া করেছি আমরা?

তাই তো কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, 'মানুষ বড়োই অকৃতজ্ঞ।'[১]

---

[১] সুরা হজ, আয়াত : ৬৬

দুই.

কৃতজ্ঞতা জানাতে পারাটা খুব বড় একটা গুণ। কারো দ্বারা উপকৃত হওয়ার পর তার উপকারের স্বীকৃতি দিতে যারা কুণ্ঠাবোধ করে, যারা মুখ ফুটে একটা 'ধন্যবাদ' বলতে পারে না, ব্যক্তিজীবনে অসুখী হবার সম্ভাবনা তাদের সবচেয়ে বেশি। যারা অন্যের উপকারের স্বীকৃতি দিতে তৎপর, ধরে নেওয়া যায় যে, তাদের অন্তরে বক্রতা নেই। যাদের অন্তরে বক্রতা নেই, জীবনে সুখী হওয়ার দৌঁড়ে তারাই সবচেয়ে এগিয়ে। 'কৃতজ্ঞ' হতে পারাটাও জীবনের পরম এক অর্জন। সেই অর্জন লাভের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য চাইতে বলেছেন।

আল্লাহর কাছে তৃতীয় যে সাহায্যটা মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চাইতে বলেছিলেন নবিজি, সেটা হলো—উত্তমভাবে ইবাদত করতে পারা।

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথম দুটো ব্যাপারের চাইতে শেষ ব্যাপারটায় একটু জোর বেশি দেওয়া হয়েছে। প্রথম দুটোয় বলা হয়েছে—আপনার যিকিরের ব্যাপারে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে, কিন্তু শেষেরটায় বলা হয়নি যে, আপনার ইবাদত করার ব্যাপারে; বরং বলা হলো—উত্তমভাবে আপনার ইবাদত করার ব্যাপারে। ইবাদতের জায়গায় এসে একটু বাড়তি জোর, বাড়তি বিশেষণ যোগ হয়ে গেলো, কিন্তু কেন বলুন তো?

কারণ আপনার ইবাদত যখন ঠিক হবে, আপনার বাদবাকি সবকিছুই তখন ঠিক হতে শুরু করবে। উত্তমভাবে ইবাদত করতে পারার অর্থ হলো আল্লাহর একজন উত্তম বান্দা হতে শুরু করা। আদতে উত্তম ইবাদতের মাঝেই শুরুর দুইটা ব্যাপার বেশ ভালোভাবে মিলেমিশে আছে। রুকু আর সিজদায় আপনি যখন 'সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম আর সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা' বলেন, আপনি তখন মূলত আল্লাহর যিকির করেন। যখন আপনি তিলাওয়াত করেন 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামী-ন', তখন আসলে আপনি আল্লাহর শোকর আদায় করেন। সুতরাং, একজন উত্তম ইবাদত-গুজার বান্দা একইসাথে একজন যিকিরকারী এবং একজন শোকর-আদায়কারীও বটে। এইজন্য ইবাদতের বেলায় এসে নবিজি জোরটা বাড়িয়ে দিলেন, কারণ আগের দুইটাতে যদি ঘাটতিও থাকে, শেষে এসে তা যেন পুষিয়ে দেওয়া যায়।

জীবনের সবচেয়ে সেরা অর্জন হলো—আল্লাহর একজন অতি-উত্তম ইবাদতকারী বান্দা হতে পারা। এই অর্জন যারা লাভ করতে পারে, সফলতা তাদের জন্যই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

সেই সকল মুমিনরা সফল হয়েছে যারা তাদের সালাতে বিনয়ী।[১]

সালাতে বিনয়ী হওয়ার অর্থ হলো—আল্লাহর সামনে ঠিক সেইভাবে দাঁড়ানো, যেভাবে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু যান্ত্রিক জীবনের জাঁতাকলে আমাদের সমস্তকিছু যখন যন্ত্রের মতো গতানুগতিক, সেখানে আমাদের সালাতগুলোতে কতটুকু বিনয় আমরা রাখতে পারছি, সেটা নিয়ে ভেবেছি কখনো?

একটা ছোট্ট দুআ—আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি 'আলা যিকরিকা, ওয়া শুকরিকা, ওয়া হুসনি ইবাদাতিক', কিন্তু এর মধ্যে যেন জুড়ে দেওয়া আছে জীবনের সবচেয়ে বড় তিনটা অর্জন লাভের গোপন রহস্য। মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শিখিয়ে যাওয়া নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ভালোবাসামাখা জীবনের পাঠগুলো আমরা আমাদের জীবনেও প্রতিফলিত করবো কি?

তিন.

মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে আমার আরো একটি ঘটনার কথা খুব মনে পড়ছে। একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুবই প্রফুল্ল দেখে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি তো খুবই খোশ-মেজাজে আছেন, আমার জন্য এখন একটু দুআ করুন না!'

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এহেন আবদারে মুচকি হাসলেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হেসে তিনি আল্লাহকে বলতে লাগলেন, 'ইয়া আল্লাহ, আয়িশা পূর্বে করেছে এমন সকল গুনাহ আপনি ক্ষমা করে দিন। আয়িশা পরে করবে এমন সকল গুনাহও আপনি ক্ষমা করে দিন। আয়িশা প্রকাশ্যে করেছে

---

[১] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১-২

এমন গুনাহ আপনি ক্ষমা করে দিন। আয়িশা গোপনে করেছে এমন গুনাহও আপনি ক্ষমা করে দিন। সে বুঝে করেছে এমন গুনাহ আপনি ক্ষমা করে দিন, না-বুঝে করেছে এমন গুনাহও আপনি ক্ষমা করে দিন।'

আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, প্রিয় হাবিব যখন কারো জন্য ঠিক এভাবে দুআ করেন, বলুন তো সেই মানুষটার খুশিতে আত্মহারা না হয়ে উপায় আছে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে নিজের জন্য এত চমৎকার দুআ শুনে খুশিতে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও পাগলপারা। আম্মাজান আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে খুশি হতে দেখে প্রীত হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও। তবু তিনি জিগ্যেশ করলেন, 'আয়িশা, আমার দুআয় তুমি খুশি হয়েছো?'

খুশিয়াল গলায় আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'আমি খুবই খুশি হয়েছি ইয়া রাসুলাল্লাহ।'

তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'জানো আয়িশা, তোমার জন্য যে দুআ করলাম, ঠিক একই দুআ প্রতি সালাতের পর আমি আমার প্রতিটা উম্মতের জন্যই করি।'[১]

এই হাদিসটা যেদিন প্রথম শুনি, আক্ষরিক অর্থেই সেদিন আমার চোখ বেয়ে টপ টপ করে পানি ঝরেছিলো। আমার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই চৌদ্দশ বছর আগে বসেই আমার গুনাহের জন্য কেঁদে গেছেন, আমার ক্ষমালাভের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে গেছেন জেনে কী যে এক ভালোলাগা আর ভালোবাসার অনুভূতি পেয়েছিলাম আমি, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়!

আমি, আপনি, আমরা—আমরা সবাই প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাহ। আমাদের গুনাহের মাফ চেয়ে তিনি আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে কেঁদে গেছেন, আল্লাহর কাছে আর্জি জানিয়ে গেছেন, আকুল ফরিয়াদ করে গেছেন, যাতে আমাদের পূর্বের-পরের, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, বুঝে এবং না-বুঝে করা যাবতীয় গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। একজীবনে এরচেয়ে বড় পাওনা আমাদের জন্য আর কিছু হতে পারে কী!

---

[১] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৭১১১; *মুসনাদুল বাযযার* : ২৬৫৮—হাদিসের সনদ হাসান

হাদিসটা যদি এখনো আপনার মনে দাগ না কাটতে পারে, যদি সেটা এখনো আপনার হৃদয়কোণে ভালোবাসার স্ফুরণ না ঘটায়, যদি এখনো আপনি বুঝতে না পারেন আপনার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমময় প্রার্থনা, তাহলে যে দুআটা নবিজি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নাম ধরে করেছেন, সেখানে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নামের জায়গায় কেবল আপনার নামটা বসিয়ে নেন এবং অনুধাবন করুন, কতখানি ভালো তিনি আপনাকে বাসতেন!

চার.

'কেউ কথা রাখেনি' কবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বরুনা নামের এক মেয়েকে ভালোবেসে হাতের মুঠোয় প্রাণ নেওয়ার কথা বলেছিলো। শুধু কি তাই? ভালোবেসে সুনীল দুরন্ত ষাড়ের চোখে বেঁধেছিলো লাল কাপড় আর বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছিলো একশো আটটা নীলপদ্ম। কিন্তু বেচারি বরুনা সুনীলের কথা রাখলো না শেষ পর্যন্ত।

ভালোবেসে বেচারা সুনীলের সে কী পাগলামো! কিন্তু আমি ভাবি, আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে যে মানুষটা আমাকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবেসে গেলেন, যিনি মহান রবের দরবারে প্রতিটা সালাতের পরে আমার পাপ-মুক্তির জন্য ফরিয়াদ করে গেলেন, যিনি আমার কথা ভেবে গেলেন আমার অস্তিত্বেরও বহু শতাব্দী আগে, সেই মানুষটার ভালোবাসার কী প্রতিদান আমি দিচ্ছি? আমার কথায়, আমার চলনে-বলনে, আমার জীবনাচারে আছে কী তার ভালোবাসার প্রতিদানের কোনো ছাপ?

আমার একবার মনে হলো—আজ যদি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উঠোনে এসে দাঁড়ান, আমার ঘর থেকে ভেসে আসা গানের সুর কি তাকে বেদনাহত করবে না? সালাতের সময়ে আমাকে হাসি-আড্ডায় মেতে থাকতে দেখে, কাজে-কর্মে বিভোর থাকতে দেখে, টিভি-সোশ্যাল মিডিয়ায় বুঁদ থাকতে দেখে তিনি কি কষ্ট পাবেন না? তিনি এসে যদি দেখেন, আমি লোক ঠকাচ্ছি, মানুষের সাথে অসদাচরণ করছি, মানুষের ওপর জুলুম করছি, অন্যায়-অবিচারে ডুবিয়ে রেখেছি নিজেকে; যদি তিনি দেখেন, আমি কুরআনের আলোকে জীবনে স্থান দিতে কার্পণ্যবোধ করছি, তার সুন্নাহকে জীবনে আঁকড়ে ধরতে অনীহা দেখাচ্ছি, যদি তিনি একবার চেক করেন আমার ব্রাউজার হিস্ট্রি, যদি একবার

ঢোকেন আমার ফোনের গ্যালারিতে, তিনি কতই না আফসোস নিয়ে বলতেন, 'হায় উম্মাহ! তোমার জন্য আমি কত কেঁদে গেলাম, তোমাকে এত ভালোবেসে গেলাম আর তুমি এই দিলে আমার ভালোবাসার প্রতিদান?'

আমি ভাবি আর লজ্জায় কুঁকড়ে যাই।

আমার মতো পাপী বান্দার গুনাহ মাফ চেয়ে যিনি কেঁদে গেলেন, যিনি আমাকে ভালোবেসে গেলেন অকাতরে, তার প্রতি ভালোবাসার কোনো দায় কি আমার নেই? তিনি আমার কাছে টাকা চান না, ধন-সম্পদ চান না, আমার বিত্ত-বিভব, নাম-যশ-খ্যাতি কোনোকিছুর প্রতিই তার দৃষ্টি নেই। তিনি আমাকে ভালোবেসেছেন কেবল আমার জন্যই। তিনি চান যাতে আমার ইহকাল আর পরকাল দুটোই সুন্দর হয়। ইহকালে একটা সুন্দর আর সুষ্ঠু জীবন অতিবাহিত করে পরকালে যেন আমি অনন্ত জান্নাতে অবগাহন করতে পারি—কায়মনোবাক্যে সেটাই তাঁর চাওয়া। দুনিয়ায় এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসার নজির আর আছে কোথায়?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ভালোবেসে গেলেন, তাকে ভালোবেসে আমি কি পারি না তার সুন্নাহ দাড়িটুকু মুখে রেখে দিতে? তিনি অহর্নিশি ভেবেছেন আমাকে নিয়ে, আমার গোটা জীবনকে নিয়ে, আমি কি পারি না তার সুন্নাহ দ্বারা আমার জীবনটাকে রাঙিয়ে নিতে? হেরার যে আলো তিনি আমার জন্য তুলে এনেছেন, সেই আলোতে জীবনকে ভরিয়ে তুলতে কোনো কৃপণতা আমার সাজে? তাকে ভালোবেসে আমি কি পারি না আমার জীবনটাকে বদলে নিতে? যদি তাকে সত্যিই ভালোবেসে থাকি, তাহলে কি বেপর্দায় চলা আমার সাজে? আমার সাজে মিথ্যা বলে মানুষ ঠকানো? নন-মাহরামের সাথে দিব্যি ঘুরে বেড়ানো, সম্পর্ক পাতানো, গান-নাটক-মুভিতে বুঁদ হয়ে থাকা?

নবিজির ভালোবাসাকে যদি ভালোবেসে থাকি, তাহলে আমার কি উচিত নয় জীবনটাকে নিয়ে আরেকবার ভাবতে বসা? সেই মহামানবের ভালোবাসার প্রতিদানে আরেকবার বদলে যাওয়ার চেষ্টা করা?

ভাবুন তো, আখিরাতে হাউযে কাউসারের পাড়ে দাঁড়িয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার চোখে-মুখে প্রতীক্ষার ছাপ স্পষ্ট। হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার করতে করতে ছুটে এলেন আপনি আর বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আসতে পেরেছি। আমি আপনার কাছে আসতে পেরেছি ইয়া রাসুলাল্লাহ!'

প্রতীক্ষায় ক্লান্ত নবিজির চেহারায় যেন একটুকরো প্রশান্তি নেমে এলো। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আপনাকে বললেন, 'আহলান ওয়া সাহলান।'

এই দৃশ্যটার সাক্ষী হতে নিশ্চয় মন চাইছে আপনার? তাহলে চলুন না আজ থেকে নিজেদের একটু একটু করে বদলাতে শুরু করি।

সমুদ্রের সাধ

এক.

২০১৮ সালের শুরুরদিকে কোনো একটা কাজে কক্সবাজার গিয়েছিলাম। রাত তখন সাড়ে এগারোটা কি বারোটা বাজে, হঠাৎ খুব করে মন চাইলো সমুদ্রের পাড়ে যেতে। ঢেউয়ের শোঁ শোঁ শব্দ যেন আমার কানে তোলপাড় শুরু করেছে আর যেন কী এক মাতাল করা মোহিনী আবেশে আমাকে ডেকে চলেছে তার দিকে! সমুদ্র আমার বরাবরই পছন্দের। তীরহারা দিগন্তবিস্তৃত তার জলরাশি, ঢেউয়ের উথাল-পাতাল গর্জন, আকাশের নিচে তার নিঃসীম নিরন্তর বয়ে চলা আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করে রাখে। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা পাহাড় কেনার শখ ছিলো, আর আমার অনেক ইচ্ছে একটা সমুদ্র কেনার। একটা সমুদ্র—একান্ত নিজের করে!

সেই মাঝরাতে আমরা কয়েকজন মিলে চলে এলাম সমুদ্রের পাড়ে। সমুদ্রের যত কাছে আসি, শোঁ শোঁ শব্দ মাথার আরো ভেতরে ভীষণভাবে বাজতে থাকে। নিউরনে অনুরণনের মতো—যেন মহাশূন্যের কোথাও চলছে অবিশ্রান্ত মহাজাগতিক বোঝাপড়া।

সমুদ্রের কাছে এসে আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম! এ যেন সমুদ্র নয়, অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ থেকে উড়ে এসে পড়া বিশাল এক শুভ্র বরফখণ্ড—যতদূর চোখ যায় তার বিস্তৃতি! পুরো সমুদ্র যেন ঢেকে আছে শাদা বরফের চাদরে। আমার ঘোর কাটে পাশ থেকে একজনের আওয়াজে, যখন সে বললো, 'বাহ, সমুদ্রে এমন ফেনা তো আগে কোনোদিন দেখিনি!'

আচ্ছা, এই শুভ্র সফেদ বস্তু তাহলে সমুদ্রের ফেনারাশি বটে! এত সুন্দর তার আস্তরণ, এত চমৎকার তার জলের গায়ে লেপ্টে থাকার ধরন! শুভ্র ফেনার অলঙ্কার গায়ে সমুদ্রের এই রূপ ছিলো আমার কাছে নতুন ও নান্দনিক।

দুই.

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা হাদিস পড়ে আমার সেদিনকার কক্সবাজারের ওই স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেলো। একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমুদ্রের ফেনার কথা উল্লেখ করেছিলেন বলেই হয়তো-বা, আমার মস্তিষ্ক স্মৃতির অতল গহ্বর থেকে ঠিক ওইদিনের স্মৃতিটাকে আমার মানসপটে মেলে ধরলো।

বেশ পরিচিত একটা হাদিস, তবু এর শব্দচয়নে আমার জীবনের ভালো একটা স্মৃতির উপাদানের উপস্থিতি থাকায় সেটা আমাকে একটু থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করলো। আমি চোখ বন্ধ করে ভাবতে চাইলাম সেদিনের সেই মাঝ রাতের দৃশ্যটা—অথৈ জলের একটা সমুদ্র, চারদিকে তার ভাঙা-গড়ার তর্জন-গর্জন, বাতাসের বুক ফেড়ে আসা শোঁ শোঁ শব্দ আর দৃষ্টির সীমানা অবধি শুভ্র বরফের চাদর!

যে হাদিসটা আমাকে আমার স্মৃতির শহরে হারিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে সেটা হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিটা ফরয সালাতের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলবে এবং এরপর এই দুআ পাঠ করবে—لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর', আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন, এমনকি তার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনারাশির পরিমাণও হয়—তবু।[১]

আমি ভাবতে লাগলাম, সমুদ্রে কী পরিমাণ ফেনা থাকতে পারে? ভারত মহাসাগরের খুব ছোটো একটা অংশকে আমরা বঙ্গোপসাগর হিশেবে জানি। সেই ছোটো অংশটার খুবই ছোটো একটা কোণায় দাঁড়িয়ে আমি যে বিস্তৃত ফেনারাশি

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৫৯৭; *সুনানুন নাসায়ি* : ৯৭৯৭; *মুআত্তা মালিক* : ২২; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ২০১৩; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ৭৫০

দেখেছি একদিন, তাও যদি হিশেবের খাতায় তুলি, আমার ধারণা সেটাও আমার কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাবে। যদি সেখানে গোটা ভারত মহাসাগরটাকে ধরা হয়? যদি এর সাথে যোগ করা হয় পৃথিবীর সমস্ত সাগর-মহাসাগরকে? যদি আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তৈরি হওয়া ফেনারাশিকে আমার হিশেবের খাতায় তুলতে হয়—কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেই পরিমাণ?

জানি, এই পরিমাণটাকে কল্পনায় আনাও অসম্ভব, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন—যদি আমাদের গুনাহের পরিমাণ সেই অসম্ভবের পর্যায়েও পৌঁছায়, তবু আমাদের রব আমাদের সেই গুনাহগুলো অবশ্যই অবশ্যই মাফ করে দেবেন, যদি আমরা ক্ষমালাভের নিয়তে আমলটা করতে পারি।

তিন.

যদি জান্নাতে যেতে পারি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে একটা সমুদ্র চাবো। আমার সেই সমুদ্রের পাড়ে একদিন দাওয়াত করবো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। সমুদ্রের অঢেল ফেনারাশির দিকে তাকিয়ে আমি নবিজিকে বলবো—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি সমুদ্র ভালোবাসতাম। একদিন পাড়ে এসে সমুদ্রের ফেনারাশির বিস্তৃতি দেখে আমি যারপরনাই মুগ্ধ হয়ে যাই। তারপর অন্য আরেকদিন আপনার একটা হাদিসে সমুদ্রের ফেনারাশির উল্লেখ পেয়ে আমি হারিয়ে যাই আমার পূর্বের সেই স্মৃতিতে। ওই হাদিসটা আমার মনে এত গভীরভাবে দাগ কেটে যায় যে—আপনার শেখানো আমলটাকে আমি আমার জীবনের পাথেয় করে নিই।

আমি কোন হাদিসটার কথা বলছি তা কি নবিজির মনে পড়বে? যদি মনে পড়ে তবু আলাপটাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য তিনি হয়তো জিগ্যেশ করবেন, 'কোন হাদিসটার কথা বলছো, বলো তো।'

'ওই যে, সালাতের পরে তাসবিহ[১], তাহমিদ[২] আর তাকবিরের[৩] পরে যে দুআটা পাঠ করলে আল্লাহ বান্দার গুনাহ মাফ করে দেন বলেছিলেন আপনি, সেটা।

---

[১] তথা সুবহানাল্লাহ

[২] অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ

[৩] তথা আল্লাহু আকবার

এমনকি বান্দার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনারাশির পরিমাণও হয়, তবু। জানেন ইয়া রাসুলাল্লাহ, একজীবনে এত এত গুনাহ করেছি যে, মাঝে মাঝে মনে হতো— আমার গুনাহের স্তূপ করলে তা উচ্চতায় আকাশ স্পর্শ করবে; কিন্তু আমার পরম করুণাময় রব আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। এমনকি আমার একটা সমুদ্র নিজের করে পাওয়ার শখ ছিলো বলে তিনি আমাকে এই সুবিশাল সমুদ্রটা উপহারও দিয়েছেন। কী সুমহান, কী অপার দয়া আমার রবের! আলহামদুলিল্লাহ!'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো মুচকি হেসে বলবেন, 'রব্বানা ওয়া-লাকাল হামদ! সমস্ত প্রশংসা কেবল আমার রবের! দেখলে আরিফ, আমার রবের কোনো ওয়াদা মিথ্যে ছিলো না।'

সত্যিই, আমাদের রবের কোনো ওয়াদাই মিথ্যে নয়।

এবার ভিন্ন কিছু হোক

এক.

একটা চিরাচরিত বৃত্তে কেমন উদাসভাবে কেটে যাচ্ছে আমাদের দিনগুলো। একটা গতানুগতিক সকাল, একটা হাঁপিয়ে ওঠা দুপুর, বিষণ্ণ বিকেল, মিইয়ে আসা সন্ধ্যে আর দিনশেষে দীর্ঘশ্বাসের একটা রাত— যেন যাচ্ছেতাই একটা জীবন!

মাঝে মাঝে আমি 'সময়' নিয়ে চিন্তা করি। কী দুর্দান্ত এক সম্পদ এই জিনিসটা! প্রতিদিন নিয়ম করে চব্বিশটা ঘণ্টার ঝুঁড়ি হাতে নিয়ে সে আমাদের দুয়ারে চুপচাপ এসে দাঁড়ায়, কিন্তু কিছুই বলে না। যেন তার কথা বলতে মানা অথবা আমাদের ব্যাপারে সে খুব বেখেয়াল। সে শুধু ঝুড়িটা আমাদের সামনে তুলে ধরে আর বলে— 'এই নাও, তোমার আজকের দিনের চব্বিশ ঘণ্টা।'

আমাদের সামনে দৈনিক ঘণ্টার ঝুড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে সে একেবারে চুপ মেরে যায়। আর কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

আমি ভাবি—দৈনিক এই চব্বিশ ঘণ্টা হাতে পেয়ে একজন মানুষ আসলে কী কী করে?

একজন মানুষ তার দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টা থেকে আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। বাকি ষোলো ঘণ্টার মধ্যে বেশ লম্বা একটা সময় তাকে পার করতে হয় সোশ্যাল

মিডিয়ায়। এর বাইরে সিনেমা-নাটক দেখা, গান শোনাসহ অন্য অনেক কাজে তার আরো বেশকিছু সময় ব্যয় হয়। এসবকিছুর পরে যেটুকু সময় মজুত থাকে, সেটুকু নিজের কাজে, পড়াশোনায়, পরিবারে দিতে গিয়ে তাকে রোজ রোজ হতে হয় গলদঘর্ম।

তাকে যখন জিগ্যেশ করা হয়, 'কেমন যাচ্ছে দিন?' সে বলে, 'এই তো, চলছে…।'

কিন্তু এটাকে কি সত্যিই 'চলা' বলে?

মানবজীবন বড় রহস্যময়! মানুষ জানে না, দুনিয়ায় তার ঠিক কত দিন থাকা হবে। সে শুধু জানে, তাকে একদিন ঠিক ঠিক এই রঙিন দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। সে আরো জানে—এই একটা জীবনই দুনিয়ায় তার শেষ জীবন। সে আর চাইলেও কোনোদিন দুনিয়ার আলো-হাওয়া-জলে ফিরতে পারবে না। হাজার ইচ্ছে হলেও মৃত্যুর পর দুনিয়ায় এসে সে তার আপনজনের সাথে কাটাতে পারবে না একটা মুহূর্ত। যে সকালটা সে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতো রোজ, সেই সকালটাকে কর্মমুখর করে কাটানোর একটা সুযোগ সে আর কোনোদিন পাবে না। যে দুপুর অলসতায় কেটে যেতো তার, সেই দুপুরকে চাঞ্চল্যতায় ভরে তোলার অভিপ্রায় তার আর পূরণ হবে না। সে কাটাতে পারবে না একটা যথার্থ বিকেল, একটা মনে রাখার মতো সন্ধ্যে কিংবা ভুলতে না পারার মতো একটা রাত। কারণ— মৃত্যুর পরে তার সাথে দুনিয়ার সকল হিশেব-নিকেশ চুকে যাবে।

তবে কর্মমুখর সকাল, চঞ্চল দুপুর, যথার্থ বিকেল, মনে রাখার মতো সন্ধ্যে আর ভুলতে না পারার মতো রাত—এসবকিছু উপভোগ সে করতে পারতো, যদি না একটা আস্ত মানবজীবন সে অনায়াসে অপচয় করতো।

দুই.

দুটো দৃশ্যপট আমি আপনার সামনে সাজাতে পারি। দুই জায়গাতে আপনার দুই অবস্থা সহজেই আপনি ধরতে পারবেন।

ধরা যাক, একই অফিসের দুইজন লোকের ডিউটি আগামীকাল সকাল আটটায় শুরু এবং যেভাবেই হোক সকাল সাড়ে সাতটার ট্রেন তাদেরকে অবশ্যই ধরতে হবে।

এই দুই লোকের একজন জেগে আছে রাত দুটো পর্যন্ত। দুটো পর্যন্ত জেগে সে কী করেছে? মাইলের পর মাইল ফেইসবুক স্ক্রল করেছে, ইউটিউব ব্রাউজ করে কোনো বক্স অফিস হিট করা মুভি কিংবা বেশ তাক লাগানো কোনো নাটক দেখেছে। রাত দুটোর দিকে ঘুমিয়ে সে জেগেছে সকাল সাতটায়। পাক্কা পাঁচ ঘণ্টা ঘুমের চক্র পূরণ করতে সে মোটেও ভুল করেনি, কিন্তু তার ট্রেন তো সাড়ে সাতটায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে তাকে থাকতে হবে স্টেশনে। এই আধ ঘণ্টার মধ্যে তার সে কী ছুটোছুটি!

অন্যদিকে দ্বিতীয়জন দশটা বাজতেই ঘরের বাতি নিভিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। রাত আটটার দিকে সে ফেইসবুকে একটু ঢুঁ মেরেছে বটে, তবে তা সাকুল্যে পনেরো মিনিটের জন্য। সাড়ে আটটার পর সে আর সোশ্যাল মিডিয়ায় আসেনি। দশটার দিকে বিছানায় এলে চোখে ঘুম নামতে তার সাড়ে দশটা বেজে যায় প্রতিদিন। এই আধ ঘণ্টার মাঝে সে রাতের যিকির-আযকারগুলো নিয়ম করে সেরে নেয়। এরপর সাড়ে দশটার দিকে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তার অ্যালার্ম যখন বাজে, তখন ঘড়িতে রাত সাড়ে তিনটে।

ফজরের ওয়াক্ত হয় সাড়ে চারটায়। এক ঘণ্টা সময় আগে জেগে সে চার রাকআত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করেছে, ছয় পৃষ্ঠা কুরআন তিলাওয়াত করেছে এবং শেষ রাতে করতে পেরেছে অধিক পরিমাণ ইস্তিগফার। মসজিদগুলোতে আযান হলে সে মসজিদে চলে গেলো। ফজর সালাত পড়ে সেখানে বসে পুনরায় কুরআন তিলাওয়াত করে, যিকির-আযকার সেরে, সালাতুল ইশরাক পড়ে নিয়ে ঘরে ফিরেছে সে। এতসবের পরেও তার হাতে যেন অফুরন্ত সময়! গা শীতল করা ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল সেরে, কাপড়-চোপড় পরে সে রওনা করলো স্টেশনের দিকে। তার কাজগুলোতে কোনো তাড়াহুড়ো নেই কিন্তু।

খেয়াল করলে দেখবেন—দৃশ্যপটের প্রথম ব্যক্তি ঘুমিয়েছে পাক্কা পাঁচ ঘণ্টা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিও কিন্তু তার চেয়ে কম ঘুমায়নি। সে-ও পাঁচ ঘণ্টা ঘুমের চক্র পূরণ করে নিয়েছে, কিন্তু দৈনন্দিন রুটিনটাকে কেবল একটুখানি বদলে নিয়ে দ্বিতীয়জন যেখানে গভীর রাতে তাহাজ্জুদ, কুরআন তিলাওয়াত, আযকার, ফজরের সালাত, সালাতুল ইশরাক পড়েও খুব ধীরস্থিরভাবে অফিসে যেতে পেরেছে; একই পরিমাণ ঘুমিয়ে প্রথম ব্যক্তি তাহাজ্জুদ দূরে থাক, ফজরটা পর্যন্ত কাযা করে ফেলেছে। আর এই রুটিন মানতে গিয়ে অফিসে যেতেও তাকে রোজ হিমশিম খেতে হয়।

সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহারের এই এক উপকারিতা। এটা যেমন আপনার জীবনকে সহজ করবে, বাড়তি চিন্তা-টেনশান থেকে আপনাকে মুক্ত রাখবে, তেমনি জীবনের সবদিকে সময় ব্যয় করার জন্য অফুরন্ত রাস্তা দেখিয়ে দেবে। আপনার কখনোই মনে হবে না যে, আপনি একজন ব্যর্থ মানুষ কিংবা আপনার জীবনটা বড্ড জটিল। অন্যদিকে যদি সময়ের সঠিক ব্যবহার আপনি নিশ্চিত না করতে পারেন, সময়ের অবাধ অপচয়ে আপনি যদি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন, আপনার জীবন ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করবে। নিজেকে তখন আপনার কাছে ভীষণ ব্যর্থ মানুষ বলে মনে হবে। মনে হবে, একজীবনে যা কিছু করার ছিলো, তার কিছুই যেন আপনার করা হচ্ছে না। মানসিকভাবে আপনি খুব বিপর্যস্ত থাকবেন।

তিন.

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ তার *কিতাবুর রুহ* গ্রন্থে একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'একজন পিতা একদিন তার মৃত মেয়েকে স্বপ্নে দেখলেন। স্বপ্নে তিনি মেয়ের কাছে জানতে চাইলেন, 'মা, আমাকে আখিরাতের ব্যাপারে কিছু বলো'।

তার মেয়ে বললো, 'বাবা, আমাদের সামনে খুবই গুরুতর বিষয় এসে হাজির হয়েছে। আমরা দুনিয়ায় সবকিছু জানতাম ঠিক, কিন্তু মানতাম না কিছুই। আল্লাহর কসম করে বলছি বাবা, এখানে এসে যেসব বিষয়ের মুখোমুখি আমরা হচ্ছি, তা এড়াতে আমার আমলনামায় কেবল একটা তাসবিহ অথবা দুই রাকআত সালাত যদি যোগ করা যেতো, গোটা পৃথিবী লাভের চাইতেও তা আমার কাছে অধিক প্রিয় আর দরকারি হতো'।[১]

'আমরা জানতাম কিন্তু মানতাম না!' খেয়াল করে দেখুন তো আমরা কী কী জানি। আমরা জানি, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদের জন্য ফরয। 'ফরয' হালকা কোনো শব্দ নয়। মন চাইলে পাশের টঙ দোকানে গিয়ে এককাপ চা খাওয়া কিংবা ইচ্ছে করলে রমনা পার্কে ঘুরে বেড়ানোর মতো ব্যাপার নয় এটা। ফরয শব্দের ভারত্ব এতবেশি, যে ব্যক্তি তা অনুধাবন করতে পারে, কেবল সেই তার মর্ম বোঝে। অক্সিজেন গ্রহণ করা ছাড়া আপনাকে যদি পাঁচ মিনিট বাঁচতে বলা হয়, আপনার

---

[১] *কিতাবুর রুহ*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২২৫

দ্বারা কি তা আদৌ সম্ভব? আপনি বলবেন—তা আবার হয় নাকি! সত্যিই হয় না।

ঠিক একইভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাদ দিয়ে একজন মুসলিমের দিন কল্পনা করা যায় না। সালাত তার কাছে অক্সিজেন গ্রহণের মতোই জরুরি। অক্সিজেন তার দৈহিক সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখে, আর সালাত বাঁচিয়ে রাখে তার আত্মিক সত্তাকে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যে আমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে এবং তা আদায় করা যে অত্যাবশ্যকীয় এক দায়িত্ব, তা আমরা কম-বেশি সবাই জানি। কিন্তু তবু ঠুনকো কারণে অথবা কারণ ব্যতিরেকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমরা মসজিদে যাই না, জায়নামায বিছিয়ে বসি না। আমরা জানি মুসলিমদের জন্যই সালাত, কিন্তু আমরা তা মানছি কই? দুনিয়ার সমস্তকিছুর জন্যে আমরা সময় করতে পারি, সময় বের করতে পারি, কিন্তু সালাত আদায়ের জন্য সময় করা আমাদের হয়ে ওঠে না।

'আমরা জানি সবই, কিন্তু মানি না কিছুই'—এটা যেন আমাদের জীবনের পরতে পরতে লেপটে থাকা এক অমোঘ সত্য বাণী। আমরা জানি, আমাদের জীবন ঠিক স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে না, কিন্তু সঠিক স্রোতে ফিরে আসার তাড়নাও আমাদের মাঝে নেই। আমরা জানি, আমাদের ইনকাম হালাল পথে আসে না, আমরা অফিসের কাজে ফাঁকি দিয়ে অন্যের হক নষ্ট করি; আমরা জানি, ঘুষ ও সুদ দুটোই হারাম—তথাপি এসবের সাথে আমাদের নিত্য ওঠাবসা। পরনিন্দা করা, অন্যের ক্ষতি করা, অন্যকে খাটো করা, অপমান করা, মিথ্যা বলা, হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, অশ্লীল জিনিস দেখা, গান-বাজনায় মত্ত থাকা—এসবকিছুই আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ছিটকে দেয় জেনেও আমাদের সংবিৎ ফেরে না। আমরা জানি, কিন্তু মানি না। এই না মানার যে কোনো খেসারত হবে না, এটা যেদিন বুঝবো আমরা, সেদিন সত্যিকার অর্থেই অনেক দেরি হয়ে যাবে। স্বপ্নে সেই মৃত মেয়েটা যেরকমভাবে তার পিতাকে বললো, 'একটা তাসবিহ, অর্থাৎ—একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলে তা আমলনামায় যোগ করাটা আজ আমার কাছে গোটা দুনিয়া লাভের চাইতেও বেশি মূল্যবান', আমাদেরকেও একদিন এভাবে আফসোস করতে হবে। আমাদের মনে হবে—'ইশ! রাতের পর রাত যে সময়গুলো আমি ফেইসবুক স্ক্রল করে কাটিয়েছি, তার কিছুটা সময় যদি শেষ রাতে উঠে জায়নামাযে পার করতাম, তাহলে আজ আমাকে এই দুর্দশায় পড়তে হতো না। ইউটিউবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুভি দেখেছি, নাটক দেখেছি, কমেডি শো উপভোগ করেছি, হায়, তার কিছু সময় যদি আমি আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করে কাটাতাম! যে রমণীর উত্তরের আশায় ব্যাকুল নয়নে আমি ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকেছি,

সেরকম ব্যাকুলতা নিয়ে যদি আল্লাহর যিকির-আযকারে মশগুল থাকতে পারতাম! আমাদের এমন আফসোস যে নিশ্চিতভাবেই হবে, তা কুরআন কর্তৃক স্বীকৃত। সুরা আল-ফাজরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—

হায়, এই জীবনের জন্য আমি যদি আগে কিছু পাঠাতাম। [সুরা ফাজর, আয়াত : ২৪]

চার.

চোখের সামনে দিয়ে একটা মানবজীবন এমন ব্যর্থতায় কেটে যাবে, তা কি দেখে সহ্য করা যায়? দুনিয়ায় এই একটাই আমাদের সুযোগ। আর কোনো দ্বিতীয়, তৃতীয় সুযোগের ব্যবস্থা নেই। এই জীবনটা যেনতেনভাবে কাটিয়ে দিয়ে, পরের জীবনটায় খুব গোছানো হয়ে যাব, অনেক কর্মমুখর থাকব—এমন চিন্তার জায়গা এখানে নেই। এটাই প্রথম এবং এটাই সর্বশেষ। কাজে লাগাতে হলে এটাকেই লাগাতে হবে, আর যদি অপচয়ের ইচ্ছে অটুট থাকে মনে, এই জীবনটাই কেবল বরাদ্দ।

অনেক তো ঘোর লাগা সময় পার করা হলো। অহেতুক কাজ আর ভাবনায়, অনর্থ কোলাহলে আর অদরকারি আড্ডায়। জীবনের বাকি মুহূর্তগুলো নিয়ে আমরা কি একটু নতুনভাবে ভাবতে পারি না? পারি না আগামীকাল থেকে একটা নতুন ভোরের সাক্ষী হতে, যেখানে থাকবে না আল্লাহর অবাধ্যতা? যেখানে আমাদের জীবনকে রাঙিয়ে তুলবো আল্লাহর রঙে? আমরা ছেড়ে আসবো সমস্ত অন্ধকার। হৃদয়ে জমে থাকা সকল কালিমা দূর করে আমরা ছুটবো হেরার আলোর পানে। আমরা ধরবো তাদের পথ, যারা আমাদের আগে আগে চলে গেছেন সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তা ধরে। আমরা ত্যাগ করবো সমস্ত পিছুটান। ছুঁড়ে ফেলবো সমস্ত জঞ্জাল। জীবনের পরবর্তী সূর্যোদয়টা হবে আমাদের নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন অধ্যায়।

এবার ভিন্ন কিছু হোক
জাগরণের এই জাগ্রত জোয়ারে
এবার নতুন করে লেখা হোক জীবনের জ্যামিতি।

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

আমাদের সেরা কিছু বই

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক
০১	এবার ভিন্ন কিছু হোক	আরিফ আজাদ
০২	অবাধ্যতার ইতিহাস	ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি
০৩	পড়ো ৩	ওমর আল জাবির
০৪	প্রত্যাবর্তন ২	সমকালীন টীম
০৫	জবাব ২	মুশফিকুর রহমান মিনার
০৬	বিলিয়ন ডলার মুসলিম	খুররাম মালিক
০৭	আরবি রস (দ্বিতীয় খণ্ড)	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
০৮	ইজ মিউজিক হালাল?	ড. গওহর মুশতাক
০৯	ইউ মাস্ট ডু বিজনেস	শাইখ তাওফিক চৌধুরি
১০	কুরআনের শব্দ শিক্ষা : ১	উস্তায এস. এম. নাহিদ হাসান
১১	শেষরাত্রির গল্পগুলো	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
১২	হাদিস সংকলনের ইতিহাস	ড. মুস্তফা আল-আযমি
১৩	সিরাজুম মুনির	আরিফুল ইসলাম

আমাদের অন্যান্য সেরা গ্রন্থসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য
০১	জীবন যেখানে যেমন	আরিফ আজাদ	২৬০
০২	নবি-জীবনের গল্প	আরিফ আজাদ	২৪৩
০৩	বেলা ফুরাবার আগে	আরিফ আজাদ	৩১৫
০৪	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২	আরিফ আজাদ	৩৭০
০৫	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	২৫০
০৬	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	২৫৮
০৭	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	৩৩০
০৮	সুখী পরিবার নির্মাণের রূপরেখা	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৭৫
০৯	সন্তান গড়ার কার্যকরী কৌশল	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৪৫
১০	পারিবারিক সম্পর্কের বুনন	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৩০
১১	সন্তানের বয়ঃসন্ধিকালের মনস্তত্ত্ব	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৬৫
১২	শিশুদের সমস্যা আমাদের করণীয়	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৭৫
১৩	সন্তানকে বইমুখী করার কৌশল	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৪৫
১৪	কে উনি?	মোহাম্মাদ তোয়াহা আকবর	১৭২
১৫	ওপারেতে সর্বসুখ	আরিফুল ইসলাম	১৯০
১৬	আরবি রস	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	১৮৬
১৭	জবাব	মুশফিকুর রহমান মিনার	৩৩০
১৮	ভ্রূণের আর্তনাদ	শাহিনা বেগম	১৬৮
১৯	আকিদাতুত তাহাবি [ব্যাখ্যাগ্রন্থ]	শাইখ আব্দির রহমান আল-খুমাইস	২৪৫
২০	প্রোডাক্টিভিটি লেসনস	শাইখ মাশআল আব্দুল আজিজ	১৫২
২১	সূরা ইউসুফ:পবিত্র এক মানবের গল্প	শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি	১৮৬
২২	বিষয়ভিত্তিক বিশুদ্ধ হাদিস	শাইখ ড. আওয়াদ আল-খালফ	৫১৫
২৩	শিকড়ের সন্ধানে	হামিদা মুবাশ্বেরা	৪৩০
২৪	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টীম	৩৪৬
২৫	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২৩২

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য
২৬	ইমাম আবু হানিফা ﵀	আবুল হাসানাত	২৫৫
২৭	ইমাম শাফিয়ি ﵀	আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আব্দুল্লাহিল মামুন	২৪৩
২৮	ইমাম মালিক ﵀	আব্দুল্লাহ মাহমুদ	২৪৩
২৯	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀	যোবায়ের নাজ্জাত	২৫৫
৩০	হাসান আল-বাসরি ﵀	আব্দুল বারী	১৭৫
৩১	আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀	আবুল হাসানাত	২৬৫
৩২	তিনিই আমার রব	শাইখ আলী বিন জাবির আল ফাইফি	২৭২
৩৩	তিনিই আমার রব (দ্বিতীয় খণ্ড)	শাইখ ড. রাতিব আন-নাবুলুসি	২৬০
৩৪	তিনিই আমার প্রাণের নবি	শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফি	১৮৬
৩৫	নবীজি ﷺ	শাইখ আয়িয আল-কারনী	২৭৮
৩৬	রিক্লেইম ইয়োর হার্ট	ইয়াসমিন মুজাহিদ	২৫০
৩৭	পড়ো-১	ওমর আল জাবির	২২০
৩৮	পড়ো-২	ওমর আল জাবির	২৮০
৩৯	ফেরা	সিহিন্তা শরীফা, নাইলাহ আমাতুল্লাহ	১৭২
৪০	ফেরা-২	বিনতু আদিল	১৭২
৪১	বিশ্বাসের জয়	ড. হুসামুদ্দিন হামিদ	২৬৮
৪২	অশ্রুজলে লেখা	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	২৭৫
৪৩	মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	২৮৬
৪৪	কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা	শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান	২৬০
৪৫	খুশূ-খুযূ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	১২৫
৪৬	হাইয়া আলাস সালাহ	শাইখ আবু আব্দিল আযিয আল-জাযায়িরি	১৭৫
৪৭	ভালোবাসার রামাদান	ড. আয়িয আল-কারনী	৩০৮
৪৮	সেরা হোক এবারের রামাদান	রৌদ্রময়ী টীম	২৬০
৪৯	জিলহজের উপহার	আব্দুল্লাহিল মা'মুন	১৪০
৫০	হিফয করতে হলে	শাইখ আব্দুল কাইয়্যূম আস-সুহাইবানী	১৪১
৫১	সবর	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	২৬০
৫২	সালাফদের জীবনকথা	শাইখ আব্দুল আযীয	৩২০

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য
৫৩	আর্গুমেন্টস অব আরজু	আরিফুল ইসলাম	২৫০
৫৪	জীবন যদি হতো নারী সাহাবির মতো	ড. হানান লাশীন	১৮৬
৫৫	কাজের মাঝে রবের খোঁজে	আফিফা আবেদীন সাওদা	১৩৬
৫৬	সন্তান : স্বপ্ন দিয়ে বোনা	আকরাম হোসাইন	১৮৫
৫৭	শিশুর মননে ঈমান	ড. আইশা হামদান	১৭৬
৫৮	সুখের নাটাই	আফরোজা হাসান	১৬০
৫৯	জীবন পথে সফল হতে	শাইখ আব্দুল কারিম বাক্কার	২৩২
৬০	যে জীবন মরীচিকা	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	১৭৫
৬১	সবুজ রাতের কোলাজ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	১৫০

লুসাই পাহাড় বেয়ে এঁকেবেঁকে নেমে আসা অপরূপ নদী কর্ণফুলির অঞ্চল থেকে উঠে আসা একজন লেখক—আরিফ আজাদ। সত্যের পেছনে নিরন্তর ছুটবার অদম্য নেশা থেকে সাংবাদিক হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জীবন তাকে টেনে এনেছে লেখালেখির জগতে। সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়নি, কিন্তু সত্য এবং সুন্দরে তার যে সবিস্ময় মুগ্ধতা, সেই মুগ্ধতার ঘোর তাকে নিয়ে এসেছে সত্য তুলে ধরবার এমন এক দুনিয়ায়—যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি মিথ্যের কুয়াশাকে মুছে দিতে চান ভোরের ঝলমলে আলো দিয়ে।

আরিফ আজাদ লেখালেখির জগতে পদার্পণ করেন 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' লিখে। তার পরের ঘটনাপ্রবাহকে যদি এক শব্দে তুলে ধরতে হয়, তবে বলতে হবে—অবিশ্বাস্য! বাংলা সাহিত্যে প্রথম বই দিয়ে যে-কজন লেখক ইতিহাস গড়েছেন, আরিফ আজাদ নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। যেন তিনি রূপকথার সেই বীর যিনি 'এলেন, দেখলেন আর জয় করে নিলেন'।

তবে সেখানেই থেমে যাননি তিনি। 'আরজ আলী সমীপে', 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ ২', 'জীবন যেখানে যেমন' আর 'নবি-জীবনের গল্প'-সহ উম্মাহর জন্য উপকারী চমৎকার সব রচনা উপহার দিয়ে সেই জায়গাটিকে তিনি পোক্ত করে চলেছেন অবিরত। তবে ২০২০ বইমেলায় প্রকাশিত 'বেলা ফুরাবার আগে' বইয়ে আরিফ আজাদ হাজির হয়েছেন একেবারেই ভিন্নভাবে। মানুষের ভেতর জীবনবোধ জাগানোর জন্য লেখক যেন সমস্ত আয়োজন সাজিয়ে বসেছেন। পাঠকনন্দিত সেই 'বেলা ফুরাবার আগে' বইয়ের দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে লেখক এবার উপস্থিত হয়েছেন 'এবার ভিন্ন কিছু হোক' নিয়ে।

ভোরের শিশির, শীতের কুয়াশা, রাতের নিস্তব্ধতা, পাখিদের কলরব, নদীর অবিরাম বয়ে চলা, সাগরের বুকে উথাল-পাতাল ঢেউ—সবখানে সবকিছু ঠিকঠাক, কেবল আমাদের জীবনের কোথাও যেন এক নীরব ছন্দপতন। সেখানে সুর, তাল আর লয়ের কোনো হিশেব মিলছে না। প্রতিদিন একটা একঘেয়েমি চক্রে কেটে যাচ্ছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। মাঝে মাঝে হাপিত্যেশ লাগে—এভাবে একটা জীবন চলতে পারে? কী পাওয়ার বদলে কী হারাচ্ছি জীবন থেকে? এভাবেই কি ক্ষয়ে যাওয়ার কথা আস্ত একটা জীবন?

প্রশ্নগুলো অনেকের, কিন্তু উত্তরগুলো যেন কোথাও বিন্যস্ত করা নেই। জীবনে একটা বদল প্রয়োজন, একটা পরিবর্তন ভীষণ জরুরি—তা আমরা জানি। কিন্তু কীভাবে শুরু করবো? ঠিক কোথা থেকে যাত্রা করবো নতুন এক দিনের? এইসব প্রশ্নের উত্তর আর জীবনের এক নতুন উপাখ্যান রচনায় 'এবার ভিন্ন কিছু হোক' বইটি হতে পারে আপনার নিত্যদিনের সাথি।